হংকং সম্রাট

মাসুদ রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুই খণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা - ৫৩, ৫৪

হংকং সম্রাট -১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন
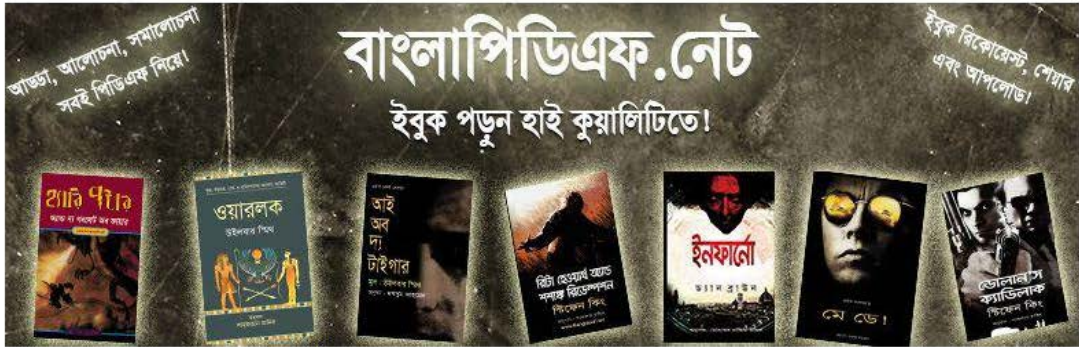
মাসুদ রানা

হংকং সম্রাট

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16-7053-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৭
তৃতীয় প্রকাশ: ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

HONGKONG SHAMRAT
[Part-I&II]
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

আটাশ টাকা

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীল ছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা *বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা
মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয়
শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন
সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ
কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা
কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা
আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত
ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ
জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ
অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা
স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩
*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট, অমানিশা।

হংকং সম্রাট-১

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৭৭

এক

রানওয়ে ছুঁয়ে কয়েকশো গজ ছুটে এল বোয়িংটা।

বৃহস্পতিবার। সকাল আটটা ছত্রিশ মিনিট বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। বি. বি-এর যাত্রীবাহী বোয়িং লণ্ডন থেকে জাম্প দিয়ে প্যারিস, রোম, ত্রিপোলী, কায়রো এবং করাচীতে ড্রপ খেয়ে ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে এইমাত্র হাঁফ ছাড়ল।

সিঁড়ি ফিট করা হতে খুলে গেল বোয়িঙের পেটের কাছে দরজা, বিমানবালা পজিশন নিল দোরগোড়ায়, মুখে রেডিমেড হাসি। একে একে বেরিয়ে আসছে প্যাসেঞ্জাররা। প্রথম তিনজনের পিছনে এল এক হাতে অ্যাটাচী কেস আরেক হাতে সানগ্লাস নিয়ে লিবিয়ান তৌফিক আজিজ।

প্রায় ছয়ফুট লম্বা লোকটা। চওড়া গোঁফ, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রঙ, ব্যাকব্রাশ করা চুল, কানের লতি ছাড়িয়ে নেমে এসেছে ঘন জুলফি। পরনে সাদা পপলিনের শার্ট, অ্যাশকালারের ট্রপিক্যাল স্যুট। সিঁড়িতে পা দিয়েই চোখের দুই কোণ কুঁচকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চট করে এদিক ওদিক দেখে নিল একবার।

পুলিসের খাকী বা নীল ইউনিফর্মের কোনটাই নজরে পড়ল না। রোদে মোড়া টারমাকে পা দিয়ে সানগ্লাসটা নাকের ব্রীজে সেট করার সময় মৃদু হাসল সে। মাত্র দু'জন জানে তার ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের কথা। একজন ঘুমের ঘোরেও ঠোঁট ফাঁক করবে না, আরেকজন আপাতত বোবা থাকবে।

সঙ্গত কোন কারণ না থাকলেও মনে একটু ভয় ছিল, কাস্টমসের কেউ যদি চিনে ফেলে! কিন্তু ঝামেলা চুকতে বিশ মিনিটের বেশি লাগল না। ছয় বছর আগে ফেরারী তৌফিক আজিজকে ক'জনই বা আর চিনে রেখেছে। তার অনুপস্থিতিতে বিচার চলাকালে ছাপার জন্যে তার কোন ফটো কোথাও পাওয়া যায়নি। সবাই জানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত তৌফিক আজিজ হয় কোথাও বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে, নয়তো চিরতরে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় সে গেছে বা আছে কিংবা মারা গেছে কিনা, কারও জানা থাকার কথা নয়। সে যে আবার ফিরে আসবে মরতে, ভুলেও কেউ তা কল্পনা করে না।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় পৌছুবার কথা বেলায়েত হোসেন খান মজলিশের অফিসে। অতিরিক্ত সময়টা এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙেই ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বুকস্টল থেকে খবরের কাগজ কিনে রেস্তোরাঁয় বসল সে। হেডিং পড়ার ফাঁকে কফির কাপে চুমুক, রিস্টওয়াচের কাঁটা ফলো করার পরপরই আড়চোখে একবার চারদিকটা দেখে নেয়া। পৌনে এক ঘণ্টা পর উঠল।

ট্যাক্সি নিয়ে মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়ায় পৌঁছুল।

ছয়তলা বিল্ডিং, কিন্তু লিফট নেই। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে, সিঁড়ির দু'পাশের সাদা দেয়ালে টুকরো টুকরো রঙচঙে সাইনবোর্ড। এক ফুট বাই আড়াই ফুট একটা টিনের টুকরোয় হলুদ রঙের উপর লাল অক্ষরে লেখা: রিভোলি ট্রেডার্স. ছোট ছোট নীল অক্ষর তার নিচে—ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাক্টর অ্যাণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স, থার্ড ফ্লোর।

চারতলায় উঠে করিডর ধরে এগোতে এগোতে সিগারেট ধরাল তৌফিক আজিজ। দু'পাশের দরজাগুলো অধিকাংশই বন্ধ। ফাঁকা করিডর। রিভোলি ট্রেডার্সের দরজার গায়ে কালো প্লাস্টিকের সাইনবোর্ড. বোর্ডের উপর চকচকে পিতলের অক্ষর। সামনে দাঁড়িয়ে নক্ করতে যাবে, ঢং…ঢং…ঢং…। রিস্টওয়াচ দেখল, ঠিক দশটা। বন্ধ দরজার ভিতর থেকে রুটিন ফলো করছে ওয়াল-ক্লক।

সানগ্লাস খুলে কী-হোলে চোখ রাখল তৌফিক আজিজ। এখনও ঢং…ঢং…ঢং বাজছে ঘণ্টা।

প্রথমে নীল রঙের হাইহীল, তারপর নীল শাড়ি, সবশেষে নীল ব্লাউজ দেখতে পেল সে। গলা এবং ঘাড়ের রঙ হলদেটে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কারণ ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে আছে পিছন দিকের উঁচু দেয়ালে, সম্ভবত ওয়ালক্লক দেখছে। ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ হতে ঘাড় সোজা করে তাকাল। গোল মুখটা দেখতে পেল তৌফিক। দরজার দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা। রুদ্ধশ্বাসে, সম্ভবত। কী-হোল থেকে চোখ না সরিয়েই নক করল সে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। কিন্তু এগোল না।

কণ্ঠস্বরটা মিষ্টিই লাগল, 'কাম ইন।'

সকৌতুক হাসিটা মুখ থেকে মুছে ফেলে ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল, তৌফিক আজিজ। মেয়েটাকে ধাতস্থ হবার সুযোগ দেবার জন্যেই তখুনি তার দিকে তাকাল না। রুমটা বেশ রুচিসম্মতভাবে সাজিয়েছে বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ। সিলিং থেকে নেমে এসেছে সিল্কের পর্দা, কার্পেটে পা ডুবে যায়। মেয়েটার দিকে তাকাতে দেখল ঢোক গিলছে।

'তৌফিক আজিজ— বেলায়েত সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই।'

শাড়ির আঁচল ঠিক করে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বলল মেয়েটা, 'তিনি অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।' আঙুল তুলল প্রাইভেট লেখা দরজার দিকে। 'যান।'

একটা বাহু ধরে সানগ্লাসটা ঘোরাতে ঘোরাতে মেয়েটার পাশ ঘেঁষে এগোল তৌফিক আজিজ। দরজার কাছে গিয়ে থামল। পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সানগ্লাসটা। ঢোক গিলল একবার, খুক করে কাশল। অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী মানুষ বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ, তাঁর সামনে যাবার আগে এক সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে তৈরি করে নিল সে।

দু'মাস আগে দেখা বেলায়েত হোসেনকে চিনতে অসুবিধে না হলেও, ব্যাপক পরিবর্তনটাও সাথে সাথে চোখে লাগল। গোঁফ ছিল না, এখন আছে। টাক ছিল, এখন নেই। ওজনটা বোধহয় কমেনি বা বাড়েনি, মন আড়াই-ই আছে। দেখে মনে হয় বয়স স্থির হয়ে আছে পঁয়তাল্লিশে, আসলে পঞ্চান্ন ছাড়িয়ে গেছে বছর পাঁচেক

আগেই। পিঠ টান করা চেয়ারে বসার ভঙ্গি দেখে মনে হয় রেগে আছেন। কমপ্লিট স্যুটের জায়গায় গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে চড়ানো, ফলে উঁচু ঢিবির মত দেখাচ্ছে মেদবহুল ঘাড় গর্দান। ডেস্ক থেকে টোবাকো পাইপটা তুলে নিয়ে বললেন, 'জাস্ট ইন টাইম···থ্যাঙ্কস! অ্যাণ্ড হাউ ওয়াজ দ্য ফ্লাইট—মি. আজিজ? বাজখাঁই কণ্ঠস্বরটা অটুটই আছে।

'ভাল।' ছোট্ট করে উত্তর দিল তৌফিক।

'গুড। বসুন, মি. আজিজ।' কলিংবেলের মাথায় তর্জনী দিয়ে খোঁচা মারলেন বেলায়েত হোসেন খান। 'চা কিংবা কোল্ড কিছু···?'

'ধন্যবাদ,' তৌফিক বলল। 'ব্যস্ত হবেন না।'

দরজা খোলার শব্দে পিছন ফিরে তাকাল সে। নীল পরী।

'তিন কাপ চা। আর কাগজপত্র ঠিকঠাক করে রাখুন। খানিকপরই ডাকব।'

মেয়েটা অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলে চলে গেল আবার।

তৌফিক জানতে চাইল, 'সবটা জানে ও?'

'অবশ্যই। খুব কাজের মেয়ে, মিস রূপা। ওকে না পেলে এত তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।' বেলায়েত হোসেন খান তৌফিকের মাথার দিকে তাকালেন, 'চুলটা আরও বড় হবে বলে আশা করেছিলাম।' গোঁফের দিকে দৃষ্টি নামল, 'একটু বেশি চওড়া হয়ে গেছে গোঁফ।' শার্টের বোতামে নজর আটকাল, 'সোনার বোতাম লাগাননি কেন? আর এই কাটিঙের স্যুট চলবে না।' কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি।

'ভাল একজন দর্জির নাম বলুন। ঢাকায় আমি নবাগত।'

'বলব। ওর কাছেই কাপড় সেলাই করাই। একটু বেশি চার্জ করে, কিন্তু কাজ জানে।' ডেস্কের ড্রয়ার খুলে এক তাড়া নোট বের করলেন। দশটাকার বাণ্ডিল। 'হাতখরচার জন্যে কিছু থাকা দরকার আপনার কাছে।' বেমক্কা ছুঁড়ে দিলেন নোটের তাড়াটা।

লুফে নিয়ে চোখ নামিয়ে দেখল তৌফিক। ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছে না ঘটনাটা।

'সাড়ে তিন হাজার আছে।'

হয়তো ভুল করে দিয়ে ফেলেছে, আবার ফিরে চাইবে আশঙ্কা করে দ্রুত কোটের সাইড পকেটে নোটের তাড়াটা ঢুকিয়ে ফেলল তৌফিক, 'একটু অস্বাভাবিক লাগছে।' বলেই ফেলল। 'আপনাকে এতটা ফ্রী অ্যাণ্ড ইজি আশা করিনি।'

একযোগে টোবাকো পাউচ, সিগারেটের প্যাকেট, সিগার কেসের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন খান মজলিশ, 'বেছে নিন।' তারপর তৌফিকের কথার উপর মন্তব্য করলেন। 'যে টাকা আপনি রোজগার করবেন, তার অতি ক্ষুদ্র অংশ অ্যাডভান্স করলাম। ত্রিপোলীর লেটেস্ট খবর কি বলুন।'

'কর্নেল গাদ্দাফী তাঁর লেটেস্ট বিবৃতিতে বলেছেন, সাদাতকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে, তবেই দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারে,' তৌফিক আজিজ বলল। 'ত্রিপোলীর ফরেন ডিপ্লোম্যাটদের ধারণা রাশান অস্ত্র পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন কর্নেল। কিন্তু এহ বাহ্য! এদিকের কাজ কতদূর এগিয়েছে?'

'আপনার যাবজ্জীবন ঘানি টানার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি,' চোখ মটকে বললেন বেলায়েত হোসেন খান।

চায়ের ট্রে নিয়ে ইনার অফিসে আবার ঢুকল মেয়েটা। ফিরে গিয়ে নিয়ে এল একটা ফাইল।

তৌফিক মেয়েটার দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না দেখে খুক্ করে কাশলেন বেলায়েত হোসেন, 'একটা জুয়েলারীর দোকানে কত টাকার সোনা থাকে ধারণা আছে আপনার?'

'লিবিয়ায়? বাংলাদেশের টাকার হিসেবে এককোটি টাকার কম নয়।'

'ঢাকার দোকানে?' যেন ভুল বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে হাসতে শুরু করলেন বেলায়েত খান। 'আপনি তো নবাগত, জানবেন কিভাবে? বড়সড় জুয়েলারীর একটা দোকানে সাধারণত পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকার অলঙ্কার থাকে। স্ট্রংরুমে থাকে আরও বেশি, তবে অলঙ্কার আকারে নয়। ধরা যাক, আরও বিশ লাখ টাকার সোনার বার। তাছাড়া, স্টোনও থাকে চার পাঁচ লাখ টাকার। যে দোকানটা সাফ করবেন আপনি সেটায় কমপক্ষে চল্লিশ লাখ টাকার মালামাল আছে।'

'আমি কত পাচ্ছি?' মৃদু হেসে জানতে চাইল তৌফিক। চুমুক দিল চায়ের কাপে।

'মিস রূপা!'

চোখে চোখে কথা হলো ওদের মধ্যে। তৌফিক দেখল রূপা ভাঁজ খুলে একটা ফর্ম মেলে ধরল ডেস্কের উপর। চোখ তুলে তাকাল, 'ফিলআপ দা গ্যাপ, প্লীজ!'

ফর্মটা একটা সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খোলার আবেদনপত্র। ফর্মের মাথায় ব্যাঙ্কের নাম লেখা: Zuricher Ausfuhren Handelsbank.

রূপা বলল, 'আপনার নাম্বারটা অত্যন্ত জটিল।' ফর্মের মাঝখানে রেখা দিয়ে তৈরি একটা চারকোণা ঘরের সামনে আঙুল রাখল। 'এর ভিতর লিখুন।'

নাম্বারটা লিখল তৌফিক।

'নির্দিষ্ট চেক ফর্মে সিগনেচারের বদলে এই নাম্বার লিখে আপনি তেরো লাখ টাকা যে কোন মুদ্রায় তুলতে পারবেন—লোক পাঠিয়ে, নিজে গিয়ে বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে।'

'তার আগে, অবশ্যই দোকান থেকে চল্লিশ লাখ টাকার মালামাল তুলে দিতে হবে আমার হাতে,' বেলায়েত হোসেন খান বললেন।

'তিন ভাগের এক ভাগেরও কম পাচ্ছি আমি,' ক্ষীণ অনুযোগের সুরে বলল তৌফিক। হাসছে সে।

পাইপে আগুন ধরিয়ে বেলায়েত হোসেন খান বললেন, 'প্ল্যানটা আমাদের। দু'ভাগ আমরা নেব।' তাঁর কথাই যেন চূড়ান্ত, এরপর দর কষাকষির কোন অবকাশ নেই। 'আইডিয়াটা মিস রূপার। উনিই ধারণাটা দেন এবং প্রয়োজনীয় রিসার্চ করে গোটা ব্যাপারটাকে দাঁড় করান।'

রূপার দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল তৌফিক। রূপা আইডিয়াটা দিয়েছে—কিন্তু সে কার কাছ থেকে পেয়েছে আইডিয়াটা জানতে ইচ্ছে করল

তার। পরস্পরের সাথে চেপে বসে আছে রূপার ঠোঁট জোড়া, প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে কিনা সন্দেহ হলো তৌফিকের।

'মি. তৌফিক!' বেলায়েত হোসেনের দিকে তাকিয়ে কথা বলল রূপা, 'কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট কাউকে মারাত্মকভাবে আহত করা চলবে না। কেউ যেন মারা না যায়।'

'ঠিক,' বেলায়েত খান সায় দিলেন। 'পালাবার জন্যে যতটা না করলে নয় ততটা—তার বেশি ভায়োলেন্স দরকার নেই। ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করি না আমি, ব্যবসার জন্যে ওটা খারাপ। কথাটা মনে রাখবেন।'

'কিন্তু চল্লিশ লাখ টাকার জিনিস একদল লোকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে আমাকে, আমি না চাইলেও মারাত্মকভাবে আহত হবার জন্যে খেপে উঠবে না তারা?'

'সুচারুভাবে কাজটা আপনি করতে পারবেন বলে গ্যারান্টি না পেলে আপনাকে ডাকা হত না এ-কাজে, মি. তৌফিক। ধরা পড়লে রবারী উইথ ভায়োলেন্স-এর অভিযোগ আনা হবে আপনার বিরুদ্ধে। কেসটা যদি রবারী উইথ মার্ডার হয়ে দাঁড়ায়—যাবজ্জীবন নয়, মৃত্যুদণ্ড হবে।'

'মার্কেটটার নাম বলে দিচ্ছি,' রূপা বলল। 'দোকানটা ফার্স্ট ফ্লোরে।'

নামটা শুনল তৌফিক আজিজ।

বেলায়েত খান বলল, 'লাঞ্চ সেরে একবার ঢুঁ মেরে আসুন। এই যাকে বলে র‍্যাকি—আই বিলিভ, দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্রেশন। ঠিকানাটা লিখে নিন বরং, টেইলারিংশপের নামটাও বলে দিচ্ছি। দেখবেন, একটার সাথে আরেকটা গোলমাল করে ফেলবেন না। জুয়েলারীর দোকানের ভিতর ঢোকার দরকার নেই আজ। টেইলারিংশপে গিয়ে আমার নাম বললেই প্যাকেটটা দিয়ে দেবে ওরা।'

হাঁটতে হাঁটতে বায়তুল মোকাররমের শপিং মার্কেটে পৌঁছুল তৌফিক আজিজ। নামাজের সময় বলে অধিকাংশ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে কিছুক্ষণের জন্যে। ক্রেতারা করিডরে ঘুরেফিরে হকারদের কাছ থেকে কেনাকাটা করছে। দোতলায় ওঠবার তিনটে সিঁড়ি আবিষ্কার করল সে। পালাবার সময় যদি প্রয়োজন পড়ে, পানির পাইপ ব্যবহার করা সম্ভব। তবে তার দরকার হবে না, কারণ ছাদের কিনারা থেকে মাত্র চার হাত দূরে মসজিদের মিনারের কার্নিস, এক লাফে পৌঁছানো যাবে।

দোতলার করিডরটা বেশ চওড়া। জুয়েলারীর দোকানটার মুখোমুখি এক অ্যাডভোকেটের চেম্বার। দুটোই বন্ধ। জুয়েলারীর দু'পাশের দোকান দুটোও বন্ধ। ডান পাশেরটা রেডিমেড পোশাকের দোকান। বাঁ পাশের দোকানের মাথায় ঝকঝকে নতুন সাইনবোর্ড: কিডিকার টয়েজ লিমিটেড। খেলনার দোকান।

নেমে এল রাস্তায়। ইন্টারকনে উঠল তৌফিক আজিজ। প্যাকেটটা না খুলেই রেখে দিল ওয়ারড্রোবের তাকে। শাওয়ার সেরে টেলিফোনে অর্ডার দিল লাঞ্চের।

দুপুর তিনটের সময় ফোন করল সে বেলায়েত হোসেন খান মজলিশকে।

'রিভোলি ট্রেডার্স!'

তৌফিক বলল, 'তৌফিক, রূপা।'

'না—মিস রূপা।' রূপা সংযত কণ্ঠে বলল। 'মি. বেলায়েতের সাথে কথা বলুন. কানেকশন দিচ্ছি।'

'এক মিনিট,' তৌফিক জরুরী ভাবটা ফোটাতে চাইল কণ্ঠস্বরে। 'কদিন হলো এই লাইনে?'

'তার মানে?'

চুপ করে রইল তৌফিক। অপেক্ষা করে দেখতে চাইল, মেয়েটা আর কিছু বলে কিনা।

বোমা ফাটার শব্দ ভেসে এলেও এতটা নিরাশ হত না তৌফিক, বাজখাঁই কণ্ঠ ভেসে আসাতে যতটুকু হলো।

'হ্যালো, ডিয়ার বয়!' উৎফুল্ল বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ।

'আরও কিছু আলাপ করতে চাই আমি,' নীরস কণ্ঠে বলল তৌফিক।

'খুবই সুখের কথা। আগামীকাল, ওই একই সময়ে। ভাল কথা, প্যাকেটটা এনেছেন?'

'এনেছি।'

'খুলে দেখেছেন?'

একটু ইতস্তত করে বলল তৌফিক। 'না।'

'সময় থাকতে দেখে নিন কোন ত্রুটি আছে কিনা।'

মন্তব্য না করে রিসিভার নামিয়ে রাখল তৌফিক আজিজ। বুড়োর মুণ্ডুপাত করতে শুরু করল সে মনে মনে।

'ধরা পড়লে? ধরা পড়লে গণপিটুনি খেয়ে লাশ হয়ে পড়ে থাকবেন রাস্তার ওপর, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। গণপিটুনি জিনিসটা এখনও বাংলাদেশে পপুলার।'

তৌফিক বলল, 'ওভাবে ধরা আমি পড়ব না। যদি পড়িও, আত্মরক্ষার কায়দা আমার জানা আছে।'

'মি. তৌফিক, নো ভায়োলেন্স...

'কাজটা কবে নাগাদ সারতে হবে?'

দেঁতো হাসিটা আবার দেখালেন বেলায়েত হোসেন। 'আগামীকাল।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গিয়েও বলল না তৌফিক।

'জানি, সময়টা খুবই অল্প হয়ে যাচ্ছে,' বেলায়েত হোসেন খান বললেন। 'কিন্তু গ্রাউণ্ড তৈরি করে রেখেছি আমরা, আপনি শুধু বলে কিক্ করবেন। মিস রূপা, ফাইলটা এবার খুলতে হয়।'

ফাইলটায় হাত বিছিয়ে রেখে চুরি করে দেখছিল রূপা তৌফিককে। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়ে ফাইলটা খুলল সে। মার্কেটের একটা ডিজাইন বের করে রাখল ডেস্কের উপর, তৌফিকের সামনে। রূপা হাতটা ফিরিয়ে নেবার আগেই তৌফিক দ্রুত থাবা চালাল ডিজাইনের উপর, থাবাটা পড়ল রূপার হাতে। মৃদু চাপ দিল হাতটায় তৌফিক।

বেলায়েত হোসেন পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন, লক্ষ্য করেননি ব্যাপারটা। চাপ

দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছিল তৌফিক রূপার হাতটা। যা হবার হয়ে গেছে, উচ্চবাচ্য না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। কিন্তু কঠিন চীজ মেয়েটা, স্বীকার করল তৌফিক এক সেকেণ্ড পরই।

হাতটা সে তুলে নিতে যাবে, এমনি সময়ে পরিষ্কার কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'ছাড়ুন।'

থতমত হয়ে গেল তৌফিক। কী পাজী মেয়েরে, বাবা! ছেড়েই তো দিচ্ছিলাম, রটাবার কি দরকার ছিল?

গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছেন বেলায়েত খান। ধোঁয়ার ভিতর থেকে তাঁর কপালে ওঠা চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে।

ধোঁয়ার জাল ফিকে হয়ে আসতে তিনি বললেন, 'পরশুদিন মিস রূপা চলে যাচ্ছেন প্রোক্সিমা সেঞ্চুরীতে, আই বিলিভ। আপনি সেইসময় জেলে থাকুন বা লিবিয়ায় কিংবা সুইটজারল্যাণ্ডে, ওখান থেকে মিস রূপার কাছে পৌঁছুতে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার কোটি মাইল পাড়ি দিতে হবে। পারবেন না যখন, খামকা মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?' সিরিয়াস লোক এই বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ—মনে মনে স্বীকার করল তৌফিক।

কিন্তু রূপার মধ্যে এতটুকু ভাবান্তর লক্ষ করল না সে। ডিজাইনের উপর আঙুল রাখল আলতোভাবে, 'এই হচ্ছে সেই জুয়েলারীর দোকান। ডাবল শাটার গেট। শনিবার বেলা একটা বাজতেই সামনের শাটারটা নামিয়ে দেয়া হয়, তবে পুরোপুরি নয়। ফ্লোর থেকে দেড় হাত ওপর পর্যন্ত। পিছনের শাটারটা তোলাই থাকে। দুই থেকে তি ঘণ্টা এই অবস্থায় থাকে দোকানটা। শাটার নামাবার পরপরই শো-রূমের অলঙ্কার একত্রিত করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ইনার চেম্বারে, ওখানেই স্ট্রংরূম।' আঙুল দিয়ে স্ট্রংরূমটা দেখাল রূপা। 'শো-রূমে থাকে দু'জন কর্মচারী। ইনার চেম্বারে যেখানে স্ট্রংরূম রয়েছে, মালিকপক্ষ, মাত্র দু'জন, সাপ্তাহিক হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে। দুই ভাই ওরা। একজন চশমা পরে, বয়স পঞ্চাশ; আরেকজন বত্রিশ, কানে কম শোনে। স্ট্রংরূমের চাবি থাকে বড় ভাইয়ের কাছে।'

রূপা ফাইল থেকে আরেকটা ডিজাইন বের করল। ডেস্কে সেটা মেলে দিতে তৌফিক দেখল ওই শপিং মার্কেটেরই নক্সা এটাও, তবে আরও ডিটেলস। সেটায় আঙুল রাখল রূপা।

'এইটা হলো সর্ব বামের দোকান, কিডিকার টয়েজ কোম্পানীর শো-রূম। এর পাশেরটা, এই যে, জুয়েলারী শপ।'

'কিডিকার টয়েজ একটা জেনুইন কোম্পানী,' মন্তব্য করলেন বেলায়েত খান। 'কোম্পানীর অন্যতম প্রোপ্রাইটার মি. তৌফিক আজিজ।'

মুখ তুলে তাকাল তৌফিক। কোন কথা বলল না।

রূপা বলল, 'কিডিকার টয়েজের দোকানটাও দু'ভাগে বিভক্ত। সামনের অংশটা শো-রূম। মাঝখানে পার্টেক্সের পার্টিশন। দ্বিতীয় অংশে অফিস-রূম। রূমটার চারদিকের দেয়ালে মোটা কাপড়ের পর্দা সিলিং থেকে নেমে এসেছে মেঝে পর্যন্ত।'

'দেয়ালটা ঢাকা ওই পর্দায়।' ডিজাইনে পেন্সিলের ছুঁচাল মাথা রেখে বেলায়েত হোসেন খান বললেন, 'আপনার অফিসরুম এবং জুয়েলারীর ইনার চেম্বারের মধ্যবর্তী দেয়ালের এই জায়গায় এই যে ছোট্ট লাল অ্যারো মার্কটা দেখছেন, এইখানে দু'ফুট স্কয়ার জায়গা নিয়ে দেয়ালের প্লাস্টার এবং ইঁট দীর্ঘদিন ধরে কুরে কুরে অপর দিকের প্লাস্টার পর্যন্ত পৌছানো গেছে। একটু জোরে শুধু ধাক্কা দেবার অপেক্ষা এখন, সাথে সাথে দু'ফুট স্কয়্যারের একটা হোল তৈরি হয়ে যাবে।'

তৌফিক বলল, 'ভিতরে ঢুকে কি দেখব?'

আমার মুণ্ডু দেখবেন, সম্ভবত এই জাতীয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বেলায়েত হোসেন খান, কিন্তু নিজেকে শান্ত রেখে বললেন, 'জানি না। বড় ভাইটার কাছে রিভলভার থাকে। হয়তো দেখতে পাবেন সেটা আপনার দিকে চেয়ে আছে।' বিরতি নিয়ে বললেন, 'পানির মত সহজ কাজ। চটের বস্তায় সোনার বার, অলঙ্কার এবং স্টোনগুলো ভরে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।'

দুপুর দুটো পর্যন্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হলো। রূপাও রইল সাথে। তার মন্তব্য ব্যাখ্যা ইত্যাদির তীক্ষ্নতা দেখে তৌফিক মনে মনে স্বীকার করে নিল, রেজরব্লেডের মত ব্রেন মেয়েটার, কোন ব্যাপারই তার দৃষ্টি এড়ায় না। তৌফিকের নিরাপত্তার জন্যে তার উৎকণ্ঠার অবধি নেই এটা সে গলা ছেড়ে ঘোষণা না করেও সুন্দর ভঙ্গিতে প্রমাণ করল প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

আলোচনা শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। একটা ব্রীফকেস দেয়া হলো তৌফিককে।

হোটেলে ফিরে প্রথমে ব্রীফকেসটা খুলল তৌফিক। ভিতরে একটা ল্যুগার পিস্তল। সাথে টাইপ করা ছোট্ট একটা চিরকুট:

Hard enough, but no harder.

মুচকি হাসল তৌফিক। পিস্তলটা পরীক্ষা করল। ভেবেছিল গুলি নেই. কিন্তু দেখল আছে। ওয়ারড্রোব খুলে প্যাকেটটা বের করল এরপর। খুলল।

হাসি হাসি মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে তৌফিকের। প্যাকেটের ভিতর থেকে বেরুল ছেঁড়া, নোংরা একটা গেঞ্জি, ছেঁড়া, নোংরা একটা সস্তাদামের লুঙ্গি, কাদামাখা একটা রাবারের জুতো, একটা ছেঁড়া, নোংরা জালের মত গামছা। ছোট্ট একটা কাগজের টুকরোয় বাংলা টাইপ মেশিন দিয়ে লেখা: প্রয়োজনে নিজের কাজ নিজেকে করতে হবে।

বিকেল তিনটের সময় বাইরে বের হলো তৌফিক। তালা কিনল একজোড়া। তালার বাক্স হাতে নিয়ে রিকশায় চড়ে ঠাটারী বাজারে ঢুকল। চটের দোকান থেকে দশটা চটের বস্তা কিনে দাম মিটিয়ে দিয়ে দোকানদারকে বলল, 'লোক পাঠিয়ে দেব নিয়ে যাবে সে।' একই রিকশায় চড়ে হাজির হলো বায়তুল মোকাররমে।

দোতলায় উঠে হাসি হাসি মুখ করে এগোল সে। জুয়েলারীর দোকানটা খোলা পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখল ভিতরে খদ্দেরের বেশ ভিড়। চশমা পরা

একজন লোককে দেখল এক মহিলা খদ্দেরের উদ্দেশ্যে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। নেতিবাচক ভঙ্গি।

একটু গম্ভীর হলো তৌফিক। যদি দেখত লোকটা ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে, খুশি হত সে।

কিডিকার টয়েজের সামনে দাঁড়িয়ে ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবি বের করল। তাকাল না কোনদিকে। তালা খোলার সময় অনুভব করল, কেউ একজন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছে করেই মুখ তুলল না। শাটারের নিচেটা ধরে উপর দিকে টান দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল। ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড় শব্দে উঠে গেল শাটার। ভিতরে ঢুকল সে। যেন অতি পরিচিত তার এই দোকান, পার্টিশনের মাঝখানে তালাবদ্ধ দরজাটার দিকে চোখ রেখে হাত বাড়িয়ে দিল ডানদিকের দেয়ালে। খুট্ করে শব্দের সাথে জ্বলে উঠল টিউব লাইট।

বেশ বড় শো-রুম। সুন্দরভাবে ফার্নিচার সাজানো। কিন্তু মালপত্র নেই, খালি।

পা বাড়িয়ে পার্টিশনের দিকে এগোবে, পিছন থেকে বিনীত সুরে লোকটা বলল, 'স্যার, এবার বুঝি খুলবেন দোকান?'

ঘুরে দাঁড়াল তৌফিক। গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে ইউনিফর্ম পরা হাতে রুলার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দেখল।

'হ্যাঁ। কাল দুপুরের দিকে মাল তুলব। সোমবার থেকে বেচাকেনা শুরু হবে। এই মার্কেটের দারোয়ান বুঝি তুমি?'

'জ্বী, স্যার। যখন যা দরকার লাগে বলবেন। আমার নাম জমির।' লোকটা ভিতরে ঢুকে পড়ল। 'ঝাড়ুদারকে ডেকে দেব স্যার? ধুলো জমেছে মেলা।'

তৌফিক বলল, 'তোমরা ক'জন পাহারা দাও?'

'দিনের বেলা আমি একাই, স্যার। রাত্রে চারজন মিলে পাহারা দেয়। আমরা সবাই তিন তলার একটা কামরায় থাকি···।'

তৌফিক বলল, 'একজন লোক দরকার আমার। বাজারে পাঠাব। চা-টা এনে দেবে, ঝাড়ু দেবে রোজ···।'

'এক্ষুণি দরকার, স্যার? ভাল লোক আছে আমার হাতে।'

'ডেকে আনো, দেখি কেমন লোক। চুরিটুরি করবে না তো?'

ইঞ্চিখানেক লালচে জিভ বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল জমির।

তৌফিক তাকে আর কথা বলতে দিল না, 'যাও তবে, নিয়ে এসো।'

বিকেল সাড়ে চারটের সময় দোকান বন্ধ করল তৌফিক। ইতিমধ্যে দারোয়ান জমিরের দেয়া ছোকরা বাতেনকে দিয়ে কেটলি, চায়ের কাপ, গ্লাস, ঝাড়ু ইত্যাদি কিনিয়ে আনল। চা খেলো দু'বার করে। জমিরকে আগাম বকশিশ দিল পাঁচ টাকা। বাতেন চটের বস্তা নিয়ে ফিরে আসতে তাকে জানাল, 'হপ্তায় বিশ টাকা করে পাবি ফাইফরমাশ খাটার জন্যে। প্রথম হপ্তার বিশটাকা রেখে দে এখন।'

নতুন কেনা তালা দুটো বাক্সের ভিতর থেকে বের করেনি সে। বাক্স দুটো অফিসরুমে রেখে বন্ধ করল সে শাটার।

পরদিন সকাল ঠিক সাড়ে ন'টায় ব্রীফকেস হাতে দোকানে পৌঁছুল সে। করিডর ধরে এগোবার সময় জুয়েলারী শপ এবং জুয়েলারীর মুখোমুখি অ্যাডভোকেটের চেম্বারটা দ্রুত দেখে নিল।

দোকানে বেশ ভিড়। মহিলা খদ্দেরই বেশি। চশমা পরা মালিকটাকে দেখতে পেল না সে। বিপরীত দিকে, অ্যাডভোকেটের চেম্বারে কেউ নেই। ইনার অফিসে কেউ থাকলেও জানবার উপায় নেই।

তালা খুলে আলো জ্বালতে না জ্বালতে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হাজির হলো বাতেন।

'এসেছিস? যা, চা নিয়ে আয়।'

বাতেনকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ব্রীফকেস নিয়ে অফিসরূমে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল তৌফিক। ব্রীফকেসটা রাখল টেবিলের উপর। ফোনটার দিকে তাকাল আড়চোখে। তারপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মোটা পর্দার সামনে।

পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে দেয়ালটা দেখল সে। গতকাল যেমন দেখে গিয়েছিল তেমনি আছে। উবু হয়ে বসল সামনে। পাকা লোক দিয়ে কুরে কুরে সিমেন্ট আর ইঁট খসিয়েছে বেলায়েত হোসেন নিখুঁত ভাবে। প্লাস্টারের অমসৃণ গা দেখা যাচ্ছে। ধাক্কা দিলে ভেঙে পড়বে তো? হাতুড়ীর কথাটা মনে পড়ে গেল তার। ড্রয়ারে আছে একটা। নিয়ে এসে রাখতে হবে এখানে।

বাতেন চা নিয়ে এল একটু পরই। অফিসরূমে বসে চা খেলো সে। 'যাহ্। সিগারেট আনতে বলিনি যে!'

'লৌর পাইরা লইয়া আইতাছি, হুজুর!'

দশ পনেরো মিনিট পরপরই বাতেনকে এটা ওটা কেনবার জন্যে বাইরে পাঠাতে শুরু করল তৌফিক। যখন তখন বাইরে যাবার হুকুম দিয়ে অভ্যস্ত করে তুলতে চাইছে ওকে। মেজাজটা যে কড়া, এটা প্রমাণ করল কারণে অকারণে ধমক মেরে। একসময় বলল, 'দুপুরের দিকে ট্রাকে মাল আসবে। নামাবি তুই। বস্তাপিছু দু'টাকা করে পাবি।'

'কয় বস্তা, হুজুর?'

'চল্লিশ-পঞ্চাশ বস্তা হবে।' ডেস্কের উপর পা তুলে দিল তৌফিক।

উল্লসিত দেখাল বাতেনকে। নতুন দোকানদার হুজুর দোকান খোলার শুরু থেকেই টাকা রোজগারের কত রকম রাস্তা খুলে দিচ্ছে! প্রত্যেকদিন যদি এত টাকার জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে দেয়, দশটাকা চোখ বুজে চুরি করা যাবে।

'যা, খেয়ে আয়,' সাড়ে বারোটার সময় বলল তৌফিক। 'দেরি হয় না যেন।'

দাঁড়িয়ে রইল বাতেন। খিদে পেয়েছে তার। কিন্তু হুজুরকে বলবার ইচ্ছা, খিদে পায়নি। কিভাবে বলবে কথাটা ভাবছে সে।

ধমক মারল তৌফিক, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে!'

'মাল আইব না, হুজুর?'

'দেরি আছে এখনও।'

চলে গেল বাতেন। খেতে নয়, নিচের রাস্তায় ট্রাক না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্যে। বস্তা পিছু দু'টাকা!—খেতে গিয়ে বঞ্চিত হতে চায় না সে।

ঠিক একটার সময় ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড় শব্দে পাশের দোকানের শাটার বন্ধ হয়ে গেল। ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে সিধে হয়ে বসল তৌফিক। সিগারেট ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। ড্রয়ার থেকে তালার বাক্স দুটো বের করে ডেস্কের উপর রাখল।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

রিসিভার তুলতেই বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না, মি. তৌফিক। নিয়মের হেরফের ঘটেছে এদিকে। বড় ভাই দোকানে নেই। আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়েছে, ফেরেনি এখনও। স্ট্রংরুমের চাবি সম্ভবত তার কাছেই। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।'

রিসিভার রেখে দিল তৌফিক। সিগারেট ধরাল আবার। দশমিনিট কেটে গেল। পায়চারি শুরু করে খানিকপর হঠাৎ থামল সে। পায়ের আওয়াজ না করাই উচিত। ডেস্কের উপর পা ঝুলিয়ে বসল।

'স্যার!'

দারোয়ান জমির। সাড়া দিল না তৌফিক। পরীক্ষা করে দেখা যাক, দরজা ঠেলে পর্দা সরিয়ে অফিসে উঁকি মারে কিনা।

আরও দু'বার ডাকল জমির।

বাইরের করিডরে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। উপর তলার কোথাও কোন শব্দ নেই। জমির চলে গেছে কিনা বুঝতে পারল না তৌফিক। রিস্টওয়াচ দেখল। দেড়টা বাজে।

ডেস্ক থেকে নেমে পার্টেক্সের পার্টিশনে কান ঠেকাল। জমিরও কি এভাবে কান ঠেকিয়ে আছে ওদিক থেকে?

ক্রিং ক্রিং...

দীর্ঘ পদক্ষেপে ডেস্কের কাছে এসে রিসিভার তুলে নিল তৌফিক।

'বড় ভাই এইমাত্র ঢুকল দোকানে। নার্ভাস এবং উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। দু'জন খদ্দের ছিল, বেরিয়ে যাচ্ছে তারা। শো-রুম থেকে মালগুলো স্ট্রংরুমে তোলা হয়ে গেছে কিনা বোঝবার কোন উপায় নেই, ট্রাক খানিক আগে রওনা হয়ে গেছে।'

'নার্ভাস কেন?'

'সম্ভবত পারিবারিক কোন দুঃসংবাদ পেয়েছে। মুশকিল হলো, দোকান এক্ষুণি বন্ধ করে দেবে কিনা বুঝতে পারছি না। চাবিটা কার কাছে ছিল এতক্ষণ, জানার উপায় নেই। ছোট ভাই যদি শো-কেসের মাল স্ট্রংরুমে তুলে ফেলে থাকে...'

সমস্যাটা টের পেল তৌফিক। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে দ্রুত চিন্তা করছে সে। দোকান যদি বন্ধ করে দেয়...

বাতেন ডাকল, 'হুজুর! টেরাক আইছে!'

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করে বলল তৌফিক, 'বস্তা নামিয়ে নিয়ে আয় একটা একটা করে। দেয়ালের পাশে সাজিয়ে রাখ।'

এক জোড়া পা ছুটে চলে যাবার শব্দ হলো।

রিসিভার থেকে হাত সরিয়ে নিল তৌফিক, 'ট্রাক পৌঁছে গেছে। কি করব এখন আমি?'

ডু অ্যাজ ইউ ওয়্যার অ্যাডভাইস্‌ড্‌।' কানেকশন কেটে দিলেন বেলায়েত হোসেন।

ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল তৌফিক। ডেস্ক থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে খুলল। ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড় শব্দে নামল একটা শাটার।

চমকে উঠে দরজার দিকে তাকাল তৌফিক। পরমুহূর্তে মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে। বাক্স খুলে তালা দুটো বের করে হাতে নিয়ে দরজা ঠেলে শো-রুমে বেরোল। তালা দুটো কোটের পকেটে রেখে ইতস্তত করল একমুহূর্ত। গেট পেরিয়ে করিডরে পা দিতেই দেখল সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে একজন লোক। সবটা দেখা গেল না, কাঁধ ও মাথাটা দেখা গেল শুধু। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে দেখল অ্যাডভোকেটের চেম্বারের শাটার বন্ধ, তালা ঝুলছে।

বেলায়েত হোসেন খান মজলিশকে ওই শেষ দেখা তৌফিকের।

খেলনাভর্তি বড় আকারের বস্তা মাথায় নিয়ে হাজির হলো বাতেন। বস্তাটা ধরে তার মাথা থেকে নামাতে সাহায্য করল তৌফিক।

'হুজুর, ডেরাইবোর কইতাছে হের জানাহুনা এক মিস্তি খানিকপর আইবো—হেও বস্তা নামাইবো।'

'নামাক। তোকে চল্লিশ টাকাই দেব'খন। যা, তাড়াতাড়ি কর। জমির কোথায়? ওকেও সাথে নে। বস্তা নামাবার সময় আমাকে আর ডাকাডাকি করিস না।'

হাঁপাতে হাঁপাতে চলে গেল বাতেন। করিডরে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল তৌফিক। দুটো ছাড়া আর সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। জুয়েলারী শপের বাইরের শাটারটা মেঝে থেকে দেড় হাত উপর পর্যন্ত নামানো। করিডরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে নিচের ফাঁকটার কাছে সাদাটে আলো দেখতে পেল, ভিতরে টিউব লাইট জ্বলছে।

জমিরের দেখা নেই। রিস্টওয়াচ ফলো করছে তৌফিক। বাতেন যাবার পর সাড়ে তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে।

পৌনে চার মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় বস্তা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বাতেন, 'জমির বাই আইতাছে। নিচের দোকানের তালাগুলি টাইনা দেইখ্যা সাইরা অহনই আইবো।'

বাতেন অদৃশ্য হয়ে যেতেই পা বাড়াল তৌফিক। জুয়েলারীর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সিঁড়ির দিকে চোখ রেখে একটা জুতো পরা পা তুলে দিল শাটারের হাতলের উপর, চাপ দিল জোরে। খটাশ করে নেমে গেল শাটার। তালা দুটো বেরিয়ে এসেছে পকেট থেকে হাতে। হাঁটু মুড়ে বসল। একটা তালা লাগিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'অ্যাই! কি!...কেরে! কে শাটার নামাল। অ্যাই! রজব! শাটার...!' শাটারের অপর প্রান্তে গিয়ে বসল তৌফিক। দ্বিতীয় তালাটা লাগাল দ্রুত হাতে।

সিঁড়ি জনশূন্য। করিডর ফাঁকা। দোকানের ভিতর থেকে চিৎকার করছে কয়েকজন মিলে। মুহুর্মুহুঃ দুমদাম ঘুসি পড়ছে শাটারের গায়ে।

অফিসে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল তৌফিক ভিতর থেকে। ব্রীফকেস খুলে ছেঁড়া, নোংরা গামছা-লুঙ্গি-গেঞ্জি-জুতো আর নকল দাড়ির উপর থেকে

পিস্তলটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। চটের একটা বস্তা হাতে নিয়ে পর্দা সরিয়ে বসল দেয়ালের সামনে। মেঝে থেকে তুলে নিল হাতুড়িটা। বিরতি না নিয়ে সিমেন্ট-ইঁট খসানো চারকোনা জায়গার প্রত্যেক কোনায় একটা করে ঘা মারল।

নিখুঁত একটা চারকোনা গরাদহীন জানালা তৈরি হয়ে গেল। মাথা গলিয়ে দিয়ে ভিতরে তাকাল তৌফিক। কাউকে দেখতে না পেয়ে শরীরটা গলিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢুকে সিধে হয়ে দাঁড়াল। স্ট্রংরুমটা পুবদিকের দেয়ালে। কমবিনেশন লক দেখেই বুঝল। আর একবার মুণ্ডুপাত করল সে মনে মনে বেলায়েত হোসেন খানের। বলেনি কেন! কাঠের পার্টিশন, পার্টিশনের ওদিকের পিঠে ফরমিকা লাগানো, এদিকটা ন্যাড়া। দরজাটা মাঝখানে। ভেজানো রয়েছে। তিন চারজন একযোগে চেঁচামেচি করছে, কারও কথাই বোঝা যাচ্ছে না।

কিন্তু জমিরের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার কানে ঢুকল তৌফিকের।

'তালা লাগাল কে···ভাঙতে বলছেন, কি দিয়ে ভাঙব···! অ্যাই বাতেন, দাঁড়া। লোক ডাক···।'

ভেজানো দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল তৌফিক। জুলফির কাছে সড়সড় করছে চলমান একটা ঘামের ধারা। কানসহ কাঁধে ঘষল সে জুলফিটা।

দরজার ফাঁকে চোখ রাখল সে। বন্ধ শাটারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। হাত নেড়ে, ঠোঁট নেড়ে তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে চারজনই।

সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না তৌফিক। রিভলভার দেখিয়ে চারজনকেই চুপ করানো যায়, কিন্তু তাতে করিডরের লোকগুলোকে সব জানিয়ে দেয়া হয়। জমিরের আদেশ জারি করার বহর দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, বাতেনকে দিয়ে অনেকগুলো লোককে তুলে আনছে সে দোতলায়।

পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে সময় আঙুলের ফাঁক গলে। তালা ভাঙতে কতক্ষণই বা লাগবে! হয় এখুনি, নয়তো কখনোই নয়!

দরজা ঠেলে শো-রুমে ঢুকে পড়ল তৌফিক। পিছন ফিরল না কেউ। ছোট্ট লাফ দিয়ে কাউন্টারের ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। চশমাধারী ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেখে ঝুপ করে বসে পড়ল।

উঁকি দেবার দরকার হলো না, পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

'বড়দা, রিভলভারটা!'

শোরগোলকে ছাড়িয়ে গেল কণ্ঠস্বরটা। পরমুহূর্তে পার্টিশনের দরজার কবাট দুটো বাড়ি খেলো কাঠের দেয়ালের সাথে। তৌফিকের নিতম্ব ঠেকে আছে কাঠের দেয়ালের গায়ে, কম্পনটা টের পেল সে।

বড়দা, ধন্যবাদ! মনে মনে উচ্চারণ করে উঁকি দিল তৌফিক। তিনজনই আগের পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট লাফ দিয়ে দরজার কাছে, সেখান থেকে দরজাটাকে কাল্পনিক ধরে নিয়ে দমকা বাতাসের মত স্যাৎ করে ইনার চেম্বারের ভিতর। গায়ের ধাক্কায় কবাট দুটো খুলল, তারপর জোড়া লাগল—ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে দোলাটা।

স্ট্রংরুমের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে রিভলভারটা বের করে নিচ্ছে বড়দা, তৌফিক তার কাঁধের উপর দিয়ে এক হাত বাড়িয়ে ছিনিয়ে নিল সেটা, অপর হাত

বগলের নিচে দিয়ে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরল মুখটা।

বুকের সাথে জড়িয়ে ধরা গোলগাল দেহটা মুহূর্তে কংক্রিটের পিলার হয়ে, পরক্ষণে সেটা ডাঙায় তোলা কাতলা মাছে পরিণত হলো। ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত রোগীর মত শিরদাঁড়া বাঁকা করে সেকেণ্ডে পঁচিশবার ঝাঁকুনি দিচ্ছে। তৌফিকের দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকানো লুগারখানা পড়ে গেল মেঝেতে, বড়দা পিছলে বেরিয়ে গেল আলিঙ্গনের বেষ্টন থেকে। চশমাটা ঠক্ করে পড়ল স্ট্রংরুমের সামনে, চার টুকরো হয়ে গেল কাঁচ দুটো।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। তৌফিকের কানের পর্দায় একের পর এক প্রচণ্ড ঘা পড়ছে—শাটারের উপর হাতুড়ির কঠিন বাড়ি মারছে জমিরের দল।

হঠাৎ সন্দেহ হলো, বড়দা কি উড়ন্ত প্রজাপতি ধরার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে অমন ছুটোছুটি করছে? পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল তৌফিক। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসছে লোকটার নাক-মুখ থেকে, এলোপাতাড়ি ছুটছে এদিক সেদিক। সটান গিয়ে দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকল, দিক পরিবর্তন করে দু'হাত বাড়িয়ে এগোতে গিয়ে একটা টুলকে ঠেলে নিয়ে গেল হাত দুয়েক, হোঁচট খেয়ে টুলটাকে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। উল্টে পড়া টুলটার হাতা খামচে ধরল এক হাতে, অপর হাতে ঘুসি তুলল।

চশমা ছাড়া এ লোক পুরোপুরি অন্ধ। এগিয়ে গিয়ে অন্ধ বড়দার মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে ছোট্ট একটা ঘা মারল তৌফিক। জ্ঞান হারাল কি হারাল না দেখবার জন্য অপেক্ষা না করে হাতের রিভলভারটা পকেটে ভরে নিচু হয়ে তুলে নিল লুগারটা। দেয়ালের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। চটের বস্তাটা তুলে নিয়ে চলে এল স্ট্রংরুমের সামনে। থরে থরে সাজানো রয়েছে সোনার বার। উপরের শেলফে পঞ্চাশ এবং একশো টাকার বিশটা নোটের বাণ্ডিল। এগুলো উপরি পাওনা। নিচের বাকি তিনটে শেলফে লাল এবং সোনালি রঙের কাভারওয়ালা অলংকারের অসংখ্য বাক্স। কালো রঙের একটা অ্যাটাচীকেস মাঝখানের শেলফে। ওটাতেই সম্ভবত স্টোনগুলো আছে।

পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে বস্তার মুখ খুলে ভিতরে ফেলল তৌফিক। স্যুট খুলে দ্রুত নগ্ন হলো। পোশাকগুলো ফেলল বস্তার ভিতর।

দেড় মিনিটের মধ্যে ভারি বস্তাটা টেনে নিয়ে নিজের অফিসে পৌছুল তৌফিক। ব্রীফকেস থেকে লুঙ্গিটা তুলে নিয়ে পরল। গেঞ্জিটা ছুঁলো না। গামছাটা বাঁধল মাথায়, দুটো প্রান্ত ঝুলে রইল কানের দুপাশে। জুতোটাও ধরল না। ছাগলদাড়ি লাগাল চিবুকে। পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল কোমরে।

একযোগে উল্লসিত ধ্বনি ছাড়ল করিডরের ভিড়টা। মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে রইল তৌফিক। এক সেকেণ্ড পরই ডেস্ক থেকে চাবি তুলে নিয়ে দরজার তালা খুলে এক ইঞ্চি ফাঁক করল কবাট।

শো-রুমে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে খেলনার বস্তা। লোক নেই। ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারি বস্তাটা দু'হাত দিয়ে ধরে তুলে নিল মাথায়। বস্তাটা এক হাত দিয়ে ধরে, অপর হাত দিয়ে কবাট খুলে বেরিয়ে এল।

করিডরে দশ-বারোজন লোক হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় তালাটার

গায়ে অবিরাম ঘা মারছে জমির, পাগুলোর ফাঁক দিয়ে তার খাকী ইউনিফর্মটা দেখা যাচ্ছে। বাতেন দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। বিচলিত, অস্থির দেখাচ্ছে তাকে।

ভিড়টার কাছে পৌঁছুল তৌফিক। দাঁড়াল না। পাশ ঘেঁষে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে সে।

আবার একবার সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল ভিড়টা। দুটো তালাই ভাঙা হলো।

ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড় করে শাটার ওঠার শব্দ ঢুকল কানে। বাঁক নিয়ে একসাথে দুটো করে ধাপ টপকাচ্ছে তৌফিক।

নিচে নেমে ফাঁকা এলাকাটা ছুটে অতিক্রম করল। রাস্তার অপরপারে দাঁড়িয়ে আছে স্টার্ট দেয়া বেডফোর্ড ট্রাকটা। একবার দেখে নিল এদিক ওদিক। ছুটতে ছুটতে রাস্তা পেরিয়ে ট্রাকের সামনে দিয়ে চলে গেল অপর দিকে। ট্রাকের সামনে দিয়ে এগোবার সময় দেখল দাড়ি গোঁফহীন নাবালক এক কিশোর ড্রাইভিং সীটে বসে আছে। নতুন লাল একটা গামছা দিয়ে মাথাটা জড়ানো। ঘামে ভেজা মুখ, উদ্বেগাকুল দৃষ্টি।

দু'হাত দিয়ে ধরে মাথা থেকে তুলে ছুঁড়ে দিল তৌফিক বস্তাটাকে। রেলিং টপকে ট্রাকের মাঝখানে গিয়ে পড়ল সেটা সশব্দে। পাদানিতে উঠে জানালা দিয়ে গলিয়ে দিল মাথাটা, 'অপারেশন সাকসেসফুল, রূপা।'

ট্রাক ইতিমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে। স্পীড বাড়িয়ে চলেছে রূপা ব্যস্ততার সাথে।

ট্রাকের উপর উঠে ফাঁকা জায়গাটায় শুয়ে পড়বার আগে পিছন দিকে চোখ পড়ল তৌফিকের। শপিং মার্কেটের সামনের রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে আসছে লোকজনের ভিড়টা। খাকী ইউনিফর্মটা দূর থেকেও চিনতে পারল সে। ট্রাকটার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে জমির।

বস্তাগুলোর একপাশে একটা সতরঞ্জি পরিপাটি করে ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। তার উপর একটা ব্রীফকেস। বসে পড়ল সে ধুলোবালির উপর।

সতরঞ্জিটা বিছিয়ে সেটার উপর শুয়ে পড়ল তৌফিক। হাত বাড়িয়ে টেনে নিল ব্রীফকেসটা। তালা মারা নেই, খুলতে ঝামেলা পোহাতে হলো না। একে একে বের করল মোজা, চকচকে জুতো, শার্ট এবং কমপ্লিট স্যুট।

শুয়ে শুয়ে নগ্ন হলো সে। ব্রীফকেসে ভরে রাখল লুঙ্গি, গামছা, নকল দাড়ি। শুয়ে শুয়েই নতুন পোশাক পরে নিল। উঠে বসে সামনের দিকে তাকাতে দেখল মাথার পিছনের চারকোনা ফোকর দিয়ে রূপা ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। চোখাচোখি হতে মাথা কাত করে ইঙ্গিত করল দ্রুত।

মন্থর হয়ে আসছে ট্রাকের স্পীড। শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছে ট্রাক। উঠে দাঁড়াল তৌফিক। এগিয়ে গিয়ে রেলিং টপকে নামল পাদানিতে জানালার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কবাট খোলার জন্যে ছিটকিনি খুঁজতে শুরু করতে রূপা তার হাতটা চেপে ধরল, 'না।'

হাতটা ফিরিয়ে নিল তৌফিক। আরও স্পীড কমিয়ে আনল রূপা ট্রাকের ছুটছে না, ট্রাকটা এখন হাঁটছে। নির্জন, ফাঁকা মধ্যাহ্নকালীন এশিয়ান হাইওয়ে

লাফ দিয়ে নেমে ট্রাকের সাথে কয়েক পা এগোল সে। হাত তুলে বিদায় জানাতে যাবে, স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে ট্রাকটাকে তীর বেগে ছুটিয়ে দিল রূপা। অল্পক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা চোখের সামনে থেকে।

একা দাঁড়িয়ে রইল তৌফিক রাস্তার উপর উজ্জ্বল রোদে।

দুই

তখন দিনের আলো লোপাট হয়ে গেছে ঢাকার আকাশ থেকে।

ইন্টারকন। রুমের বাতাসে শ্যানেল-৫ এর গন্ধ ভাসছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট দুটো গোল করে শিস দিচ্ছে তৌফিক আজিজ, হাতে হুইস্কির গ্লাস। ছয়তলা থেকে আলোকমালায় সাজানো ঢাকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকটা টনটন করে উঠল ওর। ঢাকা, আমার ঢাকা!

কিন্তু স্বাধীনভাবে এই শহরের বুকে ওর বিচরণ করার অধিকার কেড়ে নেবার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কি যে হয় কে জানে! আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে সুইটজারল্যাণ্ড রওনা হবার কথা ওর।

পইপই করে নিষেধ করে দিয়েছেন বেলায়েত হোসেন খান হোটেল ছেড়ে বাইরে না বেরুতে—কিন্তু মারো গুলি! আবার কবে সুযোগ আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করা—অসম্ভব! সময় থাকতে দেখে নাও রাতের ঢাকাকে।

দু'চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে রুমের মাঝখানে ফিরে এল ও। গ্লাসটাকে দাঁড় করিয়ে দিল টেবিলের উপর—ঠকাশ। সিগারেট ধরিয়ে সিলিংয়ের দিকে রিঙ ছাড়ল চার-পাঁচটা। তারপর ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে বলল, 'তিন মিনিটের মধ্যে নিচে নামছি আমি। রেন্ট-এ-কার-এর একটা গাড়ি দরকার আমার।··· হেডপোর্টারের সাথে যোগাযোগ করুন। আমার সবরকম বিল সম্পর্কে তাকে নির্দেশ দেয়া আছে···থ্যাঙ্কস।'

রিস্টওয়াচ দেখল ও। সাড়ে সাতটা। লাইটারটা লুফতে লুফতে ওয়ারড্রোবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দুটো মাত্র স্যুট, বাছবিচার করার সুযোগ নেই। লাইট-ব্লু কালারের স্যুটটা বের করল ও।

তৈরি হয়ে আড়াই মিনিটের মাথায় দরজার নব ধরতে যাবে, সেটা ঘুরতে শুরু করল। হাতটা ফিরিয়ে নিল তৌফিক। খুলে গেল কবাট।

'হ্যাণ্ডস আপ!'

মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল লোকটার, কড়া ভাঁজের সাদা শার্ট এবং ট্রাউজার পরনে, হাতে পুলিস অটোমেটিক, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'পাশের অবশিষ্ট ফাঁক গলে স্যাঁত্ স্যাঁত্ করে আরও দু'জন ঢুকে এল ঘরের ভেতর। তৌফিকের পিছনে চলে গেল তারা।

'মানে?' দৃঢ় কণ্ঠে ব্যাখ্যা দাবি করল তৌফিক।

'আপনি তৌফিক আজিজ, পিতা তোফায়েল আহমেদ?'

এরা পুলিস বুঝতে পারছে তৌফিক। বলল 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে হাইজ্যাক করে পাবেন না কিছু। আমি একজন সাধারণ টুরিস্ট···।'

মুক্ত বাঁ হাতটা ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়েই বের করে আনল লোকটা একটা নীল রঙের আইডেনটিটি কার্ড, আর একটা সাদা কাগজে ছাপা ফর্ম বেরিয়ে এসেছে হাতে।

'আমরা পুলিস।' বুড়ো আঙুলের মাথা ঠেকাল লোকটা নিজের বুকে। 'ইন্সপেক্টর রাশেদ। ওরা এ. এস. আই. খসরু আর সায়েদ। ওয়ারেন্ট আছে, সার্চ করব আপনার রুম। আশা করি সহযোগিতা করবেন।'

চরম বিরক্ত দেখাল তৌফিককে। 'পুলিস! সার্চ ওয়ারেন্ট—এসব কি? কেন?'

চোখের কালো তারা নেড়ে নির্দেশ দিল ইন্সপেক্টর রাশেদ। এ. এস. আই. সায়েদ এক'পা এগিয়ে পিছন থেকে তৌফিককে সার্চ করতে শুরু করল।

'লিবিয়া থেকে টুরে এসেছি এই মাত্র গতকাল। ঢাকায় আমি নতুন···

'জানি, মি. তৌফিক।'

তার মানে, সব খবর সংগ্রহ করে নিয়েই এসেছে। মেট্রোপলিটান পুলিস তাহলে অথর্ব নয়।

পুলিস অটোমেটিকের হুমকি অগ্রাহ্য করে ঘুরে দাঁড়াল তৌফিক। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে বসল সোফায়। প্যাকেট তুলে নিয়ে সিগারেট বের করে ধরাল। না তাকিয়েও বুঝতে পারল দরজার কাছ থেকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে চার হাত সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে ইন্সপেক্টর রাশেদ, চোখের পাতা নড়ছে না তার।

পিস্তলটা পেল ওরা ওর ওয়ারড্রোব থেকে। সার্চ শেষ করে এ. এস. আই. খসরু জানাল, 'নেই, স্যার।'

'কি নেই? কি খুঁজছেন আপনারা?' টেবিলের উপর দু'পা তুলে লম্বা করে দিয়ে বলল তৌফিক।

'পিস্তলের লাইসেন্স আছে আপনার?'

'না,' বলল তৌফিক। 'আমার পিস্তলই নেই, লাইসেন্স থাকবে কেন?'

'এটা তাহলে কার?' এ. এস. আই. সায়েদের হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে দেখাল ইন্সপেক্টর।

'জানি না।' হুস্-স্ হুস্-স্—সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল তৌফিক। 'ফাঁসাবার জন্যে কেউ হয়তো রেখে গেছে। নাকি আপনারাই সাথে করে নিয়ে এসেছেন?'

ইন্সপেক্টর অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'সোনা, টাকা, স্টোন—কোথায় রেখেছেন সব?'

'সোনা? টাকা? স্টোন?' আচমকা তৌফিক হাহ্-হাহ্ করে হাসতে শুরু করল।

হাসির এক একটা দমক এক একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে সূঁচের মত বিঁধছে ইন্সপেক্টরের গায়ে। ঘেউ করে উঠল সে, 'থামুন!'

টেবিল থেকে পা নামিয়ে সটান ঋজু হয়ে দাঁড়াল তৌফিক, 'পুলিসী অভদ্রতার বিরুদ্ধে আমি আমাদের দূতাবাসকে অবহিত করতে চাই।' ফোনের দিকে তাকাল, কিন্তু হাত বাড়াল না।

এতটুকু ভাবান্তর ঘটল না ইন্সপেক্টরের চেহারায়। হাসি থামাবার জন্যে ধমক মারলেও মুখের চেহারা পরিবর্তন হয়নি। খানিকটা যেন গম্ভীর কিন্তু পুরোপুরি শান্ত। যতটা আশা করা যায় তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু জানে যেন সে।

'দূতাবাসে এরই মধ্যে যোগাযোগ করেছি আমরা,' বলল। 'আপনার সম্পর্কে তারা বিশেষ কিছু জানে না, মাথা ঘামাতেও রাজি নয়। তবে আমরা জানতে পেরেছি, ত্রিপোলী সেন্ট্রাল জেলে আপনি ডিটেনশনে ছিলেন তিন মাস। উপযুক্ত সাক্ষী-সাবুদের অভাবে আপনার সাজা হয়নি। আপনাকে আটক রাখা হয়েছিল একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে।'

হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হলো তৌফিকের কটমট করে চেয়ে আছে ইন্সপেক্টরের চোখের দিকে। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে উঠছে থেকে থেকে।

'সবই দেখছি জানেন,' বিদ্রূপ প্রকাশ পেল তৌফিকের বলার ভঙ্গিতে।

'সব নয়, যতটা প্রয়োজন জানি। আটচল্লিশ লাখ টাকার জিনিস ডাকাতি করেছেন আজ আপনি। আপনি খুব ভাল করেই জানেন, এখন থেকে বাকিটা জীবন আপনাকে বাংলাদেশের এ-জেল ও-জেলে কাটাতে হবে।'

'তাই নাকি?' তির্যক দৃষ্টি হানল তৌফিক।

'আজ দুপুরে যে ডাকাতি করেছেন তার জন্যে নয়, আরও অনেক বড় একটা অপরাধের জন্যে।' ইন্সপেক্টরের কণ্ঠস্বর সেই আগের মতই শান্ত, অনেকটা একঘেয়ে। 'আপনি আবার ঢাকায় ফিরে এসেছেন, আমাদের জন্যে এটা পরম সৌভাগ্য। গত ছয় বছর ধরে খুঁজেছি আমরা আপনাকে।' লোকটা এই প্রথম হাসল, হাসিটা যদিও নিতান্তই ছোট্ট এবং নিস্তেজ। 'আপনিই তো সেই কুখ্যাত রাজাকার এবং খুনে ডাকাত তৌফিক আজিজ খান, তাই না?'

তৌফিকের চকচকে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আড়চোখে তাকাল সে নিজের দু'পাশে। এ. এস. আই. সায়েদ এবং খসরু সুযোগ খুঁজছে লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়ার জন্যে।

ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল তৌফিক কপালে ভাঁজ তুলে শ্রাগ করল। বাঁকা হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। কিন্তু বলবার মত কিছুই নেই যেন তার। চুপ করে থাকল।

'আপনার বিচারের সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন না।' ইন্সপেক্টর আবার ঘ্যানঘ্যান শুরু করল। 'মহামান্য বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে আপনার অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হন। তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আপনাকে।' একটু বিরতি নিয়ে সে বলল। 'মি. তৌফিক আজিজ, এর বেশি আমি আর কিছু জানি না। কিন্তু এটুকুই কি আপনাকে গ্রেফতার করার জন্যে যথেষ্ট নয়?'

'কোথায়? বল কোথায় রেখেছিস! এই কুত্তার বাচ্চা, শুনছিস, তোর রক্ত দিয়ে গোসল করব আজ আমরা। গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ছিঁড়ে আনব কলজেটা⋯।'

ছোট্ট একটা জানালাহীন হাজত-ঘর। আড়াইশো পাওয়ারের বালব জ্বলছে তৌফিকের চোখের কাছ থেকে আধহাত দূরে। চেয়ারের পিঠের সাথে তার বুক,

পায়ার সাথে পা দুটো দড়ি দিয়ে আঁট করে বাঁধা। পিছনে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাণ্ডওয়ালা একটা মেশিন, মেশিনের দুটো ইস্পাতের বাহু তার মাথার দু'পাশ চেপে ধরে রেখেছে। বিদ্যুৎচালিত এই টরচার মেশিনটি ইয়াহিয়া খান উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছিল রাজাকার-আলবদরদের। বলাই বাহুল্য, মেশিনটাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে কোন ত্রুটি করেনি তারা।

থানা হেডকোয়ার্টারের চার্জে আছে ইন্সপেক্টর ওয়াহিদ রেজা। তার মাথাতেই বুদ্ধিটা আসে। অনেক খোঁজ-খবর করে মেশিনটা আনিয়েছে সে।

তৌফিকের চোখের উপরের পাতাগুলো আলপিন দিয়ে গেঁথে আটকে রাখা হয়েছে ভুরুর নরম মাংসের সাথে। পলক যাতে ফেলতে না পারে।

'আমি ডাকাতি করিনি।'

প্রথম কয়েক ঘণ্টা টুঁ-শব্দটিও করেনি তৌফিক। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়েছে খানিকক্ষণ। আলোর তীব্র আঘাত এবং চোখের পাতা ফেলতে না পারার ফল, কান্না নয়। তারপর ফুলে উঠেছে চোখের চারপাশে, মণি দুটোর চারদিকের সাদা অংশ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

ভোরের দিকে প্রথম মুখ খোলে সে। তারপর থেকে ঝাড়া ছয় ঘণ্টা অর্থাৎ বেলা দশটা পর্যন্ত চারজন পুলিস ইন্সপেক্টর এবং দু'জন সি.আই.ডি. অফিসার নাকানি-চোবানি খেয়েছে ওকে জেরা করতে গিয়ে। একই কথা তৌফিকের, 'ডাকাতি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।'

পুলিসের কাছে একটা জিনিস দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল: এ লোক ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় একটা ব্যাপারে তারা একমত হলো: তৌফিক আজিজ জানে তার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, তার মানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তাকে ভোগ করতেই হবে। ডাকাতি করা মালামালের সন্ধান সে দিক বা না দিক, পূর্ব-অপরাধের শাস্তির পরিমাণ ওই একই থাকবে, কমবে না। সুতরাং, সে যদি স্থির করে থাকে, মালামালের সন্ধান দেবে না পুলিসকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সময়-সীমা হলো বিশ বছর। বিশ বছর পর সে মুক্তি পাবে। মালামালের সন্ধান যদি সে না দেয়, বিশ বছর পর তা উদ্ধার করে ভোগ করতে পারবে সে। আর পুলিসকে যদি জানিয়ে দেয় সন্ধান, বিশ বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে ভিক্ষা করতে হবে তাকে। এই অবস্থায়, মালামালের সন্ধান সে দেবে এমন আশা করা যায় না।

বেলা এগারোটায় সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে চালান দেয়া হলো আসামীকে। বিকেল পাঁচটার পর প্রিজন ভ্যানে তুলে আবার নিয়ে আসা হলো হাজতে।

চোখ দুটো লাল এবং ফোলা ফোলা তৌফিকের, এ ছাড়া আর কোন বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে না।

কৈ মাছের জান শালার, মনে মনে স্বীকার করল ইন্সপেক্টর রেজা ডাঁট দেখাতে এতটুক কার্পণ্য করছে না। ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেটের জন্যে দু'বার গম্ভীর ভাবে তাগাদা দিয়েছে, কিনে না দিয়ে পারেনি সে। রাজাকার হোক আর আলবদর হোক, আটচল্লিশ লাখ টাকার মালিক তো বটে। তার চেয়ে বড়

কথা, লোকটার মধ্যে ভয়-ডরের কোন বালাই নেই। ব্যক্তিত্ব তার এমনই যে থতমত খেয়ে যেতে হয় উল্টোপাল্টা কিছু করতে বা বলতে গেলেই।

করিডরে পাঁচজন লোক অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। সবাই বেশ লম্বা-চওড়া চেহারার, তৌফিকের মতই। ইন্সপেক্টরের ইঙ্গিতে তৌফিকের সাথে অফিসরুমে ঢুকল তারাও।

সামনের অফিসরুমে ঢুকে তৌফিক দেখল দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ছয়জন বেকুব চেহারার লোক। একজন তাদের মধ্যে ষোলো সতেরো বছরের কিশোর। এই ছোকরাই খানিকপর তার অট্টহাসির কারণ হয়ে উঠল।

ইনার অফিসে ঢুকে সোজা চেয়ারে গিয়ে বসল তৌফিক দরজার দিকে মুখ করে। হাতের প্যাকেট খুলে বের করল সিগারেট। হাত পাতল ইন্সপেক্টর রেজার দিকে, 'আমার গ্যাস লাইটারটা আপনার পকেটে, বের করুন।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ইন্সপেক্টর, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে, পকেট থেকে বের করে দিল লাইটারটা।

সিগারেট ধরিয়ে দু'পাশে তাকাল তৌফিক। লোক পাঁচজন বসেছে তার দু'পাশের চেয়ারগুলোয়।

ইন্সপেক্টর রাশেদ একজন মধ্যবয়স্ক লুঙ্গি পরা লোককে পাশের রুম থেকে ডেকে নিয়ে এল। ছয়জনের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। একে একে প্রত্যেকের দিকে একবার করে তাকাল, সবশেষে দ্বিতীয়বার দেখল তৌফিককে। আঙুল তুলল তার দিকে, 'ওই লোকটা।'

জীবনে কখনও দেখেনি তৌফিক তাকে।

এরপর এল সাতাশ আটাশ বছরের এক যুবক, প্যান্ট-শার্ট পরা। কাছাকাছি না পৌছেই থমকে দাঁড়াল সে, 'ব্যাটা গুণ্ডা, কাছে যেতে ভয় করছে!'

ইন্সপেক্টর রাশেদ বলল, 'এদের মধ্যে কে সে?'

তৌফিকের দিকে আঙুল তুলল যুবক, 'চোখ দুটো দেখুন, কেমন খুনের নেশায় লাল হয়ে আছে—একেই আমি শাটারে তালা লাগাতে দেখেছি।'

এরপর এল কিশোর প্রতিভা। বাকি দু'জনের মত একেও কখনও দেখেনি তৌফিক। একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়াল সে। অন্য পাঁচ জনের দিকে তাকালই না সে।

বলল, 'এই লোক পঞ্চাশ টাকা দিছিল আমারে, কইছিল স্বর্ণের দোকানের দরজায় তালা লাগাইতে অইবো। কাম সাইরা আমু—এই কথা কইয়া পলাইয়া গেছিলাম।'

হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠল তৌফিকের। কিন্তু সে হাসছে দেখে হতভম্ব হয়ে উঠল উপস্থিত সবাই, কিশোর প্রতিভা প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে নাক থেকে পতনোন্মুখ চশমা সামলাতে সামলাতে সবশেষে এল বড়দা। কাঁচ বদলেছে সম্ভবত। কিংবা এটা আরেক জোড়া চশমা কিনা বুঝতে পারল না তৌফিক।

বড়দা বেশ খুঁটিয়ে দেখল। এত বেশি ঝুঁকে পড়ল তার উপর, মুখে বড়দার নিঃশ্বাসের ছোঁয়া অনুভব করল তৌফিক।

সিধে হয়ে দাঁড়াল মিনিটখানেক পর। দু'পাশে দাঁড়ানো ইন্সপেক্টরদের দিকে তাকাল। তারপর কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে, 'ফকির হয়ে গেছি আমি! স্যার, লোকটাকে বলুন, যা চায় তাই দেব···পাঁচ লাখ দেব, দশ লাখ দেব—ফিরিয়ে দিক সব।'

ইন্সপেক্টর রেজা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে দিতে শোকাকুল বড়দাকে বাইরে নিয়ে চলে গেল।

ইন্সপেক্টর রাশেদের দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল তৌফিক। বলল, 'খুব কাজ দেখিয়েছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার খোঁজ দিল কে?'

রাশেদ উত্তর দেবে না সিদ্ধান্ত নিয়ে পরমুহূর্তে মত পরিবর্তন করল। বলল, 'অজ্ঞাতনামার তরফ থেকে একটা টেলিফোন কল আপনাকে ডুবিয়েছে।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'কোর্ট হাজতে পাঠাচ্ছি এখন আপনাকে। ওখান থেকে আগামীকাল সকালে ট্রাইবুনালের সামনে হাজির করা হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ যা আছে, আগামীকালই রায় হয়ে যাবে আপনার। জানা শোনা কোন উকিল যদি থাকে তার নাম বলুন···।'

'ঢাকায় আমি নবাগত, কাউকে চিনি না।'

রাশেদ বলল, 'সরকার আপনাকে একজন উকিল দিয়ে সাহায্য করবেন সেক্ষেত্রে। আচ্ছা, মি. তৌফিক, ব্যাপারটা কি? মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অত লক্ষ টাকার মাল আপনি সরালেন কোথায়, কিভাবে? আপনার সহযোগী কেউ ছিল নিশ্চয়ই, সে কি ফাঁকি দিয়ে···'

'কিসের মাল? কে আমার সহকারী? আপনাদের কোন কথাই আমি বুঝতে পারছি না।'

'মি. তৌফিক, ধরা যখন পড়ে গেছেন, যাবজ্জীবন জেলখানায় আপনাকে কাটাতেই হবে। বিশ বছর পর মালগুলো উদ্ধার করতে পারবেন এই আশা যদি করে থাকেন, ভুল করবেন। কারও না কারও হাতে আছে সেগুলো—বিশ বছর পর বেরিয়ে দেখবেন তার পাত্তা নেই। তার চেয়ে নাম বলুন তার, তাকেও আমরা আপনার সাথে একই জায়গায় পাঠিয়ে দিই।'

তৌফিক গম্ভীর। বলল, 'বিরক্ত করবেন না। আপনিও আর সকলের মত ভুল করছেন, আমি নিরপরাধ।'

পরদিন সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আগে তৌফিককে সুযোগ দেয়া হলো তার উকিলের সাথে নিভৃতে আলাপ করার জন্যে।

ভদ্রলোক ছোটখাট, দাড়ি আছে, টুপি পরনে। সুন্দর কথা বলতে জানেন। তৌফিককে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রথমেই তিনি বললেন, 'মি. তৌফিক, আমার চোখে আপনি অপরাধীও নন, নিরপরাধীও নন। আপনি আসলে দুটোর মধ্যে কোনটা তা নির্ধারণ করবেন বিচারক। আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আপনার যা যা বলবার আছে আপনি আমাকে তা বলবেন, আমার কাজ সেগুলো গুছিয়ে, সাজিয়ে এবং বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে বিচারকের বিবেচনার জন্যে দাখিল করা। এখন দেখা যাক, আপনার বিরুদ্ধে পুলিস কি অভিযোগ এনেছে।'

অভিযোগটা উকিলের মুখ থেকে আরও একবার শুনল তৌফিক। আটচল্লিশ লাখ সাত হাজার ছাপ্পান্ন টাকার সোনা এবং স্টোন ডাকাতি সেই সাথে হত্যার অপচেষ্টা।

তৌফিক আপনমনে হাসছে দেখে উকিল সাহেবের ভুরু কুঁচকে উঠল। তৌফিক হাসছিল বেলায়েত হোসেন খানের কথা মনে পড়ে যেতে। লোকটা যা আশা করেছিল তার চেয়ে বেশি টাকা ডাকাতি করেছে সে।

'জামিনের জন্যে আবেদন করব আমি, কিন্তু সম্ভবত নামঞ্জুর হবে সেটা,' উকিল বললেন। 'সংবাদপত্রে আপনার সম্পর্কে যে সব কথা লিখেছে তার ফলে বিচারককে কোন যুক্তি দিয়েই কিছু বোঝানো যাবে না। জামিন মঞ্জুর হলেও কিছু লাভ নেই, কারণ, আদালত থেকে বেরুলেই পুলিস আবার আপনাকে গ্রেফতার করবে।' খানিক ইতস্তত করার পর বললেন, 'ফলাফল কি হতে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনার তা জানা আছে, তাই না? কোন অবস্থাতেই আপনি মুক্তি পাবার কথা ভাবতে পারেন না। যে অর্ডিন্যান্সের আওতায় আপনাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল তাতে আপীল করার কোন অবকাশ ছিল না। রায়টি পুনর্বিবেচনা করাও হবে না। যতদূর খবর পেলাম, বর্তমান কেসটিও পুলিস নিশ্ছিদ্রভাবে সাজিয়েছে। সাজা যদি আপনার না হয়, সেটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে। সাজা হলেও বিশেষ কোন লোকসান নেই আপনার, কারণ, পূর্ব-অপরাধের প্রাপ্য সাজার সাথেই চলতি অপরাধের সাজা কার্যকরী হবে। তবে, যদি জেল হয় তবেই। চরম সাজা যদি হয়, খোদা না-খাস্তা ' উকিল সাহেব ভরসা দিলেন। 'তা যাতে না হয় তার জন্যে প্রাণপণ লড়ব আমি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনি। ইনশাল্লাহ! আপনাকে আমি মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব।'

উকিলের কথাগুলো শোনার সময় কৌতুক বোধ করছিল তৌফিক। তাকে নিয়ে এই যে এত কিছু ঘটছে, ঠিক যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না সে। থেকে থেকে মনে পড়ে যাচ্ছে বেলায়েত হোসেন খান এবং রূপার কথা। কোন সন্দেহ নেই বেলায়েত হোসেন খান আহ্লাদে আটখানা হয়ে বগল বাজাচ্ছেন। আর রূপা?

রূপার প্রতিক্রিয়াটা ঠিক অনুমান করতে পারল না তৌফিক। মেয়েটা কি নেই নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছে খবরের কাগজ সামনে নিয়ে···? হঠাৎ অফিসটার কথা মনে পড়ে গেল তার। বেলায়েত হোসেন খানের সেই অফিসটা এখন গায়েব হয়ে গেছে, কোন অস্তিত্বই নেই তার—এ জানা কথা

কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হলো তৌফিককে। সংক্ষিপ্ত আদালত যে এত বেশি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব সম্পাদন করে, ধারণা ছিল না তৌফিকের।

সরকারী তরফের উকিল সুটেডবুটেড, আত্মতৃপ্তির হাসিটি লেগেই আছে মুখে। জয়লাভ করার আগেই বিজয়ীর আচরণ শুরু করে দিয়েছে।

তীব্র আক্রমণাত্মক এবং কঠোর ভাষায় অভিযোগ উত্থাপন করা হলো তৌফিকের নামে। নাটকীয় ভাষায় উল্লেখ করা হলো আসামীর বিরুদ্ধে পূর্ব অপরাধের শাস্তি প্রদানের ব্যাপারটা। স্বাধীনতা আন্দোলনের শত্রু, দেশদ্রোহী, দুষ্কৃতকারী, কুখ্যাত রাজাকার-আলবদর, নরকের কীট, পাষণ্ড খুনী এবং পিশাচতুল্য

ডাকাত—এইসব বিশেষণে অভিহিত করা হলো তাকে।

সামরিক পোশাক পরা বিচারক সাক্ষীসাবুদ দেখতে চাইলেন। একের পর এক সাক্ষী এল কাঠগড়ায়। গড়গড় করে অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে নেমে যেতে লাগল। পুলিস ইন্সপেক্টর ওয়াহিদ রেজা উঠল কাঠগড়ায়। শপথ গ্রহণের পর পেশ করল তার নিজস্ব বক্তব্য। সাক্ষীর কাঠগড়ায় এরপর উঠল ইন্সপেক্টর রাশেদ। তৌফিককে গ্রেপ্তার করার বিবরণ ব্যাখ্যা করল সে, পেশ করল পিস্তলটা। সেইসাথে পিস্তলের উপর ফিঙ্গারপ্রিন্টের একটা রিপোর্টও দাখিল করল।

বিচারক মিলিটারি মানুষ, এমনিতেই চেহারাটা বাঘের মত, তার উপর কেসটা খুবই ভয়ঙ্কর ধরনের—বুক কেঁপে যায় লাল হয়ে ওঠা ফর্সা মুখের দিকে তাকালে।

তৌফিকের উকিল একটা পয়েন্ট নিয়ে সরকারী উকিলের সাথে মিনিট তিনেক তর্ক করে সময় কাটালেন।

'আমার মক্কেল হোটেল ইন্টারকনে আছেন, এখবর পুলিসের জানার কথা নয়। আমার মক্কেল জানতে চান পুলিস তার কোন্ শত্রুর কাছ থেকে খবরটা পেয়েছে।'

সরকারী উকিলের ইঙ্গিতে কাঠগড়ায় দাঁড়াল ইন্সপেক্টর রাশেদ। বলল, 'অজ্ঞাতনামা এক লোক ফোন করে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন আমাদেরকে। আমি বিশ্বাস করি, আসামীর বিরুদ্ধে শত্রুতাবশত নয়, একজন দেশপ্রেমিক সৎ নাগরিকের কর্তব্য পালন করার প্রেরণাই তাঁকে বাধ্য করে আমাদেরকে ফোন করে কুখ্যাত রাজাকার তৌফিক আজিজের গোপন ঠিকানা জানাতে।'

তর্ক-বিতর্ক চলল, আরও খানিকক্ষণ। শেষমেশ বিচারক প্রশ্ন করলেন তৌফিককে, 'আপনার বলার কিছু আছে?'

'আমি নির্দোষ।'

তার কথায় কান দিল না কেউ।

খসখস করে রায় লিখলেন বিচারক, তারপর, পরিষ্কার এবং জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'তৌফিক আজিজ খান, পিতা, মোহাম্মদ তোফায়েল, আটচল্লিশ লাখ সাত হাজার ছাপ্পান্ন টাকার সোনার বার, সোনার অলঙ্কার এবং পাথর ডাকাতি করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন আপনি। আপনাকে শাস্তি দেবার দায়িত্ব আমার উপর বর্তেছে। শাস্তি ঘোষণা করার আগে কয়েকটা কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই আমি।'

পিন-পতন স্তব্ধতা। ঋজু ভঙ্গিতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে তৌফিক। ঘামছে বটে কিন্তু চেহারার মধ্যে ভেঙে পড়বার কোন লক্ষণই নেই।

'ডাকাতি সংঘটিত হবার মাত্র পাঁচ ঘণ্টা পর পুলিস আপনাকে গ্রেপ্তার করে। আপনার হোটেলরুমে ডাকাতি করা জিনিসগুলোর কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। কোন সন্দেহ নেই, এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই আপনি সেগুলো কোথাও সরিয়ে দিয়েছেন। ধরা পড়ার পর পুলিস আপনাকে নানাভাবে জেরা করার পরও সেগুলোর সন্ধান তাদেরকে আপনি জানাননি। কেন জানাননি, যে কোন সাধারণ মানুষ তার কারণ অনুমান করতে পারবেন। ধরা পড়ার ফলে আপনার দ্বারা অনুষ্ঠিত পূর্ব-অপরাধের শাস্তিস্বরূপ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অর্থাৎ বিশ বছরের কারাবাস অবধারিত হয়ে দাঁড়ায়। আপনি বুঝতে পারেন ডাকাতি করা জিনিসগুলোর সন্ধান

পুলিসকে জানানো না জানানো সমান, বিশ বছর আপনাকে জেল খাটতেই হবে মনে মনে আপনি বিশ বছরের কারাদণ্ডকে স্বীকার করে নেন। আপনি হিসেব করে দেখেন প্রতি বছর জেল খাটার বদলে আপনি লাভ করবেন দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশো বায়ান্ন টাকা কিছু পয়সা, ট্যাক্স ফ্রী। বিশ বছরে মোট আয় দাঁড়াবে আপনার আটচল্লিশ লাখ সাত হাজার ছাপ্পান্ন টাকা।'

কারও মুখে কথা নেই। সবাই চেয়ে আছে বিচারকের দিকে। তিনি চেয়ে আছেন অপরাধীর দিকে।

'অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেয়া আমার কর্তব্য। আমি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছি যে ভবিষ্যতে বিলাসবহুল জীবন যাপন করার লোভে আপনি এই অপরাধ করেছেন। আপনার অসৎ পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে আমি বদ্ধপরিকর, সুতরাং আপনাকে যে শাস্তি এখন আমি দেব তার মেয়াদ শুরু হবে আজ থেকে বিশ বছর পর। বর্তমান অপরাধের জন্যে আপনাকে বারো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হলো। পূর্ব-অপরাধের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হবার পরমুহূর্ত থেকে এই দ্বিতীয় অপরাধের দরুন প্রাপ্য শাস্তি বারো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড কার্যকর করা হবে। এতে করে সর্বমোট বত্রিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে আপনাকে। আমার মতে, এটাই আপনার জন্যে সর্বোত্তম সাজা। দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগই শুধু নয়, আমি বিশেষভাবে নির্দেশ দিচ্ছি জেল-সুপারের প্রতি, তিনি যেন আপনাকে হাইরিস্ক প্রিজনার হিসেবে গণ্য করেন। জেলখানার বাইরে আপনি রেখে যাচ্ছেন বিরাট অঙ্কের টাকার মালামাল, জেল থেকে পালাবার সুযোগ আপনি চব্বিশ ঘণ্টা খুঁজে বেড়াবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যে আমি চাই, আপনাকে একজন সাধারণ কয়েদী হিসেবে গণ্য না করে হাইরিস্ক প্রিজনার হিসেবে গণ্য করা হোক। এ ব্যাপারে যথাযথ নির্দেশ কারাগার কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানো হবে।'

তৌফিক মনে মনে তখন ভাবছে: বেলায়েত হোসেন খান, আনন্দে হাত তালি দিন!

তিন

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল।

বিবর্ণ গেটের সামনে দাঁড়াল প্রিজন ভ্যান। আরও দশ বারোজনের সাথে নামল তৌফিক। রাইফেলধারী পুলিস চারদিকে। প্রত্যেকেই খামকা রোষকষায়িত লোচনে তাকিয়ে আছে তার দিকে, মনে মনে অভিযোগ উত্থাপন করল সে।

গেটের মধ্যিখানে ট্র্যাপ-ডোর। সেটা খুলে গেছে প্রিজন ভ্যান থামার সাথে সাথে। নত হয়ে ভিতরে ঢুকল তৌফিক।

কনস্টেবলদের নিয়ে একজন এ. এস. আই. সাথে সাথেই আছে। সকলের কাগজপত্র তারই কাছে। রিসেপশন ব্লকের চত্বরে মাঝারি আকারের একটা ভিড়

জমে উঠল। আরও একটা প্রিজন ভ্যান খালাস করল সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের।

এ. এস. আই. রিসিভিং অফিসারের উদ্দেশ্যে তৌফিকের কেস হিস্ট্রি সম্পর্কে কাগজপত্রে যা লেখা আছে একঘেয়ে আবৃত্তির সুরে পড়ে গেল।

'হুঁ।' রিসিভিং অফিসার সবজান্তার মত মাথা দোলাল। একটা ময়লা, তেল চিটচিটে বালিশাকৃতির খাতা খুলে লিখল তাতে কি সব। একটা মেমোবুক টেনে নিয়ে খসখস করে তাতেও লিখল কিছু। মেমোবুকের পাতাটা একটানে ছিঁড়ে এ. এস. আই-এর দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'এই নিন, বডি রিসিট।'

কানে বাজল কথাটা তৌফিকের। ভাবল, জেলখানায় মানুষ তাহলে মানুষ নয়, শুধু একটা দেহ!

একটা দরজার তালা খুলে একজন পুলিস ইঙ্গিত করল তৌফিককে। দরজার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাতে দেখল আরও তিনটে ইউনিফর্ম তাকে গার্ড দিয়ে আসছে। চৌকাঠ পেরোতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তালা মারা হচ্ছে ওদিক থেকে আবার, টের পেল। হলরুমের মত একটা কামরা। আসবাব বলতে কিছুই নেই। নানাধরনের লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। বিশ-পঁচিশজনের কম নয়। নানাধরনের পোশাক পরে আছে সবাই। এত মানুষ, কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। সবাই চেয়ে আছে মেঝের দিকে, যেন মেঝে ফুঁড়ে যার যা কিছু স্বপ্ন সব বেরিয়ে আসবে, তারই জন্যে অপেক্ষা।

এরপর কি হবে, সেটাই চিন্তার বিষয়। এদের মধ্যে এর আগেও জেল খেটে গেছে যারা, তারা জানে। তৌফিক একে একে তাকাচ্ছে প্রত্যেকের দিকে। তার ইচ্ছা হলো, সকলের উদ্দেশ্যে একটা প্রশ্ন করে: আপনারা কেউ হাইরিস্ক প্রিজনার হয়ে ছিলেন এখানে?

অবশেষে নাম ধরে ধরে একজন একজন করে ডাকা হতে লাগল। তৌফিকের ডাক পড়ল প্রায় আধঘণ্টা পর। একজন মিয়া সাব (কনস্টেবল) দ্বিতীয় দরজাটা খুলে নিতে এল তাকে। একটার পর একটা তালা খোলা হতে লাগল, করিডর থেকে করিডর হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা অফিসরুমে গিয়ে পৌঁছল তৌফিক।

কয়েদী জীবনের হাজারো বিড়ম্বনা। খালি চেয়ারের দিকে তাকিয়ে মেজাজ খারাপ হলো তার। কয়েদীকে কখনও বসতে দেয়া হয় না। একজন রাইটার প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল তার নাম, জন্মস্থান, বাবার নাম, মায়ের নাম, তার বয়স, ক'ভাই-বোন, পেশা ইত্যাদি। লোকটা তার দিকে একটিবারও তাকাল না দেখে কৌতুক অনুভব করল তৌফিক। এই লোকের কাছেও কয়েদীরা মানুষ নয়, চলমান দেহমাত্র। 'চার নম্বর খাতার এক হাজার একুশ নম্বর সেলের লোক তুমি,' বলল সে।

পকেট খালি করতে বলা হলো তৌফিককে। তার হাতের ছাপ নেয়া হলো। পাশের রুমে যেতে বলা হলো তাকে পোশাক বদলাবার জন্যে। মিয়া সাবের সামনেই নগ্ন হয়ে কয়েদীদের জন্যে নির্ধারিত সাদার উপর কালো স্ট্রাইপের হাফ প্যান্ট এবং হাতকাটা ফতুয়া পরল সে।

এরপর আরও একঘণ্টা অপেক্ষা।

একজন জমাদারের নেতৃত্বে একটা দলের সাথে করিডর ধরে মার্চ করে

অবশেষে মেডিক্যাল এগজামিনেশনের জন্যে যেতে হলো। ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে রায় দিল: ওয়াণ্ডারফুল! ফিট ফর এনিথিং।

এরপর একজন মিয়া সাব তাকে সাথে করে যেখানে নিয়ে গেল সে-জায়গাটাকে ছোটখাট একটা স্টেডিয়াম বললেও অত্যুক্তি হয় না। এতবড় রুম ঢাকা শহরে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। কামরাটার চারদিকের দেয়ালে লোহার রড দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট সেল। কয়েকটা লোহার সিঁড়িও উঠে গেছে উপরদিকে।

'এই একবার জানিয়ে দিচ্ছি,' মিয়াসাব বলল, 'এটা চার নম্বর খাতার "গ" বিভাগ।'

সিঁড়ি দিয়ে খানিকদূর উঠে একটা ল্যাণ্ডিংয়ে দাঁড়াল ওরা। চাবির গোছা থেকে চাবি বেছে বের করল লোকটা, তালা খুলল, ইঙ্গিত করল ভিতরে ঢুকতে, বলল, 'এইটাই তোমার কবর।'

ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতে বন্ধ হয়ে গেল ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি দরজার কবাট দুটো। তালা লাগানো হচ্ছে বুঝতে পারলেও কোন শব্দ ঢুকল না কানে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল তৌফিক। একটু অন্যমনস্ক। মিনিটখানেক ধরে কিছু চিন্তা করার পর ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে উঠল তার।

সেলটার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতেই সব জানা হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কিছুই নেই। লোহার ফ্রেম দিয়ে তৈরি একটা খাট, তার উপর ছেঁড়া মাদুর বিছানো। দেয়ালের গায়ে থুথু-কফের শুকনো দাগ। মেঝেতে একটা টিনের বাটি, একটা টিনের গ্লাস এবং, চটা ওঠা একটা এনামেলের বাসন। টিনের মগটার তোবড়ানো চেহারা এবং ভিতরের দেয়ালে কটা রঙের স্যাতলা দেখে বুঝতে পারল সে, প্রস্রাব করার জন্যে রাখা হয়েছে এখানে।

দেয়ালের গায়ে একটা পেরেকের সাথে ঝুলছে একটা হার্ডবোর্ডের টুকরো। তাতে নিয়মকানুন লেখা রয়েছে কয়েকটা। সময় নষ্ট না করে পড়ে ফেলল তৌফিক: প্রত্যহ প্রত্যুষ চারি ঘটিকায় ঘুম হইতে জাগিতে হইবেক। রাত্র আট ঘটিকায় কক্ষের আলো নিভিয়া যাইবেক। সপ্তাহে একবার চুল ছাঁটিতে হইবেক। দুইদিন পরপর স্নান করিবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। হার্ডবোর্ডটা অর্ধেক ছেঁড়া, বাকি অর্ধেকে আর কি সব লেখা ছিল জানা হলো না তৌফিকের।

ঢং-ঢং, ঢং-ঢং, ঢং-ঢং···।

অবিরাম একঘেয়ে ঘণ্টাধ্বনি। ঘুম ভাঙতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে বসল তৌফিক বিছানার উপর। কয়েক সেকেণ্ড স্মরণই করতে পারল না এ কোথায় রয়েছে সে।

ফতুয়া গায়ে চড়িয়ে তৈরি হতে জমাদার তালা খুলে কবাট ফাঁক করে মাথা গলিয়ে দিয়ে বলল, 'বাটি হাতে করে বেরিয়ে আসতে আজ্ঞা হোক হুজুরের।'

'ওটা আমি ব্যবহার করিনি।'

'বেবোহার করো বা না করো, খালি করে ধুতে হবে।' জমাদার ভিতরে ঢুকে দু'কোমরে হাত রেখে খামকা হম্বিতম্বি করতে শুরু করল। 'এই শেষবার জানিয়ে দিচ্ছি, তর্ক করেছ কি মরেছ। যা বলা হবে জে-হুজুর জে-হুজুর করে মানবে। এটা

হলো গিয়ে এই হাবিয়া দোজখের এক নম্বর কানুন।'

তৌফিক কথা না বলে চেয়ে রইল।

'বিছানাটা উল্টো সাইডে কেন? সরিয়ে নিয়ে গেছ বুঝি?'

'ওখানেই ছিল।'

জমাদার মাথা দোলাল এদিক সেদিক, 'দু'নম্বর কানুন, মিথ্যে বলবে না। সুবেদার মিথ্যাবাদীর মাথায় আঙটি দিয়ে গাঁট্টা মারে। তারপর সে রিপোর্ট করে ডিপ্‌টির (ডিপুটি) কাছে। তেনার আবার অন্য নিয়ম। ত্যাড়া লোককে খেতে দেয় হাফ আটা হাফ কাঁকর দিয়ে তৈরি রুটি, সাথে ডালও না ভাজিও না, লবণগোলা পানি। খেতেও হবে, না খেলে তার জন্যে আবার আলাদা শাস্তি। এখন থাক, থাকতে থাকতেই শিখবে। নিকালো!'

নিচের হলে অনেক কয়েদীর ভিড়। লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকের হাতে ধরা একটা করে তোবড়ানো বাটি। বাতাসে দুর্গন্ধ। মার্চ করে যেতে হলো বেশ খানিকটা দূরে। সকলের দেখাদেখি খালি বাটি থেকে ড্রেনে প্রস্রাব ফেলার ভঙ্গি করে অন্য লাইনে গিয়ে ঢুকল তৌফিক। তার পালা আসতে শুকনো বাটিটা ধুয়ে নিল কলে। প্রাতঃকৃত্য সারার জন্যে লাইন বদল করতে হলো আবার। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর সুযোগ এল তার।

সেলে পৌঁছে দিয়ে জমাদার বলল, 'বাসনটা সাথে করে নিচে··থাক। নতুন চিড়িয়া, তার ওপর শিকারী, এখন কিছু দিন খাঁচায় বসেই ডান হাতের কাজ সারো।'

দু'টুকরো শুকনো রুটি, এক গ্লাস চা বরাদ্দ। জমাদার বলে গেল, 'ওস্তাদ আসছে।'

'ওস্তাদ?'

'সুবেদার। যতক্ষণ থাকবে, মাথাটা হাত চাপা দিয়ে ঢেকে রেখো।'

সকাল ন'টা দশটার দিকে আবার খুলল সেলের দরজা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পা দুটো দরজার দিকে লম্বা করে দিয়ে বিছানার উপর বসে আছে তৌফিক। লোকটার প্রস্থের দিকটা প্রথম দর্শনেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লম্বায় স্বাভাবিক সাড়ে পাঁচ ফুটের মত, কিন্তু চওড়ায় অনেক বেড়ে গেছে। তেলে ভেজানো চুল মাথায়। মাথার উপরটা সমতল, ফুটবল রাখলেও গড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা নেই। প্রাচীন পাঁচিলের মত লোমশ বুক, কেউ যেন কালো কালি দিয়ে আঁকিবুকি কেটেছে মনের খুশিতে। চকচক করছে শুকনো ক্ষতচিহ্নগুলো। চোখের মধ্যিখান ছেড়ে মণি দুটো ঘুরঘুর করছে অবিরত চারদিকে মাথা না ঘুরিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তাকে দেখছে সুবেদার।

জমাদার যা বলেছিল তার বিপরীত ঘটনা ঘটছে দেখে একটু অবাক হলো তৌফিক। মুখের কালো রঙের ভাঁজগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। একটা সমীহের ভাব ফুটে উঠল চেহারায়।

'আমি সুবেদার দারা। দেখতে এলাম তোমাকে।'

তৌফিক বলল, 'ধন্য হলাম।' হাসল সে। 'বলো কি খাতির করতে পারি।'

এক হাত দিয়ে তৌফিকের দুটো বুড়ো আঙুল ধরে পা দুটো শূন্যে তুলল

দারা, নামাল একটু দূরে। বিছানার কিনারাটা খালি করে বসল সে, 'তুমি-টুমি চলে না এখানে—তবে তোমার জন্যে মানা যায়। বত্রিশ বছর আমার সাথে ঘর-সংসার করতে হবে তোমাকে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ যাতে না হয় তার জন্যে দু'জনকেই চেষ্টা করতে হবে। তৌফিক, আমি ভালর জন্যে ভাল—তুমি?'

'আমি আমার জন্যে ভাল,' তৌফিক বলল।

দারা হাসতে লাগল, 'তাই চাই আমি, নিজের ভাল বোঝো। শোনো, তুমি আমাদের এখানে কেউটে অতিথি। তোমাকে…'

'কেউটে অতিথি?'

'হ্যাঁ। মানে, বিষধর সর্প! ছোবল মারতে পারো, সে ভয় আছে।'

হাইরিস্ক প্রিজনারকে এখানে কেউটে অতিথি বলা হয়, বুঝল সে।

'কেউটে অতিথির জন্যে কি নিয়ম?'

'কড়া নিয়ম, বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে।' দারা বলল। 'যেমন ধরো, সুবেদার সাধারণ কয়েদীর সাথে কথা বলতে চাইলে বিশ্বস্ত কোন কয়েদী এসে নিয়ে যায় তার কাছে, সুবেদার আসে না। কেউটে অতিথির বেলায় ঝুঁকিটা নেয়া হয় না। তাকে গোর থেকে বেরুতেই দেয়া হয় না, জরুরী দরকার না পড়লে। আর সব নিয়ম হচ্ছে: হপ্তায় মাত্র একদিন গোসল করতে পাবে। তোমার গোরের আলো সারারাত জ্বলবে। বাইরে একজন পুরানো বিশ্বস্ত কয়েদী কিংবা মিয়াসাব পাহারায় থাকবে। যদি কখনও বাইরে বেরোও, সাথে থাকবে কেউ না কেউ। কেউ দেখা করতে এলে তার সাথে কথা বলার সময়ও কেউ না কেউ হাজির থাকবে। চিঠি যদি লেখো কাউকে, সে চিঠি জমা থাকবে অফিসে, ফটোস্ট্যাট কপি পাঠানো হবে বাইরে। অন্য কোন কয়েদীর সাথে তোমার কথা বলা নিষেধ। দিনে মাত্র একবার খাঁচা থেকে বার করা হবে তোমাকে, হাঁটাচলার জন্যে। ডাক্তারখানায় তোমার যাওয়া চলবে না, দরকার হলে ডাক্তার আসবে তোমার কাছে। প্রথম রাতে যা হবার হয়েছে, এখন থেকে ন্যাংটো হয়ে রাত কাটাতে হবে তোমাকে। মিয়াসাব এসে রাত সাড়ে সাতটায় তোমার কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে যাবে, পৌঁছে দেবে আবার ভোরে। মিয়াসাব, জমাদার, সুবেদার, ডিপটি কিংবা বিশ্বস্ত কয়েদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার নেই তোমার। গান গাওয়া নিষেধ তোমার। ভুলেও শিস দেবে না…।'

আরও হাজারটা বিধিনিষেধ জারী করা আছে কেউটে অতিথির জন্যে।

দারা তাকে নিয়ে গেল মেইন অফিস বিল্ডিংয়ে। জেল সুপার, সেকশন অফিসার এবং পদস্থ জেল কর্মকর্তারা সেখানে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে।

কয়েক বস্তা উপদেশ এবং হুঁশিয়ারি গছিয়ে দিয়ে ফেরত পাঠানো হলো তাকে আবার সেলে। বিকেলে সেলের ভিতর তশরিফ আনল ইন্সপেক্টর রাশেদ। আশাবাদী লোক, নানা যুক্তি দিয়ে সে চেষ্টা করল তৌফিকের পেট থেকে কথা বের করার।

তৌফিক সেই একই কথা উচ্চারণ করল আগের মত, 'আমি ডাকাতি করিনি। আটচল্লিশ লাখ কেন, একটা পাই পয়সাও কোথাও রেখে আসিনি আমি।'

মানুষ নিজেকে যে-কোন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এই দার্শনিক জ্ঞান পয়লা হপ্তার মধ্যেই অর্জন করল তৌফিক। সেলে নয়, সকাল এবং দুপুরের খাওয়াটা নিচের হলরুমেই বসে খাবে এখন সে। ইতিমধ্যে সে আবিষ্কার করেছে, যে-কোন ব্যাপারেই ছোট-বড় সব শ্রেণীর কয়েদীরা তাকে গুরুর মত ভক্তি করে, দাম দেয়। দীর্ঘ কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের কদরই আলাদা। তাছাড়া, এক এক জাতের অপরাধের জন্যে এক এক রকম মনোভাব রয়েছে। জেলখানায় কোন খবরই চাপা থাকে না। আটচল্লিশ লাখ টাকার মালামাল ডাকাতি করে ধরা পড়লেও, জিনিসগুলো পুলিস উদ্ধার করতে পারেনি—তৌফিকের জন্যে এই ব্যাপারটা সম্মান এবং প্রতিপত্তি এনে দিল না চাইতেই।

সিঁধেল চোর, চোর, ছিনতাইকারী, লুটেরা এদের মোটামুটি ভাল চোখে দেখা হয়। কয়েদীদের সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা পায় ডাকাত আর খুনীরা। সবচেয়ে ঘৃণা করে এরা যৌন অপরাধীদের। তিনজন কয়েদী রয়েছে চার নম্বর খাতার 'গ' বিভাগে, যারা যৌন অপরাধের শাস্তি ভোগ করছে। সবাই মিলে প্রায় প্রত্যেকদিনই তাদেরকে লাথি-ঝাঁটা মারে।

কেউটে অতিথিদের জন্যে জারীকৃত নিষেধাজ্ঞাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে তৌফিক। ফলাফল শুভ। ডিপ্‌টি মোটামুটি খুশি তার উপর। ফলে কড়াকড়ি বেশ একটু শিথিল হয়েছে। বিকেলে মাঠে যেতে পারে সে। তবে খেলায় যোগ দিতে পারে না। দুপুরে হলে বসে খাবার সময় দু'একজনের সাথে কথা বলে সে, সুবেদার দারা চোখ রাঙায়, কিন্তু মুখে বলে, 'এত কিসের কথা?' বলতে নিষেধ করে না।

বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম নামে একটা প্রকল্প চালু আছে জেলখানার ভিতর। ওয়েলফেয়ার অফিসার সালাম সাহেব ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ, তিনি তৌফিককে নিয়োগ করলেন কয়েদীদের শিক্ষক হিসেবে। জেল-সুপার তৌফিকের গত চার হপ্তার গুড কণ্ডাক্ট রিপোর্ট বিবেচনা করে নির্বাচন অনুমোদন করলেন। পরের হপ্তায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃহল দাবা প্রতিযোগিতায় চার নম্বর খাতার প্রতিযোগীদের ট্রেনিং দেবার জন্যে দায়িত্ব পড়ল তার কাঁধে।

জেলখানার জীবনযাত্রা নিরুপদ্রব নয় এটা আবিষ্কার করতেও দেরি হলো না তৌফিকের। কয়েদীদের মধ্যে রেষারেষি, মারামারি, দলাদলি লেগেই আছে। জেল হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে প্রত্যেক দিনই ফাটা মাথা, ভাঙা হাত-পাওয়ালাদের ভিড় জমে।

ডিপ্‌টি জোয়ারদার, যমের চেয়েও বেশি ভয় করে তাকে কয়েদীরা। হলে সে ঢুকলে হয়, ধ্যানমগ্ন মুনি-ঋষিতে পরিণত হয় সবাই। লোকটাকে বিশেষ পছন্দ করে না তৌফিক। একজন অফিসার, তার কিনা এই রকম জঘন্য আচরণ! খামকা এর পাঁজরে খোঁচা মারবে, ওর চুল ধরে হেঁচকা টান দেবে, বাপ-মা তুলে গাল দেবে. এক কয়েদীকে দিয়ে আরেক কয়েদীকে মার খাওয়াবে। লোকটা কেন এমন করে তা ভেবে বের করেছে তৌফিক। সে চায় কয়েদীরা হাঙ্গামা করুক, তাতে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করার সুযোগ পাবে সে। কিন্তু কয়েদীরা ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়ে

উল্টো আচরণ করে, ফলে আরও ছটফট করে সে সবসময়, যাকে তাকে অকারণে পাকড়াও করে অপমান করে। তৌফিককে এ পর্যন্ত বাগে পায়নি বলে ওর ওপরই যেন জোয়ারদারের রাগ বেশি—সর্বক্ষণ ছুতো খুঁজছে হাঙ্গামার।

তৌফিককে একদিন সমস্যায় ফেলে দিল এই লোক। খেতে খেতে এক কয়েদী অন্য দিকে তাকিয়েছে, অন্য এক কয়েদী তার বাসন থেকে টপ করে আধখানা রুটি তুলে খেয়ে ফেলেছে। জেলখানার নিয়ম হচ্ছে, ঠকা চলবে না। যে ঠকবে তার দাম কমে যাবে। যে ঠকাতে পারবে তার দাম চড়ে যাবে। ঠক্ খাওয়া কয়েদীটা মহা শোরগোল তুলল রুটি চুরি গেছে বুঝতে পেরে। নিজের সম্মান পুনরুদ্ধার করতে হলে চোরকে সনাক্ত করে শায়েস্তা করতে হবে এখন তার। কয়েদীরা কেমন টের পেল তৌফিক সেদিন। একসাথে পাঁচ ছয়জন কয়েদী উঠে দাঁড়িয়ে চলে এল ঠক্ খাওয়া কয়েদীটার সামনে। প্রত্যেকে ঘোষণা করল, রুটি সে চুরি করেছে, কার কি করবার আছে করুক।

আসল যে চোর সে সরে গেছে দূরে। হাঙ্গামাটা যে খারাপ আকার নিতে যাচ্ছে, টের পেয়ে গেছে সে। এমন সময় হলে ঢুকল সুবেদারের সাথে ডিপ্‌টি জোয়ারদার।

থমকে থেমে গেল হট্টগোলটা।

কয়েদীরা বলে, জোয়ারদার যেখানেই থাকুক, একটা করে কান সে নাকি প্রত্যেক কয়েদীর মাথার চুলে লুকিয়ে রেখে যায়। ফলে ঢুকেই সে সোজা তৌফিকের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কে চুরি করেছে রুটি?'

সুবেদার দারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল, 'তোমাকে তো বলেছি, জোয়ারদার সাহেব মিথ্যে কথা সহ্য করেন না।'

মিথ্যে কথাই বলল তৌফিক, 'আমি দেখিনি।'

ঘেঁচু নামে এক সিঁধেল চোর বলল, 'আমি দেখেছি। পচা।'

জোয়ারদার হুকুম করল, 'দারা, পচাকে টেনে আনো।'

টেনে আনার মানে কি দেখতে পেল তৌফিক তখুনি। সুবেদার পচার দিকে এগোচ্ছে, পচাও তৈরি হয়ে গেল। কাছাকাছি যেতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠে সটান শুয়ে পড়ল সে। এখানকার নিয়ম জানা আছে তার। সুবেদার তার পা দুটো ধরে হেঁচড়ে টেনে আনল জোয়ারদারের সামনে।

জোয়ারদার তাকাল তৌফিকের দিকে, 'পচার বুকের ওপর উঠে দাঁড়াও. হাতঘড়ি দেখল সে। 'ঠিক আধঘণ্টা পর নামবে।'

প্রতিবাদ করল তৌফিক, 'আমাকেও শাস্তি দিচ্ছেন আপনি। কেন?'

গোটা পরিবেশটা মুহূর্তে বদলে গেল। সাধুসন্তরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। রোমাঞ্চকর এবং নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, টের পেয়ে গেছে সবাই। ডিপ্‌টির মুখের উপর কথা বলেছে তৌফিক, যা আর কোন কয়েদী দুঃস্বপ্নে ভাবতেও পারেনি তৌফিকের ভাবা আরও উচিত নয় এই জন্যে যে সে কেউটে অতিথি, অভিযোগ করার কোনও অধিকার নেই তার।

চকচক করছে সকলের চোখের দৃষ্টি। কিছু একটা ঘটুক, প্রার্থনা করছে যেন সবাই নিঃশব্দে। সবাই চেয়ে আছে জোয়ারদারের বিকৃত মুখের দিকে

জোয়ারদার আপাদমস্তক দেখল তৌফিকের। এই প্রথম চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাকে। প্রথমে মৃদু অবাকের ভাব ফুটে উঠল তার মুখের চেহারায়, তারপর অন্ধ ক্রোধের জোয়ার গ্রাস করল জোয়ারদারকে। পাঁচটা আঙুল বাঁকা করে হাতটা তৌফিকের মাথার উপর তুলল সে—খামচে ধরবে চুল, টেনে তুলবে ওকে শূন্যে. তারপর কি ঘটবে কেউ জানে না, জোয়ারদার নিজেও না।

এক নিমেষে বাঁ হাত তুলে জোয়ারদারের কনুইয়ের নিচটা চেপে ধরল তৌফিক, ডান হাতে ধরে ফেলল ওর কব্জি, হ্যাঁচকা টানে নিচে নামিয়ে মুচড়ে দিল হাতটা, শরীরটা বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকতেই হাঁটু দিয়ে জোরসে এক গুঁতো দিল ওর পাছায়। তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছিল জোয়ারদার, শূন্যে উঠে গেল ওর শরীরটা, ডিগবাজি খেয়ে ধড়াশ করে পড়ল বিশাল দেহটা শানের ওপর।

দম বন্ধ করে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল দুশো-আড়াইশো কয়েদী, প্রবল-প্রতাপ ডিপ্টির এই পরিণতি দেখে হেসে উঠল হি হি করে।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল জোয়ারদার। চেনাই যাচ্ছে না তাকে—রাগে, অপমানে বিকৃত হয়ে গেছে মুখের চেহারা। পাগলের মত পকেট হাতড়াল। নেই। রিভলভারটা রেখে এসেছে ভুলে। হঠাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ষাঁড়ের মত ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে তৌফিকের ওপর।

তিন সেকেণ্ড জড়াজড়ি করে লেপটে রইল দুটো শরীর। বার কয়েক খুব দ্রুত নড়াচড়া করল তৌফিকের দুটো হাত, কি ঘটছে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে আবার শূন্যে উঠে গেল জোয়ারদার। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে, দড়াম করে আছড়ে পড়ল পাঁচ ছ'হাত দূরে। পড়েই ডাঙায় তোলা সিঙি মাছের মত লাফাতে শুরু করল মেঝেতে শুয়ে—বেকায়দায় পড়ে মচকে গেছে কোমর, অবর্ণনীয় ব্যথায় নীল হয়ে গেছে মুখের চেহারা, উল্টে ফেলেছে চোখ।

জনা চারেক মিয়াসাব এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। সুবেদার এবং চারজন কনস্টেবল একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলল তৌফিককে। হাত দুটো পিছমোড়া করে লাগানো হলো হ্যাণ্ডকাফ, সময়ের বিন্দুমাত্র অপব্যয় না করে তুলো ধুনতে শুরু করে দিল পাঁচজনে মিলে।

ঠিক সেই সময়ে একটা বজ্র-কঠিন কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল ঘরের সবাই। মুহূর্তে জমে গেল যে-যার জায়গায়। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন স্বয়ং জেলার।

'কি হচ্ছে এসব?'

সবাই একসাথে কথা বলে উঠতেই আরেক ধমক, 'চোপরাও!'

কোমরে হাত রেখে বাঁকা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে জোয়ারদার। সবটা ব্যাপার শুনলেন জেলার সুবেদারের মুখে। তৌফিকের ফোলা নাক-মুখ-কপাল দেখলেন, জোয়ারদারের জখম দেখলেন, তারপর একটা আঙুল তুলে নির্দেশ দিলেন জোয়ারদারকে, 'বেরিয়ে যাও। তোমার স্যাডিজম চরিতার্থ করবার জন্যে খোলা হয়নি এই জেলখানা।'

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল জোয়ারদার।

তৌফিকের হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেয়া হলো যদিও, ওকেও শাসন করলেন জেলার,

ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা ঘটলে কি হবে জানিয়ে দিলেন পরিষ্কার, তারপর বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। তিনদিন আর দেখা মিলল না জোয়ারদারের। চতুর্থ দিন নতুন অফিসার এল 'গ' হলে। হলে ঢুকে তার প্রথম প্রশ্ন হলো, 'তৌফিক কে?'

সামনে যেতে তার হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গেল অফিসার, 'তোমার ভাগ্য ভাল, সেদিন জোয়ারদারের পকেটে রিভলভার ছিল না। আমি কিন্তু ওই জিনিসটা কাছ-ছাড়া করি না কখনও।'

তৌফিক বলল, 'রিভলভার ছিল না বলে জোয়ারদারই বরং বেঁচে গেছে। সে যদি ওটা বের করত, খুন করার চমৎকার অজুহাত পেয়ে যেতাম আমি।'

কথাটা আর বাড়াল না নতুন অফিসার কালাম সাহেব। তৌফিক বুঝল, এ লোকটা অন্তত সুস্থ মানুষ। কড়া, কিন্তু বিকৃতি নেই। শ্যেনের মত লক্ষ করে সব, কিন্তু অকারণে উচ্চবাচ্য করে না। এর কাছ থেকে সাবধান থাকার প্রয়োজন বোধ করলেও এর ওপর রাগ করবার কোন কারণ ঘটল না তৌফিকের। ক'দিন পর সে জানতে পারল জোয়ারদার চার নম্বর খাতাতেই আছে, তবে 'ক' বিভাগে।

কয়েদীদের মধ্যে জামশেদের সাথে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা হলো তৌফিকের। ব্ল্যাকমেইলিংয়ের কেসে ধরা পড়ে ঘুমুতে এসেছে সে। ঘুম মানে দু'বছর থেকে চার বছরের, বাতাস খাওয়া মানে ছয় মাস থেকে দু'বছরের এবং ঘর-জামাই মানে চার বছর থেকে বিশ বছর পর্যন্ত জেল খাটাকে বোঝায়।

পরিচয়টা জামশেদই যেচে পড়ে করল, গাঁজা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে। তৌফিক পাল্টা প্রশ্ন করল, 'গাঁজা জেলখানায় পাওয়া যায়?'

হেসেই অস্থির জামশেদ। দ্বিগুণ দাম দিলে জেলখানার ভিতর পাওয়া যায় না এমন কোন জিনিস বাইরে নেই। বাইরে কিছু আনাতে হলে পয়সা লাগে, কিন্তু ভিতরের মুদ্রা বা কারেন্সি হলো সিগারেট। সিগারেটের বিনিময়ে গাঁজা, সিদ্ধি, আফিম, মদ, ড্রাগস সব মেলে। জুয়া খেলা হয় ভিতরে। মিয়াসাব, জমাদার এরাও খেলে। ভিতরে ব্যবসায়ী কয়েদী আছে, যাদের সাজার সময়-সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও বাইরে বেরুতে চায় না যদিবা বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তিনদিনের মধ্যে ফিরে আসে আবার। এসব কি তৌফিক ভাই জানে না?

দেড় মাসে মোট সাতবার সেল বদল হয়েছে তৌফিকের। কেউটে অতিথিদের নির্দিষ্ট সেলে রাখা হয় না। অপ্রত্যাশিতভাবে যে-কোন সময় এক সেল থেকে আরেক সেলে বদলি করা হয় তাদেরকে। শেষবার দুপুররাতে ঘুম ভাঙিয়ে অন্য সেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তৌফিককে এই ঘটনার বিরুদ্ধে কথায় কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করতে জামশেদ হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু আমি জানি চার নম্বর খাতার 'খ' বিভাগের একটি সেলে তোমাকে কখনও রাখা হবে না।'

'কত নম্বর সেল?'

'লায়েক মিয়ার সেল।'

'কেন?'

জামশেদ গলা নামিয়ে বলল, 'সেলটার নিচেই বড় ড্রেন। কেউ যদি হাত খানেক খুঁড়তে পারে, হামাগুড়ি দিয়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে যেতে পারবে।'

তৌফিক বলল, 'কিন্তু কেউ যায় না কেন? লায়েক জানে না?'

'লায়েক গাঁজার ব্যবসা করে। বেরোবার জন্যে নয়, থাকার জন্যে যত চেষ্টা ওর।'

আর একদিন সাপ লুডু খেলতে খেলতে জামশেদ বলল, 'যার তার সাথে সব বিষয় নিয়ে কথা বলবে না, তৌফিক ভাই। এরা সবাই মীরজাফরের দল। কয়েদীদের মধ্যে কে যে ডিপটির লোক নয় তা খোদ ডিপটিও জানে না, কয়েদীরাও জানে না। আর একটা কথা, কালাম সাহেবের কাছ থেকে সাবধান। ছায়া দেখলেও বোবা হয়ে যাবে। শুনেছি ঠোঁট নড়া দেখে সে নাকি কথা বুঝতে পারে।'

তৌফিক বলল, 'এমন কি বিষয়ে কথা বলি আমরা যে ভয় করতে হবে?'

'সব সময়ই যে সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলব আমরা, তার কি ঠিক আছে?'

একটু তীক্ষ্ণ হলো তৌফিকের দৃষ্টি। ঠিক কি বলতে চায় জামশেদ অনুধাবন করতে পারেনি যেন সে।

'তুমি জানো, কেউটে অতিথিদের জন্যে নতুন জেল তৈরি হচ্ছে?'

'না।'

'এখান থেকে তো বাঁকা একটা আলপিনের সাহায্যেও পালিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু নতুন যে জেলখানা তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে নাকি ট্যাঙ্ক, মর্টার বা কামানের সাহায্যেও পালানো সম্ভব হবে না। বেশ একটু দুশ্চিন্তায় আছি।'

'দুশ্চিন্তা কিসের জন্যে?'

'বাতাস খেয়েছি, এখন ঘুমাচ্ছি—আমি জানি, এরপর এখানে ঘরজামাই হয়ে আসব আমি। ঘরজামাই মানেই কেউটে অতিথি, পাঠিয়ে দেবে নতুন জেলে। তখন?'

তৌফিক চারদিকটা একবার দেখে নিল। হলরুমে ছাড়াছাড়ি ভাবে বসে আছে মাত্র দশ বারোজন। কেউ লুডু, কেউ ষোলো গুটি, কেউ কড়ি খেলছে। বিকেলের ওই সময়টা দেড় ঘণ্টার জন্যে খেলাধুলার জন্যে নির্ধারিত। বেশির ভাগ কয়েদীই মাঠে নেমে ফুটবল, হা-ডু-ডু, গোল্লাছুট, ডাংগুলি ইত্যাদি খেলে।

'এবার বাইরে বেরিয়ে ভাল মানুষ হয়ে গেলেই তো হয়। সিধা হয়ে যাও।'

হাহ্-হাহ্ করে হাসল জামশেদ। সততা তার কাছে আপেক্ষিক ব্যাপার। সাহস ইত্যাদি লাগে। তাছাড়া, তার ধারণায়, সততা জিনিসটার অস্তিত্ব নেই, থাকা সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিটি আচরণ বা পদক্ষেপ লাভবান হবার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়। লাভ করার ইচ্ছাটাই তো অসৎ ইচ্ছা, ঠকাবার উদ্দেশ্য থেকে আসে।

তর্ক করল না তৌফিক। বলল, 'পালানো যখন এতই সহজ, পড়ে আছ কেন?'

'মাত্র নয় মাস পর ছাড়া পাব, পালায় কোন্ বোকা?' জামশেদ বলল। 'জেল থেকে পালানো যে কি ব্যাপার, জানো না তৌফিক ভাই। পালানো সহজ, কিন্তু পালিয়ে থাকা সহজ নয়। গোটা দেশের প্রত্যেকটি খাকি ইউনিফর্ম তোমার পিছু নেবে।' তৌফিকের কপালে তর্জনী দিয়ে টোকা মারল সে। 'তোমার কথা অবশ্য আলাদা। বত্রিশ বছরের জন্যে ঘর-জামাই!' কপালে ডান হাত ঠেকিয়ে চোখ বুজে সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে বিড়বিড় করে কিছু বলল সে। 'তবে, তোমার পক্ষে পালানোই সম্ভব নয়। চব্বিশ ঘণ্টা চোখের ভিতর ঢুকিয়ে রেখেছে তোমাকে।

পালিয়ে যদি যেতে পারোও, শ্বশুরের দল ধরে নিয়ে আসবে মেয়ের কাছে জামাইকে দুদিনের মধ্যেই। তবে পার্টির মাধ্যমে যদি ব্যবস্থা করতে পারো, আলাদা কথা।'

'পার্টি?' কৌতূহল প্রকাশ করল তৌফিক। 'কিসের পার্টি?'

'পালাবার ব্যবস্থা হতে হবে বাইরে থেকে। জামশেদ বলল। 'যারা পালাবার ব্যবস্থা করবে তারা বাইরে তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করবে। যদি ফিরেই আসতে হয়, পালিয়ে গিয়ে লাভ কি? প্রতিমাসেই দু'একজন করে পালাচ্ছে ধরেও আনা হচ্ছে। কিন্তু এনায়েত, জামিল, লাড্ডু মিয়া শেখ চাঁদ, ফজলু, এদের কথা ভেবে দেখেছ কখনও? শ্বশুরবাহিনী ফিরিয়ে আনতে পারেনি এদেরকে। কেন?'

'কেন?'

জামশেদ উত্তর না দিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। দূরে বসে যারা মুখ নিচু করে খেলছে, তাদেরকে দেখল সময় নিয়ে, মনোযোগ দিয়ে। দরজার দিকে তাকাল। সেদিকে চোখ রেখেই জানতে চাইল, '14-K-এর নাম শুনেছ?'

'14-K?' মাথা দোলাল তৌফিক। '14-K আবার কি?'

দরজার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তৌফিকের মুখের উপর দৃষ্টি রাখল জামশেদ 'গুজব বা আমার ভুল হতে পারে, তবে শুনেছি ওই নামে একটা অরগানাইজেশন আছে, তাদের কাজই নাকি তোমাদের মত ঘুমন্তদের বের করে নিয়ে যাওয়া। নতুন আর এক জাতের ক্রাইম বলতে পারো। কিন্তু মালপানি লাগে।'

'টাকার কথা তো পরে,' তৌফিক বলল। 'যোগাযোগ করব কিভাবে?'

'তুমি যোগাযোগ করবে কোত্থেকে!' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল জামশেদ। 'বড় খুঁতখুঁতে দল, বড্ড বাছবিচার করে। টাকা থাকলেই প্রেমপত্র লেখে না। মানে যোগাযোগ করে না। ভারি ভারি সব মাথা আছে, তারাই চালায় দল। গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করে। আমার মত এলিতেলি, পচাঘেঁচুর মত পেতিদের জন্যে মাথা ঘামায় না তারা। নিজেরাই যোগাযোগ করবে, তোমাকে যদি তারা বের করে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেবার মত উপযুক্ত বলে মনে করে।'

একেবারে খাদে নেমে গেল তৌফিকের গলার আওয়াজ, 'লক্ষ্মীভাই আমার, একটু খোঁজ-খবর করে দেখো। ঢাকায় কত বছর পর এসেছি, এসেই কুপোকাৎ! কারও সাথে দেখা হয়নি, যোগাযোগ হয়নি। কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তুমি ইচ্ছা করলে একে ওকে বলে খবরটা রটিয়ে দিতে পারো যে একজন লোক আছে যার 14-K-র সাহায্য দরকার।'

জামশেদ তৌফিকের ব্যাকুলতা দেখে বলল, 'দোষ দিতে পারি না তোমাকে—বত্রিশ বছরের ঘুম। কিন্তু তৌফিক ভাই, অত টাকার মাল তুমি ওই অল্প ক'ঘণ্টায় সরালে কোথায়?' সবজান্তার মত হাসতে শুরু করল সে। 'সরিয়েছ জায়গা মতই! কারও হাত সেখানে পৌঁছাবে না। আটচল্লিশ লাখ বাইরে রেখে কারই বা মন চায় ভিতরে ঘুমুতে!'

'কথা দাও তুমি তাহলে চেষ্টা…'

'কী আশ্চর্য! আমি কি ওদেরকে চিনি?' জামশেদ বলল। 'তবে খবরটা রটিয়ে

দিতে পারব।'

'আবার কোন বিপদে ফেলো না যেন।'

জামশেদ দাঁত বের করে হাসতে লাগল, 'পাগল হলেও জামশেদ ভাত ফেলে না, তৌফিক ভাই।'

একটা একটা করে সরে যাচ্ছে দিন।

ইন্সপেক্টর রাশেদ আরও দু'বার ঢুঁ মেরে গেল। দেখা করতে এল সরকারী উকিল। উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল একটাই। তৌফিকের মা-বাবা দেখা করতে এল এক সকালে, কিন্তু সুবেদারকে মৃদু কণ্ঠে জানিয়ে দিল তৌফিক, 'ওদেরকে মুখ দেখাতে পারব না আমি।'

এইসময় নতুন কয়েদী এল গোটা দশেক। একজন আবার বিদেশী। দেখতে রাশানদের মত, রাশান ভাষা জানে, নাম নিকোলাস কিন্তু নিজেকে সে রাশান বলে স্বীকার করে না। তৌফিকেরই মত হাইরিস্ক প্রিজনার, বিশ বছরের টানা ঘুম দিতে এসেছে। তৌফিক প্রথম দু'দিনের পরিচয়েই তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল, রাশান ভাষা শেখাবে তাকে। বিনিময়ে তৌফিক শেখাবে কথ্য বাংলা।

জেলের ভিতর কোন খবরই চাপা থাকে না। নিকোলাস যে একজন স্পাই এখবর জানা হয়ে গেছে নিকোলাস ঢোকার আগেই। বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার হয়েছে তার, রুদ্ধদ্বার কক্ষে। ফলে অভিযোগের বিবরণ জানা যায়নি।

মাঝারি আকারের নিষ্প্রভ চেহারার লোক নিকোলাস। দুটো লাঠির সাহায্যে হাঁটাচলা করতে হয় তাকে। ধরা পড়বার সময় গুলি খায় সে দু'কোমরে, বিচারের আগে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল আট মাস।

ইতিমধ্যে জামশেদের সাথে মাত্র দু'বার দেখা হয়েছে তৌফিকের। প্রশ্ন করার সুযোগ পায়নি সে। জামশেদও কোনওরকম ইঙ্গিত বা আগ্রহ দেখায়নি। কিছুদিন থেকে অন্যান্য কয়েদীদের সাথে জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় জামশেদকে, ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় সন্ধ্যার সময়। দেখা-সাক্ষাৎ হয় না বললেই চলে।

দিনগুলো যখন নীরস, নিভাঁজ, একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, হঠাৎ একদিন খেলার মাঠে দেখা হলো জামশেদের সাথে, 'তৌফিকে ভাই, বেরোবার ইচ্ছাটা এখনও পুষছেন?' তৌফিকের অমনোযোগের সুযোগ নিয়ে ফুটবলটা কিক করে আউট সাইডে পাঠিয়ে দিল সে।

পেটের পেশী টান টান হয়ে উঠল তৌফিকের, 'প্রস্তাব আছে কোন?'

'খবর দিয়েছে। তুমি যদি চাও কথাবার্তা শুরু হতে পারে।'

'চাই না মানে? সম্ভব হলে আজই!'

জামশেদ বলল, 'অত ব্যস্ত হলে চলবে না। ধীরেসুস্থে। তোমাকে তো বলেছি, গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করে এরা। আঁটঘাট বাঁধতে সময় লাগে তাই। টাকা আছে তো?'

'কত?'

'দশ হাজার।'

'এত?'

জামশেদ বলল, 'এ আর বেশি হলো কোথায়! এটা টোকেন মানি, ফেরৎযোগ্য

নয়—আসল পেমেন্ট অনেক বেশি। ওরা জানতে চায় দশ হাজার টাকা কত দিনের মধ্যে দিতে পারবে তুমি।'

তৌফিক দেখল বিপক্ষদলের গোলপোস্টের কাছে দু'দলের খেলোয়াড়রাই হুটোপুটি করছে। ওদের দু'জনকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ডিপ্‌টি জোয়ারদারের সন্দেহ হয়েছে, মাঠে ঢুকে পড়েছে সে।

জামশেদও লক্ষ করল ব্যাপারটা। পা বাড়াল সে, তৌফিক যেন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল, বাঁ পা বাড়িয়ে ল্যাঙ মারল সে। পরমুহূর্তে জামশেদ মাটির উপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে।

ছুটে আসছে জোয়ারদার। খেলা ভুলে অনেকেই দেখছে ওদেরকে।

'তুলনা হয় না ওস্তাদের! বুদ্ধি আছে বটে!' জামশেদ বলল উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে।

তার বুকে একটা পা তুলে দিয়ে তৌফিক বলল, 'ত্রিপোলীর একটা ব্যাঙ্কে আমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে, কেউ জানে না। স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক অফ লিবিয়া, ফ্রিডম-ফাইটার রোড, ব্রাঞ্চ, ত্রিপোলী। একটা চেক ফর্ম চাই আমার। সই করে দিলেই টাকা তুলতে পারবে যে-কেউ।'

পিছন থেকে জোয়ারদার হাঁক ছাড়ল, 'অ্যাই, হারামজাদা!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তৌফিক। হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। বলল, 'স্যার, ফের ভুল করছেন। আমরা জুডো শিখছি, মারপিট করছি না।'

উপুড় হয়ে শুলো জামশেদ। হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার পিঠ। জোয়ারদার চেয়ে রইল তৌফিকের দিকে। ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে দু'চোখে।

এগারো দিনের মাথায় নতুন এক কয়েদী নিয়ে এল চেক ফর্ম। তৌফিককে সেটা দিয়ে বলল, 'লেখার কাজ সেরে সোবহানের হাতে দিতে হবে।'

চলে যাচ্ছে দেখে তৌফিক সবিস্ময়ে বলল, 'শোনো। সোবহানটা আবার কে? আর কিছু...'

'কাকে কি বলছ? আমি কিছু জানি না। সোবহান যে-ই হোক, খুঁজে নেবে তোমাকে।' বিড় বিড় করে কথাগুলো বলে হলরুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দরজার দিকে চেয়ে রয়েছে তখনও তৌফিক, দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল নিকোলাস। মুখোমুখি চেয়ারে বসে জানতে চাইল, 'মন খারাপ?'

চেক ফর্মটা বইয়ের ভিতর রেখে দিয়েছে তৌফিক। বলল, 'আজ আর পড়ব না, হ্যাঁ, মন খারাপ।' একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'দাবা খেলবে?'

নিকোলাস কেন যেন মুচকি হাসল। বলল, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।'

'তার মানে?'

'মানে মানকচু, ভাতে দিলে ভর্তা!' দাবার বোর্ডটা টেনে নিয়ে খুলল সেটা।

তৌফিক একটু বিরক্তির সাথে বলল, 'তোমাকে বাংলা শেখানো উচিত হচ্ছে না আমার।'

সে-রাতে সেলে বসে চেক ফর্মটা পূরণ করল তৌফিক। পরদিন সকালে লাইন দিয়ে বাটি ধুতে যাবার সময় ওর ঠিক পিছনের জন জানাল—সেই সোবহান।

দ্বিধান্বিত চিত্তে লোকটার হাতে গুঁজে দিল সে চেকটা বেলা বাড়তেই জানা গেল. দিনটা সোবহানের রিলিজের জন্যে নির্দিষ্ট করা ছিল. দুপুরের মধ্যেই সে ফর্মটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে বাইরে। ধুরন্ধর কার্ড শার্পার সোবহান. 'গ' হলে এমন কেউ নেই যে তার সাথে তাস খেলতে রাজি হবে। ছোট একটুকরো কাগজ বাইরে নিয়ে যাওয়া তার জন্যে কোন সমস্যাই নয়।

চেক লিখে দেবার পর থেকে তৌফিকের মেজাজ ভাল নেই। টাকাগুলো পানিতে পড়ল কিনা তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা। আট দশদিন কেটে যাবার পরও কোন খবর নেই। এদিকে জামশেদ তার সাথে কথাই বলে না। কথা বলা তো দূরের কথা···তাকায়ও না। দশ হাজার টাকা গাপ করেছে কিনা সন্দেহ হতে থাকে তৌফিকের।

একদিন পরপর তিনবার নিকোলাসকে দাবায় হারিয়ে দেবার পর তৌফিক বলে উঠল. 'দূর-দূর! তোমার সাথে খেলে মজা পাই না। তুমি রাশান না কচু! ওরা ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ান. আর তুমি মাত হচ্ছ বিশ চালে। একবারও কি হারাতে পারো না?'

'আমি পারব,' পাশের টেবিল থেকে বলল মকবুল হোসেন।

লোকটা এক হোটেলের মালিক ছিল। হোটেলে অনুষ্ঠিত জোড়া খুনের তদন্ত করতে এসে পুলিস ত্রিশ মণ গাঁজা আর বিদেশী মদের একশো পেটি উদ্ধার করে তদন্তে প্রমাণ হয় মকবুল চোরাচালানের ব্যবসা করছে। চোদ্দ বছর ঘুমুতে পাঠানো হয়েছে তাকে।

নিকোলাস উঠে যেতে মুখোমুখি এসে বসল সে, 'খেলবে আমার সাথে?'

'না,' তৌফিক বলল। 'চ্যাম্পিয়ানরাই হেরে ভূত. আর তুমি তো কোন্ ছার!'

'না খেললে কিন্তু হেরে যাবে তুমি!' ধাঁধা ছাড়ল মকবুল।

চোখ তুলে তাকাল তৌফিক, 'হুঁ। বলো কি বলতে চাও।'

দাবার ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল মকবুল, 'নতুন মিডিয়াম আমি। আমার সাথে ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলবে না তুমি। টাকা-পয়সার ব্যাপারে খানিকটা আলোচনা দরকার।'

'দশ হাজার দিয়েছি। না বেরিয়ে আর একটা পয়সাও দেব না আমি।' তৌফিকের সাফ জবাব।

'কখন দেবে সেটা পরে ঠিক হবে. আগে বলো কত দেবে।'

'কত?' তৌফিক চাল দিল. 'কুইন্স্ পন থ্রি।'

'খুব হুঁশিয়ার লোক তুমি, তৌফিক। স্বাভাবিক। আটচল্লিশ লাখ নয়। হাফ চায় ওরা।'

তৌফিক বলল. 'বোকার দল! ওদেরকে বলো. হিসেবে কিছু ভুল আছে।'

'যেমন? দু'একটার কথা উল্লেখ করো।'

'এক. মালিক বাড়িয়ে বলেছে। দুই. যাই-ই পেয়ে থাকি, তিন ভাগ হবে। তিন. বাজার দর পাব না বিক্রির সময়। চার, বন্ধুরা ভাগে কিছু কম দেবেই। পাঁচ···

'থাক। কত পড়বে তোমার ভাগে?'

'বন্ধুদের সাথে দেখা না করে তা বলা সম্ভব নয়।' তৌফিক উত্তপ্ত হয়ে উঠল, 'এত খবরের দরকার কি ওদের? কত টাকা দাবি তাই বলো। লিবিয়ায় কি আমি ঘাস কেটেছি? টাকা রোজগার করিনি?'

'পাঁচ লাখ।'

'পাঁচ লাখ!'

মকবুল বলল, 'কমপক্ষে পাঁচ লাখ তা না হলে ওরা তোমার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে রাজি নয়।'

তৌফিক দেখল ডিপটি কালাম সাহেব এগিয়ে আসছে।

'ওরা আরও একটা প্রশ্ন করেছে, তোমার সঙ্গীরা তোমার সাথে বেইমানী করেছে কিনা?'

'এ মাথা ব্যথার কারণ?'

'টাকা দিতে পারবে কিনা তা না জেনে তারা...'

'একবার বলেছি, পারব।'

'বলেছ নাকি? বেশ বেশ সঙ্গীদের নামগুলো বলো

'কোনদিন জানতে পাবে না ' তৌফিক হাঁফ ছাড়ল কালাম সাহেবকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে। 'টাকা দেব আমি, আমার সঙ্গীরা নয়। সুইস ব্যাঙ্কে প্রচুর আছে আমার। কিন্তু আগে বের করো, তারপর টাকার কথা। তার আগে আর এক পয়সাও নয়।'

'খবরটা পৌছে দেব,' মকবুল বলল, 'চেক। তোমাকে তারা লোভনীয় বলে গ্রহণ করবে কিনা সেটা তাদের ব্যাপার। আর একটা কথা।'

মকবুল চুপ করে আছে দেখে তৌফিক বলল, 'কি?'

'নিকোলাসের সাথে বড্ড বেশি মাখামাখি করছ। কানে গেছে ওদের।'

'তাতে কি?'

'নিকোলাসের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে হবে তোমাকে মকবুল বিশপ তুলে চাল দিল। বলল। 'ফের চেক। নিকোলাসের সাথে মিশতে দেখলে ওরা তোমাকে ত্যাগ করবে বলে দিয়েছে।'

'কেন? ওদের কোন রাজনৈতিক আদর্শ আছে নাকি আবার? নিকোলাসকে পছন্দ নয় ওদের?' বাঁকা হেসে জানতে চাইল তৌফিক। 'চেক। মাত হয়ে গেছ তুমি।'

'হুকুম মানতে হবে, তৌফিক যদি বেরোতে চাও। যাই হোক, ভালই খেলেছ। চলি।'

দিনগুলো উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠল বুক ভরা উত্তপ্ত আশা নিয়ে কাটিয়ে দিল তৌফিক ক'টা দিন। কিন্তু অন্য তরফ থেকে আর কোন উচ্চবাচ্য নেই। অস্থির হয়ে উঠতে শুরু করল সে আবার। একদিন খেলার সময় মকবুলকে একা বসে থাকতে দেখল সে। ঘনঘন তার দিকে তাকাচ্ছে দেখে মকবুল হাতের ইশারায় নিষেধ করল তার দিকে তাকাতে বা কাছে যেতে। কিন্তু মানল না তৌফিক। উঠে

সোজা তার সামনে গিয়ে বসল, 'খবর বলো।'

'ইডিয়েট! সরে থাকো আমার কাছ থেকে। তোমার সাথে জড়াতে চাই না আমি।'

'অনেক আগেই জড়িয়ে পড়েছ,' তৌফিক জোর দিয়ে বলল। 'নিকোলাস সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, আমি তাকে অপমান করছি তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে। কালাম সাহেব জানতে চাইছেন, রাশান ভাষার প্রতি হঠাৎ আমার অনীহার কারণ কি?'

'খবর নেই। এই মুহূর্তে তোমার জন্যে কোন খবর নেই।'

তৌফিকের চাপা স্বরে ব্যাকুলতা ফুটল, 'মকবুল, বিপদটা বুঝবার চেষ্টা করো। খানিক আগে শুনলাম, নতুন জেলখানার একটা অংশ তৈরি হয়ে গেছে। ভয়ে মরে যাচ্ছি আমি। যখন তখন ট্র্যান্সফারের অর্ডার আসতে পারে।'

'এ-ধরনের কাজ তাড়াহুড়ো করে হয় না। সেট-আপটা খুবই কমপ্লিকেটেড। ওরা তোমার দশ হাজার টাকা নিয়ে কি করছে বলে মনে করো? ব্যাপারটা অত সোজা নয়। গোটা একটা এস্কেপ লাইন তৈরি করা চাট্টিখানি কথা নাকি! কিভাবে কি হবে জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে প্রতিবার আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ন নেই, বুঝেছ? তোমার মত ঘুঘুর অন্তত এসব বোঝা উচিত। অভিজ্ঞতা তো কম নেই তোমার।'

তৌফিক চেয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড, 'তার মানে আমার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে ওরা?'

'করবে না! দশ হাজার টাকার অংশ বিশেষ চেকিঙের কাজে খরচ হয়েছে। 14-K সিকিউরিটি মাইণ্ডেড। সে যাই হোক, তোমার রেকর্ডগুলো দারুণ ইন্টারেস্টিং। এবার পা ফসকাল কিভাবে তাই ভাবি!'

'পা সকলেরই একবার না একবার ফসকায়,' তৌফিক বলল। 'ত্রিপোলী থেকে আমার সম্পর্কে কি জানতে পেরেছে ওরা? পাস করেছি?'

'স্টার মার্কসহ, প্রথম বিভাগে।'

ঠিক তিনদিন পর নিজেই আলোচনার জন্যে মকবুল এল তৌফিকের কাছে, 'ইট্স সেট!'

'গতকাল অন্য সেল দিয়েছে আমাকে।'

'কিছু এসে যায় না। সেল ভেঙে বেরুতে হবে না তোমাকে। শনিবার দিনের বেলা, এক্সারসাইজ ইয়ার্ড থেকে তোমাকে তুলে নেয়া হবে। ঠিক তিনটের সময়। ভুলে যেয়ো না।'

'দিন দুপুরে…এক্সারসাইজ ইয়ার্ড থেকে? সবার চোখের সামনে দিয়ে… খেপেছ? না ইয়ার্কি?'

অদ্ভুত শান্ত দেখাল মকবুলকে।

'খেপিনি। ইয়ার্কিও নয়। মনে রেখো—শনিবার, এক্সারসাইজ ইয়ার্ড, বিকেল তিনটে।' কথাটা বলেই পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল মকবুল।

মকবুলের পিছু নিল তৌফিক। 'মাঠের কোন্ জায়গাটায় থাকতে হবে আমাকে? কিভাবে কি ঘটবে কিছুই যদি না জানি…'

'যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু জানতে পারবে সময় হলেই। এর বেশি এখন কিছুই জানানো সম্ভব নয় দুশ্চিন্তা কোরো না—দেখবে, ঠিকই বের করে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাদের।'

'বহুবচন!'

'হ্যাঁ।' এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল মকবুল। 'দু'জন বেরোচ্ছ তোমরা শনিবারে। তুমি তাকে সাহায্য করবে।'

'কে? আর কে যাবে আমার সাথে?'

ঘুরে দাঁড়াল মকবুল। চাপা কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'নিকোলাস!'

চার

অবিশ্বাস ফুটে উঠল তৌফিকের চেহারায়।

'তোমার মাথা ঠিক আছে তো?'

'এমন আকাশ থেকে পড়বার কি আছে! আর কেউ মুক্তি পাক চাও না তুমি?'

'ও তো অচল! কী বলছ তুমি!' তৌফিক প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতে চাইছে। 'দৌড়াতে পারবে না।'

'সেজন্যেই তো তোমার সাহায্য লাগবে।' মকবুল গম্ভীর। 'রাজি না হলে তাও বলো।'

'ধরো রাজি নই।'

'সেক্ষেত্রে,' মকবুল কাঁধ ঝাঁকাল। '14-K তোমাকে চেনে না, চিনবে না।'

'রাজি!' তৌফিক বলল। 'মানে, পড়েছি মোগলের হাতে, খানা...'

হাসল মকবুল, 'শোনো, লাঠি দুটো আসলে একটু বাড়াবাড়ি, বুঝলে? নিকোলাস ও-দুটো ছাড়াও হাঁটতে পারে। দৌড়ুতেও কমবেশি পারবে।'

'ঝুঁকিটা ভেবে দেখেছ? ওকে সাহায্য করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যাই সলিটারিতে থাকতে হবে ছয়মাস। তুমি জানো, তার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। তারপর বদলি করবে নতুন জেলে, ওখান থেকে পালাবার কোন উপায়ই থাকবে না।'

'একই ঝুঁকি রয়েছে নিকোলাসেরও,' মকবুল বলল, 'তৌফিক, কথাটা পরিষ্কার জানানো দরকার তোমাকে। আমাদের কাছে তোমার চেয়ে নিকোলাস অনেক বেশি দামী। বললে তুমি বিশ্বাসই করবে না কত টাকা পাচ্ছি আমরা ওর জন্যে। আর নতুন জেলের ভয় করছ, বলেই ফেলি, রবিবারেই তোমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা ঠিক করা হয়ে গেছে।'

'তার মানে, বাধ্য করছ আমাকে,' তৌফিক বলল। 'কিন্তু এমন তো কথা ছিল না?'

'কথা কিছুই ছিল না,' মকবুল বলল। 'তোমার আপত্তিতে কিছুই যায় আসে না। আরও শোনো,' মকবুল আর একটু দৃঢ় করল স্বর, 'যদি কোন কারণে নিকোলাস এপারে রয়ে যায়—লাভ হবে না তোমার। কারণ...

'কারণ?'

দু'হাত একত্রিত করে পিস্তল তৈরি করে গুলি ছাড়ল মকবুল, 'একা তোমাকে ওপারে দেখামাত্র—ঠাস!'

দু'জন চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

মকবুলই নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'নিকোলাস একার চেষ্টায় সফল হবে না, এ আমরা জানি। তোমার সাহায্য লাগবেই। তুমি যাতে সাহায্য করো··'

তৌফিককে চূড়ান্ত বেজার দেখাল, 'ঠিক আছে, গিলব আমি ঢেঁকি। কিন্তু তার আগে নিকোলাসের সাথে কথা বলতে হবে আমাকে।'

'না!' মকবুলের কণ্ঠে হুঁশিয়ারি। 'তার কাছাকাছিও যেতে পারবে না তুমি, চুক্তির এটাও একটা অংশ।' রওনা হলো সে। 'শনিবার। মাঠে।'

দুটো দিন আর কাটতেই চায় না তৌফিকের।

ঘটনাবিহীন একঘেয়ে বন্দী জীবনে দুটো দিন অনেক সময়।

ঘটনা একটা ঘটতে পারত, কিন্তু ঘটতে দিল না মকবুল। শুক্রবার সকালে চুল ছাঁটার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে অর্ধেক খাওয়া সিগারেট বাড়িয়ে দিয়েছিল তৌফিক একজন কয়েদীর দিকে, খটাস করে প্রচণ্ড জোরে একটা ব্যাটনের বাড়ি পড়ল ওর কব্জির ওপর। ঝট করে ফিরে দেখল সে, বাঁকা হাসি ঠোঁটে টেনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জোয়ারদার। বাম হাতে ব্যাটন, ডান হাত কোমরে ঝুলানো রিভলভারের বাঁটে।

রাগে অন্ধ হয়ে গেল তৌফিক, কিন্তু ঠিক যখন ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে সেই মুহূর্তে শুনতে পেল কানের কাছে মকবুলের ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, 'কোয়ায়েট, তৌফিক! গোলমালে জড়িয়ো না নিজেকে!'

দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিল তৌফিক। এক মিনিট পর আবার যখন ঘাড় ফিরাল, দেখল বেশ কয়েক হাত তফাতে সরে গেছে জোয়ারদার, ওখান থেকে ভ্রূ কুঁচকে বিস্মিত দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে।

কিছু কি সন্দেহ করে বসল ব্যাটা?

শনিবার।

মুক্তাঙ্গনে মার্চ করে গেল তৌফিক আর সকলের সাথে। দুটো ফুটবল নামল মাঠে। হাঁটুর উপর লুঙ্গি তুলে হাডু-ডু খেলোয়াড়রা দল পাকাচ্ছে। সোজা মকবুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সে বলল, 'ঘোড়ার মত দুলকি চালে আমরা চক্কর মারব গোটা মাঠটা, পাঁচিলের গা ঘেঁষে,' বলেই ছুটল সে। তৌফিক সঙ্গ নিল।

পঞ্চাশ গজ অতিক্রম করে আবার মুখ খুলল মকবুল, 'সামনের পাঁচিলে নকশাটা দেখছ?'

তিন মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল। এক মানুষ সমান উঁচুতে চক দিয়ে কেউ একটা মানুষের মাথা এঁকে রেখেছে। কৌতূহল চেপে রেখে বলল তৌফিক, 'দেখছি।'

'এই জায়গার ওপর দিয়ে আসবে একটা যান্ত্রিক হাত। থেমো না। উল্টো দিকে পৌঁছে থামব। জোয়ারদার লক্ষ করছে আমাদেরকে।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তৌফিক। হ্যাঁ, জোয়ারদার।

'হয়তো লাফ দিয়ে ধরতে হবে তোমার রাশিটা,' মকবুল বলল 'প্ল্যাটফর্মে অবশ্য লোক থাকবে সাহায্য করবার জন্যে।'

'প্ল্যাটফর্ম? কিসের প্ল্যাটফর্ম? কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

'চেরি-পিকার্সের। রাস্তায় বাতি মেরামত করতে দেখোনি? রশি ঝুলানো থাকবে। ধরতে হবে লাফিয়ে।'

'লাফিয়ে ধরতে হবে? কিন্তু নিকোলাস কি করবে?' তৌফিক দেখল মাঠের আরেক দিকে দু'হাত পিছনে বেঁধে নিকোলাস ফুটবল খেলা দেখছে। এতটুকু আগ্রহ নেই তার অন্য কোনদিকে। যেন ফুটবল ছাড়া দুনিয়ায় অস্তিত্বই নেই আর কিছুর।

'ওকে আগে তুলে দিয়ে তারপর তুমি উঠবে। প্ল্যাটফর্ম থেকে দড়ি নামানো হবে তোমাদের জন্যে। দড়িটা একবার ধরিয়ে দিলে আর কোন অসুবিধে হবে না, ঠিকই ঝুলতে থাকবে ও পেণ্ডুলামের মত।'

তৌফিক বলল, 'যদি ঝুলতে ঝুলতে পাকা ফলের মত খসে পড়ে?'

'সেক্ষেত্রে মনে করতে হবে তোমার ভাগ্য খারাপ। নিকোলাস ব্যর্থ হলে...আসলে কথাটা এইভাবে বলা উচিত, নিকোলাসকে ওপারে নিয়ে যেতে তুমি ব্যর্থ হলে দুনিয়া থেকে খসে পড়তে হবে তোমাকেও। দাঁড়াও এখানে। একটু পরই চলে যাব আমি।' হাঁপাচ্ছে মকবুল। 'তুমি নড়বে না। এক চোখ রাখবে পাঁচিলের দিকে, আরেক চোখ আমার দিকে। আবার এমন ভাব কোরো না যাতে কেউ বুঝতে পারে কিছু ঘটবার আশায় আছ।' মকবুল তার বাঁ হাতের মুঠো খুলল। তৌফিক দেখল ছোট্ট একটা লেডিস ঘড়ি সেখানে। 'আর মাত্র দশ মিনিট।'

'নিকোলাস কি...?' প্রশ্নটা আর করার দরকার হলো না, তৌফিক দূরে তাকাতেই দেখল নিকোলাস ধীর মন্থর গতিতে পাঁচিলে আঁকা নকশাটার দিকে এগোচ্ছে। 'কিন্তু এই দিন-দুপুরে...গুলি করবে না সেন্ট্রিরা? এত লোকের মধ্যে দিয়ে...'

'তোমাকে যা নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তুমি শুধু সেসব অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাও। আর কিছুই ভাবতে হবে না তোমার। সব ব্যবস্থা করা হয়েছে—নিখুঁতভাবে ঘটে যাবে ঘটনাটা। তোমার কাছ থেকে সরে যাব এবার আমি। আহ্! নিকোলাসের দিকে তাকিয়ো না। ওকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে ও তাই করছে। শোনো, তিনটে বাজার ঠিক দুই মিনিট বাকি থাকতে হৈ-হট্টোগোল শুরু হবে। যাই ঘটুক, সেদিকে চোখ ফেরাবে না। মারপিট শুরু হওয়া মাত্র তুমি হাঁটতে শুরু করবে। খবরদার, দৌড়াবে না। মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটবে সোজা ওই নকশার দিকে, ধীর পায়ে। তোমাকে নিকোলাস দেখতে পাবে, সে-ও ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে সময় মত।'

'ওর সাথে আগেই কথা বলা উচিত ছিল আমার

'অমন ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিতে চাইনি আমরা।' মকবুল হঠাৎ দাঁত বের করে হাসল। 'যাচ্ছি, তৌফিক। যদি বাঁচতে চাও, নিকোলাসকে ফেলে যেয়ো না।' ঘড়ি দেখল সে আবার। 'সাত মিনিট আছে আর!'

সরে গেল মকবুল। তৌফিক পাঁচিলের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে তাকাল সোজা উল্টো দিকে। নিকোলাস নকশাটার কাছ থেকে পনেরো-বিশ গজের মত দূরে

দাঁড়িয়ে আছে। হাতের একটা লাঠি পরীক্ষা করছে সে গভীর মনোযোগের সাথে।

মকবুলের অট্টহাসিতে ঘাড় ফেরাল তৌফিক। আকাশের দিকে মুখ তুলে হাসছে মকবুল দশ গজ দূরে। তার সামনে ইসহাক খান। রেপ কেসে ঘুমাচ্ছে সে।

তৌফিক পাঁচিল থেকে পিঠ তুলে নিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। ঋজু হয়ে দাঁড়াল তারপর। ফুটবলে কিক্ করার ভঙ্গিতে প্রথম ডান পা, তারপর বাঁ পা ছুঁড়ল সামনের দিকে। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে বাংলার ৫-এর মত করল শরীরটাকে, ৫-টা দুই পাক ঘুরে নেমে এল নিচে। শরীরটাকে টানটান করে দু'কোমরে হাত রাখল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ল খানিকক্ষণ।

শরীরটাকে জড়তামুক্ত করে মকবুলের দিকে তাকাল সে। মনের আনন্দে বকবক করে চলেছে। ইসহাক গোগ্রাসে গিলছে তার কথা। এদিক ওদিক তাকিয়ে কালাম সাহেব বা জোয়ারদারকে কোথাও দেখতে পেল না তৌফিক। খেলাধুলো জমে উঠেছে মাঠের চারদিকে। সুবেদাররা তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে নিয়মের কোথাও কোন ব্যত্যয় ঘটছে কিনা। মিয়াসাবরা ঘুরঘুর করছে এখানে-সেখানে। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু সাত মিনিট তো কখন পেরিয়ে গেছে, নাকি দুই মিনিটও পেরোয়নি!

হাতের তালু দুটো ঘামে ভিজে গেছে অনুভব করল তৌফিক। বুকের কাছে ফতুয়াতে হাত দুটো মুছে নিল সে। গোটা কয়েক বুক ডন আর বৈঠক দিয়ে উঠে আবার তাকাতে দেখল মকবুল শব্দ করে হেসে উঠেই ইসহাকের পিঠে চাপড় মারল।

মকবুলকে সিগন্যাল দিতে দেখেনি তৌফিক। কিন্তু গণ্ডগোলটা কানে বাজল হঠাৎ করে। এক সেকেণ্ডের জন্যে থতমত খেয়ে গেল সে। কোন দিকে তাকাবে ঠিক করতে পারল না। হঠাৎ করেই হৈ-চৈ বেধে গেছে মাঠে। উঁচু গলার চিৎকার আসছে দু'দিক থেকে।

তৌফিকের হাতের বাঁ এবং ডান দিকে দুটো ভিড় জমে উঠছে। শুরু হয়ে গেছে হাতাহাতি। মাঠের যেখানে যে আছে, হয় বাঁ দিকে নয় ডান দিকে ছুটছে। তৌফিক পা বাড়াল। ইসহাকের পিঠে চাপড়, ওটাই সিগন্যাল ছিল, বুঝতে পারল সে।

চোখের কোণে দেখতে পেল তৌফিক, নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে এগিয়ে আসছে নিকোলাস ধীর পায়ে।

তৌফিকের আশপাশটা ফাঁকা হয়ে গেছে। এমনি সময়ে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ছায়াটা। জোয়ারদার হাঁটছে তারই সাথে সাথে। চোখের দৃষ্টি যদিও দূরবর্তী একটা হট্টগোলের দিকে, কিন্তু তৌফিক স্পষ্ট অনুভব করল, তাকে গার্ড দেবার জন্যেই সে যেন বেরিয়ে এসেছে কোন আড়াল থেকে।

তৌফিকের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল জোয়ারদার। তার দিকে তাকালই না, ফলে সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হলো তৌফিকের।

নির্দেশ অমান্য করে দিক পরিবর্তন করল তৌফিক। জোয়ারদারকে অনুসরণ করে মারপিটের দিকেই যাচ্ছে সে, বোঝাতে চাইল। তৌফিকের বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করল জোয়ারদার, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে।

তৌফিক অন্য কোন দিকে যাচ্ছে না বুঝতে পেরে জোয়ারদার ছুটতে শুরু করল নিশ্চিন্ত মনে।

উপর দিকে কি মনে করে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল ডিপটি কালাম সাহেবের সাথে। দোতলার একটা জানালার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে অনুধাবন করবার চেষ্টা করছে গোলমাল কিসের।

চোখ নামিয়ে নেবার আগে বাকি গোটা দশেক জানালাগুলোর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে। খালি নেই একটাও। এত লোকের চোখের সামনে দিয়ে কি করে পার করবে ওদের 14-K?

বুম! বুম! বুম-বুম!

মাথা নিচু করে হাঁটছে তৌফিক। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। ঠিক এমনি সময়ে পিছন থেকে বোমা ফাটার শব্দ ভেসে এল। নির্দেশ অগ্রাহ্য করে পিছন ফিরল সে। মাত্র দশ গজ পিছনে ধোঁয়া উঠছে। সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সবকিছু। বুম! বুম!···ছয়টা, সাতটা, আটটা, নয়টা···। মাথার উপর দিয়ে উড়ে এসে পিছনে পড়ছে বোমাগুলো। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না তৌফিকের। ঠিক সময় মত পাঁচিলের ওপার থেকে স্মোক বোম ছুঁড়ছে কেউ।

পিস্তলের সিঙ্গল শটের শব্দ হলো—ঠাস! ধোঁয়ার ভিতর আটকা পড়ে গেছে তৌফিক। বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সে এখন। ছুটল তৌফিক। এই ধোঁয়ার মধ্যে নিকোলাসকে খুঁজে বের করতে না পারলে···

মাথার উপর অস্পষ্টভাবে যন্ত্রদানবটাকে দেখতে পেল তৌফিক। নেমে আসছে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে। পাঁচিলের মাথার উপর কাঁটাতারের বেড়া, তার উপর দিয়ে চলে এসেছে ইস্পাতের দীর্ঘ বাহুটা। প্ল্যাটফর্মটা দেখা যাচ্ছে আবছা। মাস্ক পরা একজন লোক আছে। হাতে টেলিফোন। কথা বলছে রিসিভারে। প্ল্যাটফর্মের চার কোনা থেকে ঝুলছে চারটে মোটা দড়ি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিকোলাসের টিকিও দেখতে পেল না তৌফিক। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সে। এমনি সময়ে ঢং ঢং করে বাজতে শুরু করল পাগলা-ঘণ্টি: কয়েদী পালাবার সঙ্কেত। গগনবিদারী এক একটা হাঁকডাক বুকের ভিতর বজ্রপাত ঘটাচ্ছে। উপর দিকে তাকিয়ে ঝুলন্ত দড়িগুলোকে আবার দেখল তৌফিক। মরা সাপের মত ঝুলছে। লাফ দিলেই ধরা যায়।

'নিকোলাস!' আওয়াজ বের হলো না গলা থেকে—শুধুই বাতাস।

সাড়া নেই। ভয় পেয়ে ভেগেছে নাকি? উন্মাদের মত ঘুরছে তৌফিক। বাঁ দিকে ঘুরছে, ডান দিকে ঘুরছে, পিছন দিকে ঘুরছে। দরদর করে নেমে আসছে দু'চোখ থেকে পানির ধারা।

'নিকোলাস!' দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে উঠল তৌফিক।

পায়ে বাধল কি যেন। মুখ নিচু করতেই নিকোলাসকে দেখতে পেল সে। লাঠি ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেছে, হাঁপাচ্ছে তৌফিকের পায়ের উপর মাথা রেখে।

ঝুঁকে পড়ে দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে হেঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দিল তৌফিক নিকোলাসকে। কোমরের দু'দিকটা দুহাত দিয়ে ধরল পরমুহূর্তে, শূন্যে

তুলে দিল দেহটাকে।

অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে নিকোলাস। তার বুক অবধি নেমে এসেছে দড়িগুলো, একটা তার মাথার পাশ দিয়ে গলার কাছে দুলছে। ছোঁ মেরে মশা ধরার চেষ্টা করছে যেন সে। কয়েকবার ব্যর্থ হবার পর ধরল দড়িটা। হাঁফ ছাড়ল তৌফিক ভারমুক্ত হয়ে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে লোকটা ঝুঁকে পড়ে দেখছে ওদেরকে। নিকোলাস দড়ি ধরে ঝুলে পড়েছে দেখে ব্যগ্র ভঙ্গিতে ফোনে কথা বলতে শুরু করল সে। সেই সাথেই প্ল্যাটফর্মটা উঠে যেতে শুরু করল।

ফেলে পালাবার মতলব নাকি? মাথায় কথাটা ঢোকার সাথে সাথে প্রাণ বাজি রেখে মরিয়া হয়ে লাফ দিল তৌফিক। তাকে ফেলে রেখে উঠে যাচ্ছে দড়িগুলো। দড়িটা ধরল বটে সে, সড়সড় করে নেমে এল হাতটা শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। গিঁট ছিল বলে রক্ষে, সেটায় আটকে গেল মুঠোটা।

নিকোলাসের জুতো পরা পা দুটো তৌফিকের নাকে মুখে গুঁতো মারছে অনবরত। মাথা নিচু করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে তৌফিক, হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনি, সেই সাথে নিচের দিকে প্রচণ্ড টান অনুভব করল সে। তাকাতেই দেখল, জোয়ারদার। তার একটা পা ধরে ঝুলে পড়েছে। সবেগে উঠে আসছে তার সাথে শূন্যে। নিজের সাথে জোয়ারদারের শরীরের ভার যুক্ত হওয়ায় রশি ধরে ঝুলে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। ঝুলে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টায় মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে উঠল তৌফিকের। সেই বিকৃত মুখের ওপর থেকে থেকে বাড়ি খাচ্ছে এসে নিকোলাসের জুতো জোড়া।

বাঁ পা তুলে লক্ষ্য স্থির করল তৌফিক সময় নিয়ে। সবেগে সেটা নামিয়ে দিল জোয়ারদারের নাক-মুখের ওপর। হাত ফস্কে গেল তৌফিকের পা থেকে। মুহূর্তে ধোঁয়ার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল জোয়ারদার। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তৌফিক।

কাঁটাতারের বেড়াটা দেখতে পেল সে নিচে, সরে যাচ্ছে পিছনে। রশি বেয়ে ওপরে উঠে গেছে নিকোলাস, প্ল্যাটফর্মে তুলে দিয়েছে দেহের ঊর্ধ্বাংশ, কোমরের নিচেটা ঝুলছে এখন শুধু। প্ল্যাটফর্ম নামতে শুরু করেছে। টেলিফোন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা তৌফিককে রশি বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে দেখে ঝুঁকে পড়ল, 'অস্থির হবার দরকার নেই। আমি যা করব, আপনারাও তাই করবেন।'

বেরিয়ে এসেছে ওরা প্রাচীরের বাইরে। রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা। পৌরসভার বাতি মেরামতের বিশাল গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা ব্লক করে। পাঁচ ফিট থাকতেই স্থির হয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম। দড়ি ছেড়ে দিয়ে রাস্তার ওপর সশব্দে নামল তৌফিক। নিকোলাস ইতিমধ্যে দড়ি ধরে সড়সড় করে নামতে শুরু করেছে।

লাফ দিয়ে নিকোলাসের আগে নেমে এল প্ল্যাটফর্মের লোকটা। দরজা খুলে ড্রাইভিং সীট থেকে উঁকি দিল একজন ন্যাড়া লোক। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছে উত্তেজনা দমনের জন্যে।

তৌফিক এবং প্ল্যাটফর্মের লোকটা একযোগে ধরল নিকোলাসকে। সে যেন একটা টাকার বস্তা। ধরাধরি করে ড্রাইভারের পাশের সীটে তুলল ওরা তাকে। তারপর উঠে পড়ল ঠাসাঠাসি করে নিজেরাও।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগেই ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটতে শুরু করল ট্রাকটা। সীটের উপর বসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিকোলাস তৌফিকের গায়ের উপর। চুল ধরে নিকোলাসকে সরিয়ে দিল সে এক কোনায়।

প্ল্যাটফর্মের লোকটা সাফল্যের আনন্দে আটখানা। কিন্তু তৌফিক তার দিকে তাকাতেই প্যাঁচার মত করে ফেলল মুখটাকে, 'মি. নিকোলাসের গায়ে এরপর হাত তুললে হাতটা ভেঙে ফেলে দেব।' পকেটের ফোলা অংশটায় আদর করে হাত বুলাল সে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই থেমে দাঁড়াল চেরি পিকার্স। একটা গলি থেকে বেরিয়ে আসা মাইক্রোবাসে উঠল ওরা। ছুটল মাইক্রোবাস। বাঁক নিচ্ছে, তীব্র ঝাঁকুনিতে স্প্রিংয়ের মত লাফ দিয়ে তৌফিকের কোলের উপর উঠে এল নিকোলাস। ঠোঁট বাঁকা করে তাকাল তৌফিক লোকটার দিকে। মুখোমুখি লম্বা সীটে বসে চেহারাটাকে নির্বিকার করে রাখল লোকটা।

নিকোলাস কচি খোকার মত বলল, 'আমি নামব!'

শব্দ করে হেসে উঠে তৌফিক নিকোলাসের কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'নরক পর্যন্ত নামতে হবে তোমাকে, নিকোলাস! ওয়েট অ্যাণ্ড সি!'

'পে অ্যাটেনশন!' লোকটা সীটের কিনারায় সরে এল। 'এই গাড়ি ছেড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো একটা মিনিভ্যানে উঠতে হবে আপনাদের। তৈরি থাকুন!'

শনিবার বিকেলের অবসন্ন শহর, রাস্তা প্রায় ফাঁকা। লোকটার মাথায় সজারুর কাঁটার মত চুলের উপর দিয়ে উইণ্ডস্ক্রীন ভেদ করে দৃষ্টি ফেলল তৌফিক সামনে। কোথায় মিনি ভ্যান? একটা তেচাকাওয়ালা রিকশাও দেখা যাচ্ছে না।

টার্ন নিচ্ছে মাইক্রোবাস। সুবর্ণ সুযোগ! নিকোলাসকে ছুঁড়ে মারল তৌফিক। কোল থেকে ছিটকে গিয়ে জানালার ফ্রেমের সাথে মাথা ঠুকল সে, তৌফিক আফসোস প্রকাশ করল, চুচ্-চু, চুচ্-চু। একহাতে দরজা খুলে ফেলল সে, মাইক্রোবাস তখনও থামেনি পুরোপুরি, লাফ দিয়ে নামল রাস্তায়, তিনটে লাফ দিল মেপে, শেষ লাফে মিনি ভ্যানের উপর গিয়ে উঠল।

নিকোলাসকে পাঁজাকোলা করে তুলে আনল লোকটা, কটমট করে দেখল তৌফিককে, 'মি. নিকোলাসকে সাহায্য করবার নির্দেশ দেয়া হয়নি আপনাকে?'

'পাঁচিলের ওপারেই পাওনা সাহায্য মিটিয়ে দিয়েছি,' তৌফিক বলল। 'এপারে ওর দায়িত্ব আমার নয়।'

খটাস করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তৌফিকের গায়ে ধাক্কা দিয়ে এগোতে যাচ্ছিল লোকটা, সরে গিয়ে বেতাল করে দিল ওকে তৌফিক। কোনমতে সীট ধরে সামলে নিল সে নিজেকে।

বেঞ্চিতে বসে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে নিকোলাস বেঞ্চির কিনারা। হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল তৌফিকের পক্ষে। এই লোক স্পাই, বিশ্বাস করা কঠিন!

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'কথা নয়।'

কথা নয়, হুঙ্কার। মনে মনে স্বীকার করল তৌফিক।

মিনিট বিশেক পর থামল মিনি ভ্যান।

'নামুন। কুইক!'

দরজা খুলে লাফ দিল তৌফিক। পরমুহূর্তে চমকে উঠল সে। মিনিবাসের দরজা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে, ছুটছে আবার ফুল স্পীড়ে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে তৌফিক একা। পরনে কয়েদীর পোশাক।

পিছন দিকে তাকাতে যাবে, হলুদ রঙের একটা ট্যাক্সি সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল পাশে। হাতল ধরে হেঁচকা টানে দরজা খুলে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল তৌফিক। হাঁপাচ্ছে। চর্বি থলথলে ঘাড় দেখা যাচ্ছে ড্রাইভারের। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো তৌফিক। ড্রাইভারের মাথার পাশ দিয়ে চলে গেল দৃষ্টি। উইণ্ডস্ক্রীনের কাঁচ দেখা যাচ্ছে। সামনের রাস্তায় কালো মিনিভ্যানটা নেই। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিকোলাসকে?

'আমাদেরকে আলাদা করা হলো কেন?'

ড্রাইভার চুপ।

'আমাদেরকে আলাদা করা হলো কেন?' একই প্রশ্ন তৌফিকের।

একই অবস্থা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

তথৈবচ।

'বোবা নাকি?'

ড্রাইভিং সীট থেকে নাদুসনুদুস বলল, 'ঠাণ্ডা মাথায় গাড়ি চালাতে দিন। বকবক করবেন না। সময় মত সবই জানতে পারবেন।'

পিছন দিকে চাইল তৌফিক। সরীসৃপের মত পড়ে আছে আঁকাবাঁকা রাস্তা। সত্যিই অদৃশ্য হয়ে গেছে কালো মিনিভ্যানটা। সামনে-পিছনে, কোন দিকেই নেই।

দশ মিনিটের মধ্যে ছয়টা বাঁক নিল গাড়ি, লক্ষ্য করল তৌফিক। পিছনের সীটে হেলান দিয়ে দ্রুত ভাবছে সে। আলাদা করা হলো কেন? উদ্দেশ্য কি এদের? কিছু সন্দেহ করেছে ওরা? নিকোলাসকে কি সরিয়ে নিয়ে গেল সেইজন্যেই?

আরও দশ মিনিট পর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে আবার উঁচু হলো তৌফিক। গতি কমে আসছে গাড়ির। কাঠের প্রকাণ্ড গেটটা হাঁ করে আছে দেখতে পেল সে সামনে তাকাতেই। ড্রাইভার এতটুকু ইতস্তত না করে ট্যাক্সি নিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘড়-ড়-ড় ঘড়-ড়-ড় শব্দে বন্ধ হয়ে গেল গেট। আবছা অন্ধকারে ভালমত কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বসে রইল তৌফিক। ব্যাকডোর খুলে গেল। তবু অন্ধকার। 'কই, বেরিয়ে আসুন আপনি।' তৌফিক চমক অনুভব করল। সুরেলা নারী কণ্ঠও আছে তাহলে এই ধুমধাড়াক্কার মধ্যে!

অন্ধকারে সবাই অন্ধ। তৌফিক মন্থর ভঙ্গিতে নামতে গিয়ে নরম দেহের সাথে ধাক্কা খেল। পুলক অনুভব করল সে নরম একটা হাত তার গায়ে পড়তে। মেয়েটা তাকে ধরে সাহায্য করতে চাইছে।

ফ্রন্ট ডোরটা বন্ধ হলো সশব্দে।

আবার সেই সুরেলা কণ্ঠ, 'আহ্! আলো জ্বলছে না কেন কেউ?'

খুট করে শব্দের সাথে গ্যারেজের ভিতর আলোর ঢল নামল। আঁটো প্যান্ট-শার্ট পরা মেয়েটির পাহাড়ী বুকের দিকে চোখ রেখে মন্তব্য করল তৌফিক, 'মাশাল্লা!'

ভ্রূক্ষেপ করল না মেয়েটা। কতদিনের যেন চেনা, তৌফিকের হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল সদ্য উন্মুক্ত একটা দরজার দিকে, কণ্ঠে মৃদু ঝাঁঝ, সাদর শাসনের সুর স্পষ্ট, 'ঠাট্টা রাখুন! দেরি করলে ডুববেন।'

দরজা পেরিয়ে সুসজ্জিত একটা ঘরে ঢুকল তৌফিক।

আলোর নিচে পরিষ্কার ফুটে উঠল মেয়েটার আশ্চর্য রূপ। শুধু পুরুষ্ট শরীরই নয়, শ্রী আছে মুখে। কালো ববড় চুলের ফ্রেম, মাঝখানে ফর্সা, নিখুঁত একটা অবয়ব। কুচকুচে কালো চোখের মণি দুটো।

চিবুক নেড়ে বাথরুমটা দেখাল তাকে মেয়েটা, 'হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন। ভাল কথা, ক্লিনশেভ দেখতে চাই আপনাকে।'

'কেন?' আপাদমস্তক দেখল তৌফিক মেয়েটাকে। মেরুন রঙের প্যান্টের সাথে সাদা শার্টে দারুণ মানিয়েছে ওকে।

'কেন মানে?' মেয়েটা কটাক্ষ হেনে বলল। 'খোঁচা খেতে পছন্দ করি না আমি। আপনার স্ত্রী বুঝি পছন্দ করে?'

'আমার স্ত্রী?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে টেবিলের উপর রাখা ব্রীফকেসটা খুলল মেয়েটি বাঁ হাত দিয়ে। 'এর ভিতর সব আছে। আপনি তৈরি হয়ে নিন, আমি আসছি।'

ঠিক। সবই পেল তৌফিক ব্রীফকেসের মধ্যে। প্যান্ট-শার্ট, রুমাল, সিগারেটের প্যাকেট, ব্যাটারি চালিত রেজার, টুথপেস্ট, ব্রাশ, পাসপোর্ট এবং স্ত্রীপুত্রসহ নিজের ফটো। বাথরুম সেরে বেরিয়ে এল সে পাঁচ মিনিটেই।

'আপনি শ্রীলঙ্কার নাগরিক, নাম লবঙ্গম আদনান। আপনার স্ত্রী স্কুল টীচার, ছেলে ওয়ানে পড়ে। বুঝতে পেরেছেন?' তৌফিকের পিঠে বুকের চাপ দিয়ে নরম ঠেলা দিল মেয়েটা। 'চেয়ারে বসুন। আপনার চুলে কলপ লাগাতে হবে। এই ফাঁকে আপনি কাগজপত্র ঘেঁটে জেনে নিন সব তথ্য।' ফাইলটা কাঁধের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল সে।

'এতবার গাড়ি বদল করে এখানে নিয়ে আসা হলো কেন আমাকে?' চেয়ারে বসে প্রশ্ন করল তৌফিক। কোলের উপর রাখল ফাইলটা।

পিছন থেকে মেয়েটা বলল, 'আমরা আশঙ্কা করেছিলাম রাস্তায় ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে ওরা আপনাকে।'

'ওরা?' ফাইল খুলতে গিয়ে থমকে গেল তৌফিক। 'কারা?'

'আপনার বন্ধুরা। কোথায় তারা?' জানতে চাইল মেয়েটা।

চুপ করে রইল তৌফিক। দ্রুত চিন্তা করল খানিক। তারপর বলল, 'আমার বন্ধুদের কথা তুমি কি জানো?'

'বন্ধুদের কথা না হয় বাদ দিন।' বলল মেয়েটা তৌফিকের মাথায় চিরুনি চালাতে চালাতে। 'আপনার বান্ধবীর কথা আরও জানতে চাই। আপনাকে জেল

থেকে বের করব আমরা এ খবর জেনেও সে চুপ করে রইল কিভাবে? মনে হচ্ছে, আপনাকে সে ত্যাগ করেছে। কিন্তু আমার হাত থেকে আপনার নিষ্কৃতি নেই।'

চুপ করে রইল তৌফিক। সতর্ক হয়ে উঠেছে সে। সন্দেহ নয়, পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, 14-K তার সম্পর্কে অনেক খবর সংগ্রহ করে ফেলেছে।

'কি, কথা বলছেন না যে?'

'প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি,' বলল তৌফিক। স্পষ্ট প্রশ্ন করল ও। 'আমার বান্ধবী মানে?'

'আগামী চব্বিশ ঘণ্টা আমিই আপনার বান্ধবী,' বলল মেয়েটা। 'জেলে আপনি উপোষ ছিলেন এতদিন, কিন্তু আপনার বান্ধবী নিশ্চয়ই চুটিয়ে অন্য কারও সাথে… কে জানে, হয়তো বসের সাথেই এতদিন…'

'বস?'

তৌফিকের কাঁধে চাপড় মারল মেয়েটা। 'আহ্! ন্যাকামি করছেন কেন? আপনি আর আপনার বান্ধবী চাকরি করতেন না ডাকাতি করার আগে?'

'আমি লিবিয়া থেকে আসার দু'চারদিন পরই ধরা পড়ি, চাকরি করব কিভাবে?' তৌফিক বলল। 'তাছাড়া, আমার কোন বান্ধবী নেই।'

'ও তাহলে আপনার বান্ধবী নয়? বোন-টোন নাকি?' মেয়েটা ব্যঙ্গাত্মক স্বরে হাসল। 'সে যাক। দীর্ঘদিন উপোষ আছি আমিও।' তার কাঁধে চিবুক রাখল সে। 'আগামী চব্বিশটি ঘণ্টা রয়েছে আমাদের হাতে। প্লীজ, তৌফিক, আমাকে আবার বোন-টোন বানিয়ে বোসো না চট্ করে।'

ফাইল বন্ধ করে তৌফিক জিজ্ঞেস করল, 'আমার প্যান্ট শার্টের মাপ জানলে কিভাবে তোমরা?'

'সবই জানি আমরা তোমার সম্পর্কে,' বলল মেয়েটা। 'শুধু জানি না আসল পরিচয়টা।'

'বুঝলাম না,' বলল তৌফিক।

'আটচল্লিশ লাখ টাকার মাল লুট করে কার না কার কাছে রেখেছ অথচ দুশ্চিন্তা নেই এতটুকু—এ কেমন কথা?'

আধ ঘণ্টা পর চেয়ার ছেড়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে চিনতেই পারল না তৌফিক। কলপ, একটা তিল, একটা লাল জরুল, ঠোঁটের কাছে কাটা একটা দাগ—এগুলো সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে তার চেহারা।

আসছি বলে বেরিয়ে গিয়ে তিনমিনিট পর ফিরে এল মেয়েটা। হাতে ট্রে। তাতে পেটমোটা ভ্যাট সিক্সটি নাইনের বোতল আর দুটো গ্লাস। সাথে চিংড়ির কাটলেট।

'গলাটা ভিজিয়ে নাও,' বলল মেয়েটা। 'চাঙা হয়ে উঠবে।'

চেয়ারে বসল তৌফিক। 'আর সবাই কোথায়? কাউকে দেখছি না যে?'

'আর কেউ নেই,' বলল মেয়েটা। 'চব্বিশটা ঘণ্টা মাত্র সময়। আমি দেখতে চাই কয়েক মাস একটানা উপোষের পর ঠিক কতখানি উন্মত্ত আচরণ করে একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ কোন সুন্দরী রমণীকে হাতের নাগালে পেলে। কেউ নেই এ বাড়িতে—ভাগিয়ে দিয়েছি সবাইকে।'

পরিষ্কার বুঝল তৌফিক, মিথ্যে কথা বলছে।

'স্বীকার করছি, খুব উঁচু দরের লোক তুমি,' বলল মেয়েটা। 'ডাকাত আসলে নও, অন্য কোন কারণে ডাকাতি করেছ—তা না হলে এত অবজ্ঞা দেখায় কেউ?'

'অবজ্ঞা দেখাচ্ছি?'

'নামটাও তো জিজ্ঞেস করোনি,' গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল মেয়েটা।

'কথা যা বলার একা তুমিই তো বলছ,' বলল তৌফিক। 'নামটাও দয়া করে বলে ফেলতে পারতে। এ-কান দিয়ে শুনতাম, ও-কান দিয়ে বের করে দিতাম।'

'নাও,' গ্লাস তুলে বাড়িয়ে দিল মেয়েটা তৌফিকের দিকে।

গ্লাসটা নিল তৌফিক। দু'জন যার যার নিজের গ্লাসে চুমুক দিল একই সাথে।

'আটচল্লিশ লাখ টাকা, বাপরে বাপ! কি করবে অত টাকা দিয়ে?'

চুপ করে রইল তৌফিক।

'আমাকে সাথে নেবে?' জানতে চাইল মেয়েটা। 'ঠকবে না, কথা দিচ্ছি।' পরের কথাগুলো বিলম্বিত সুরে উচ্চারণ করল। 'তো-মা-কে আ-মি আ-ন-ন্দ দে-ব! যেভাবে চাও তুমি!'

'কোথায় যাব তাই তো জানি না,' বলল তৌফিক।

'কি দরকার জানবার? বাংলাদেশের বাইরে, যেখানে তোমার কোন ভয় নেই, সেখানে পাঠানো হবে তোমাকে। তুমি চাইলে তোমার সাথে আমিও থাকতে পারি।' তৌফিকের গ্লাসটা তুলে নিল মেয়েটা। 'আমার নাম সায়রা।' তৌফিকের ঠোঁটের কাছে তুলল সে গ্লাসটা। 'দেখবে একটা চুমুক দিয়ে, কেমন লাগে?' ঝঙ্কার তুলে হঠাৎ হেসে উঠল খিলখিল করে। 'আরে! খেয়াল করিনি তো একটা ব্যাপার। এমন ফ্রীলি কথা বলছি, তুমি আবার ভয়-টয় পাচ্ছ না তো? অনেক পুরুষই কিন্তু ভয় পায় আমাকে!'

তৌফিক মুচকি হাসল। 'একটু ভয় ভয় লাগছে বৈকি। উদ্দেশ্যটা যখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি।' গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু দু'ঢোকে নিঃশেষ করল সে।

'ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি, তোমার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল কতটুকু তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না,' বলল সায়রা। 'তুমি হিরো, এটুকু জানি। আটচল্লিশ লাখ একা এর আগে বাংলাদেশে কেউ লুট করেনি। এটা একটা রেকর্ড। তার ওপর, কী একখানা লেডিকিলার চেহারা—মাশাল্লা!' নিজের বুকের দিকে তাকাল সায়রা। শার্টের উপরের দুটো বোতাম খোলা। 'লুকিয়ে দেখবার দরকার নেই, সময় মত হাতে পাবে।'

'কি?'

'সুযোগ,' বলল সায়রা চোখের মণি নাচিয়ে। 'তোমার সাথে বাঁচতে চাই, তোমার সাথে মরতে চাই—জানি, উদ্ভট শোনাচ্ছে, কত কি ভাবছ তুমি। কিন্তু, কৌতূহলটা জেনুইন। তোমাকে আমি অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা চিরে চিরে দেখতে চাই। তুমি মানুষটা কেমন, কি ভাব না ভাব, মেয়েদেরকে কতটুকু আনন্দ দিতে পারো, তোমার হবি কি, কি ধরনের জীবন ভালবাস—সব, সব আমি জানতে চাই।'

'এখনও জানতে কিছু বাকি আছে তোমাদের?'

'অর্গানাইজেশনের জানার সাথে আমার জানার কোন সম্পর্ক নেই,' বলল

সায়রা। 'তোমার মুভমেন্ট সম্পর্কে ওরা ইনফরমেশন কালেক্ট করতে চায়। আমি চাই তোমার মনের খবর জানতে। তৌফিক, এ পর্যন্ত কয়জন মেয়ে এসেছে তোমার জীবনে, বলতে পারবে?' তৌফিকের গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে সায়রা। পুরোটা গ্লাস ভরে দিল সে।

মাথা নাড়ল তৌফিক।

'আমিও ধরে নিয়েছি বলতে পারবে না। কত এসেছে, কত গেছে—সবার কথা কি মনে থাকে! কিন্তু, কি জানো, চব্বিশ ঘণ্টা পর আমাকে তুমি ভুলতে পারবে না। আমাকে তোমার মনে রাখতে হবে।' রহস্যময় হাসিতে বেঁকে গেল ঠোঁট।

ঢোক গিলল তৌফিক, মদে কিছু মেশানো ছিল না কি? হাসতে ইচ্ছে করছে তার। কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

টেবিলের উপরে রাখা সায়রার হাতটার ডান হাত দিয়ে চেপে ধরল তৌফিক। 'কেউ যখন নেই, এখনই নয় কেন? এসো, তোমাকে স্মৃতির মণিকোঠায় গেঁথে নেয়া যাক।'

'দু'ঢোক পেটে পড়তে না পড়তে এই অবস্থা?' বাঁ হাত দিয়ে রানার হাতটা চেপে ধরল সায়রা। 'শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, এখন বিশ্রাম দরকার তোমার। বোতলটা দু'জন মিলে শেষ করি এসো, তারপর তোমাকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব। ঘুম থেকে উঠে দেখবে কেমন তাজা ঘোড়ার মত লাগবে নিজেকে।'

উঠে দাঁড়াল তৌফিক। সশব্দে পড়ে গেল চেয়ারটা। মাথা ঘুরছে, টেবিল ধরে তাল সামলাতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল টেবিলের উপরই। বোতল গ্লাস মেঝেতে পড়ে ভাঙল ঝনঝন শব্দে।

ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে পাশে চলে এসেছে সায়রা। দু'হাত দিয়ে টেবিলের উপর থেকে তুলে দাঁড় করাল সে তৌফিককে। শরীরের সাথে লেপ্টে ধরে বিছানার দিকে নিয়ে চলল তাকে। 'সব পুরুষই দেখছি একরকম! এত অধৈর্য কেন?' বিছানায় শুইয়ে দিল সায়রা তৌফিককে। 'উঠো না, এক্ষুণি আসছি আমি!'

ছাড়ল না তৌফিক সায়রার হাত। 'না।' সজোরে টান মারল সে, হুড়মুড় করে পড়ল সায়রা তার বুকের উপর। 'তোমাকে আমি···'

'ছাড়ো!' হাসতে হাসতে বলল সায়রা। 'কাপড় পাল্টে আসি।'

'কাপড় লাগবে না।' তৌফিক তার শার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই পিছলে বেরিয়ে গেল সায়রা। দরজার দিকে দ্রুত এগোল সে। 'আসছি।'

বিছানায় উঠে বসতে যাচ্ছিল তৌফিক, কিন্তু পুরোপুরি উঠে বসতে পারল না, পড়ে গেল ধপ্ করে।

মিনিট পাঁচেক পরই ফিরে এল সায়রা অন্য এক রূপে। প্যাণ্ট শার্টের বদলে প্রিন্টেড শিফন পরেছে। হাতে ট্রে। তাতে নতুন বোতল আর গ্লাস।

খাটের পাঁচিল ঘেঁষে কয়েকটা বালিশ রাখল সায়রা। তৌফিককে দু'হাত দিয়ে ধরে বসাল। 'হেলান দিয়ে আরাম করে বসো! কি জানো, মদ না খেলে প্রেম জাগে না আমার মধ্যে। তুমি আর খেয়ো না, কিন্তু আমার খেতে হবে।'

মাথা নাড়ল তৌফিক। 'না! আমিও খাব।'

একটা গ্লাসে ভ্যাট সিক্সটি নাইন ঢালল সায়রা। সেটা তার হাত থেকে কেড়ে

নিল তৌফিক। 'এরপর আরও খাব।'

মাথা নিচু করে নিজের গ্লাসটা ভরতে শুরু করল সায়রা।

'না আর নয়, এই শেষ।' বলে তৌফিকের দিকে তাকাল। দেখল তৌফিকের হাতের গ্লাসটা খালি হয়ে গেছে। সেটা এক হাত দিয়ে নিয়ে নিজের গ্লাসটা ধরিয়ে দিল তৌফিকেরই হাতে। 'বাকিটুকু আমি খাব।'

'সিগারেট ধরিয়ে দাও একটা।'

মেঝে থেকে প্যাকেট আর লাইটার তুলে নিয়ে এল সায়রা। একটা সিগারেট ধরাল সে। দু'টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল হুস্-স্ করে। তারপর তৌফিকের ঠোঁটে গুঁজে দিল সেটা।

'বলো, সায়রা, তোমার জীবন বৃত্তান্ত শোনাও আমাকে।'

'সেরেছে!' হেসে উঠে বলল সায়রা। 'এমন তো কথা ছিল না!'

'বেশ।' বলল তৌফিক। 'বলো, কি জানতে চাও তুমি আমার সম্পর্কে?'

'নির্দিষ্ট কোন প্রশ্ন নেই আমার,' বলল সায়রা। 'তোমার সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই। তুমি কে, কেন ডাকাতি করলে, কাদের সাথে ওঠা বসা করো, কাকে বিয়ে করবে…এই সব। কিংবা যা খুশি।'

'আমি তৌফিক আজিজ।' সায়রা খোলা দরজার দিকে তাকাতেই গ্লাসের পানীয়টুকু বালিশ এবং খাটের পাঁচিলের সংযোগস্থলে ঢেলে দিল তৌফিক। খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখল সে ট্রের উপর।

'বসো, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি,' বিছানা থেকে নামল সায়রা।

ফিরে এসে বসল মুখোমুখি। 'ওটাই কি তোমার আসল পরিচয়? সত্যি তুমি সেই কুখ্যাত রাজাকার-আলবদর তৌফিক আজিজ?'

'সত্যি নয় এ সন্দেহ হলো কেন তোমার?' ঢুলু ঢুলু চোখে দেখছে তৌফিক সায়রাকে, বেসামাল মাতালের মত ঢুলছে।

'সন্দেহ নয়, জানি।' বলল সায়রা। 'ওটা তোমার আসল পরিচয় নয়।'

'আসল পরিচয় তাহলে কোন্‌টা?'

'তৌফিক, প্লীজ, যদি কিছু বলতেই চাও, সত্যি কথাটা বলো।'

তৌফিক বলল। 'আমার পরিচয় যা তাই বলছি। বিশ্বাস না করলে আমার বলবার কিছু নেই। তবে তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে অন্য পরিচয় দিতে পারি। ধরো, আমার নাম হেকমত মৃধা।'

হেসে উঠল সায়রা খিলখিল করে। 'ছিহ্! কী জঘন্য নাম!'

'সোহেল?'

সায়রা চিন্তা করল এক সেকেণ্ড। 'নামটা ভাল, তবে আগে পরে কিছু থাকলে ভাল শোনায়। সোহেল চৌধুরী বা আহমেদ সোহেল, কিংবা সোহেল রানা।'

তৌফিক দু'হাত বাড়াল, আহ্বানের ভঙ্গিতে। 'এসো।'

'বিশ্রাম দরকার তোমার।' সায়রা সরে গিয়ে নেমে পড়ল খাট থেকে। দাঁড়াল তৌফিকের পিছনে গিয়ে, ধরল দুটো কাঁধ। 'পিছিয়ে গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ো। মাথার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছি আমি।'

'খবর শুনবে না?'

'বলতে চাও না, এটুকু বুঝতে পেরেছি।'

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল তৌফিক। 'পাশে এসে বসো, সায়রা, তোমার মুখ দেখতে না পেলে শান্তি পাচ্ছি না।'

'আমি শান্তি পাচ্ছি না কৌতূহল মিটছে না বলে,' বলল সায়রা। 'প্রস্তাবটা কি তুমি আঁচ করতে পারোনি?'

'প্রস্তাব? কি প্রস্তাব?'

'যা চাও, যেভাবে চাও পাবে আমার কাছ থেকে, তার বদলে সত্যিকার পরিচয় দেবে নিজের। নকল মানুষের সাথে আমি প্রেম করি না।'

'আমি তৌফিক আজিজ,' বলল তৌফিক। 'এটা যদি বিশ্বাস না করো, বাকিটা বলি কিভাবে?'

'যা সত্যি নয় তা বিশ্বাস করব কিভাবে?' বলল সায়রা। 'এ তর্কের মীমাংসা নেই। থাক, জানতে চাই না কিছু।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'ভেবেছিলাম অমর করে তুলব আজকের রাতটা। হলো না। তুমি ঘুমাও।'

বেরিয়ে গেল সায়রা, কিন্তু ঘুম এল না তৌফিকের চোখে। সিলিঙের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে চোখ দুটো। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে সে।

নিজের হাতে পরিবেশন করে যত্নের সঙ্গে খাওয়াল সায়রা তৌফিককে।

বাড়িটা সত্যি খালি কিনা বোঝার কোন উপায় নেই। রাত এগারোটার মত বাজে, অথচ এখন পর্যন্ত সায়রা ছাড়া আর কারও সাড়া শব্দ পায়নি তৌফিক।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় উঠে বসল সায়রা। 'রাতটা না ঘুমুলেও চলবে। এসো গল্প করি।'

'না ঘুমুলেও চলবে মানে?'

'ঘুমুবার অনেক সময় তুমিও পাবে, আমিও পাব,' বলল সায়রা। 'কিন্তু গল্প করার সুযোগ হয়তো এ জীবনে আর আসবে না।'

'বেশ তো, এসো গল্প করা যাক।'

'পরিচয় পর্ব দিয়েই তো গল্পের শুরু হয়, তাই না? নায়ক-নায়িকার পরিচয় হয়, তাদের মধ্যে প্রেম হয়, তারা ঘনিষ্ঠ হয়, আরও কাছে আসে, এক হয়ে মিশে যেতে চায় পরস্পরের সাথে। পরিচয় ছাড়াই কি এসব সম্ভব? বলো?'

'তার আগে তুমিই বলো কেন মিছেমিছি সন্দেহ করা হচ্ছে আমাকে। আমার পরিচয় জানো না তোমরা? জেনেও না জানার ভান করছ কেন? পরিষ্কার করে বলো দেখি কি চাও আসলে তোমরা?'

'আমরা জানতে চাই তোমার সত্য পরিচয়। অনর্থক রাতটা মাটি করছ তুমি, তৌফিক। আমার ওপর আদেশ রয়েছে, সত্য প্রকাশ না করলে তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারব না। বিশ্বাস করো, এখুনি তোমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে আমি খুশি হতাম। তুমি বঞ্চিত করছ নিজেকেও, আমাকেও।'

এইভাবে চলল গভীর রাত পর্যন্ত। জোর করে হুইস্কির বোতলটা শেষ করল সায়রা। নিজে যতটা না খেলো, তার চেয়ে বেশি খাওয়াল তৌফিককে, কিন্তু মাতলামির বেলায় নিজেই সীমা ছাড়িয়ে গেল। এক পর্যায়ে গরমের ছুতোয় জামা-

কাপড় খুলে প্রায়-উলঙ্গ হলো সে তৌফিকের সামনে। চকচকে চোখে চাইল তৌফিকের চোখের দিকে, ওকে নির্বিকার দেখে নিরাশ হলো যার-পর-নাই। কোন প্রতিক্রিয়া নেই তৌফিকের মধ্যে, কিছুতেই প্রলুব্ধ হবে না বলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে যেন লোকটা।

শেষ পর্যন্ত আরও সরাসরি কথা বলা স্থির করল সে।

'সিসিলিতে ছিলে তুমি সত্যি কিনা?'

চমকে উঠল তৌফিক।

'চুপ করে আছ কেন?' বলল সায়রা। 'কেঁপে গেল তোমার চোখের পাতা, টের পেলাম।'

মৃদু হেসে তৌফিক বলল, 'ভূগোল পরীক্ষাকে সেই ছোটবেলা থেকেই আমার ভয়। সেইজন্য কেঁপে উঠেছে অন্তরাত্মা। কোথায় সিসিলি? ফ্রান্সের রাজধানী না?'

হাসল সায়রা। 'হার মানছি। যে-কোন কারণেই হোক, সত্যি কথা বলতে তুমি রাজি নও। আচ্ছা বলো তো, আমাদেরকে এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমরা বাঘ, না ভালুক? তোমাকে নিশ্চয়ই জানানো হয়েছে পার্টির কোন ক্ষতি করে না ফোরটিন ক্যারেট। আর কেউ আমাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করলে সহ্যও করে না।'

এইভাবে জেরা চলল সারারাত। অনুনয়, বিনয়, প্রলোভন, কৌশল—কিছুতেই যখন কোন কাজ হলো না, ভোর ছ'টায় বেরিয়ে গেল সায়রা ঘর থেকে। চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে গ্রীবা বাঁকিয়ে চাইল তৌফিকের দিকে। 'সব কথা বলবার চমৎকার একটা সুযোগ পেয়েছিলে তুমি, সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার তুমি করলে না। তুমি টাফ লোক স্বীকার করছি, কিন্তু এজন্যে দুঃখ করতে হবে তোমাকে।'

'তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'মিথ্যে কথা!' বলল সায়রা শান্ত কণ্ঠে, খানিকটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। 'বুঝতে তুমি সবই পারছ। টের পাচ্ছ, কপালে তোমার খারাবী আছে।'

'কি রকম?'

'এরপর যে প্রশ্ন করবে, বিনিময়ে কিছুই দেবে না সে তোমাকে।'

'অর্থাৎ?'

'আমার কাছ থেকে বিনিময়ে কিছু পেতে। কিন্তু একজন পুরুষের কাছে কিছুই পাবে না তুমি। ভুল হলো, পাবে, তবে সেটা সহ্য করা কঠিন হবে।'

'টর্চারের ভয় দেখাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে?'

চেয়ে রইল সায়রা। অনেকক্ষণ পর বলল। 'না, ভয় আমি দেখাচ্ছি না। যা ঘটবেই তার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করছি মাত্র। তৌফিক, এখনও সময় আছে।'

'তোমার ইঙ্গিতটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেও আমার নতুন কিছু বলবার নেই।'

'ভেবে দেখো আর একবার,' বলল সায়রা। 'এখন আমি যাচ্ছি। ফিরে আসব কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ঠিক বারোটার সময় ফিরে এল সায়রা। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত পায়চারি করছিল তৌফিক। দরজা খুলে কখন যে পিছনে চলে এসেছে সায়রা টেরই পায়নি ও।

'কি সিদ্ধান্ত নিলে তৌফিক?'

চমকে উঠল তৌফিক, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে চাইল।

'সিদ্ধান্ত নিইনি,' বলল সে। 'সিদ্ধান্ত নেবার কিছু নেই। আমি তৌফিক আজিজ, এটাই আমার আসল পরিচয়।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

পিছন থেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সায়রা তৌফিককে। আহ্লাদী গলায় বলল, 'আমি চাই না তুমি অযথা খুন হয়ে যাও। বিশ্বাস করো, তোমাকে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে শেষ…'

'টাকা আদায় না করেই?'

'টাকার চেয়ে 14-K-র কাছে নিরাপত্তাটা অনেক বড়,' বলল সায়রা। 'তুমি একটা হুমকি। 14-K-এর জন্যে।' শেষের কথাগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করল সায়রা।

শ্রাগ করল তৌফিক। 'প্রলাপ বকছ মনে হচ্ছে। শোনো সায়রা, তোমার যারা বস্ তাদেরকে সামনে আসতে বলো। তারা আমাকে ভেবেছে কি? তোমার মত একটা বোকা মেয়ের হাতে আমাকে ছেড়ে দিয়ে কি আদায় করতে চাইছে? কথা ছিল…'

'কথা ছিল কি 14-K-র জন্যে তুমি হুমকি হয়ে দেখা দেবে?'

'তার মানে?'

'তার মানে, আমরা সন্দেহ করছি 14-K-র শত্রু তুমি।'

'পাগল!' বলল তৌফিক। 'তোমার সাথে কথা বলতে চাই না আমি। ডাকো তোমার ওপরওয়ালাদের।'

ছেড়ে দিল সায়রা তৌফিককে। বলল, 'তাদের কাছে নিয়ে যাবে বলেই এসেছে এরা।'

তৌফিকের দুটো বাহু ধরল লোহার মত শক্ত দুটো হাত। প্রথমে ডান পাশে, তারপর বাঁ পাশে তাকাল তৌফিক। কুৎসিত চেহারার দু'জন দশাসই লোক দু'পাশে চলে এসেছে তার, ধরেছে শক্ত করে। ডান পাশে দেখা গেল সায়রাকে। হাতে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। এগিয়ে এল সে। তৌফিক দেখল সিরিঞ্জের নিডল ঢুকে যাচ্ছে তার মাংসের ভিতর।

নিঃশব্দে হাসছে মেয়েটা। সাদা চকচকে দাঁত দু'পাটি ক্রমশ এলোমেলো, ঝাপসা হয়ে আসছে তৌফিকের চোখে। দুলছে সবকিছু, সে নিজেও টলছে—সেই অভিজ্ঞতা, এর আগেও কতবার এই অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছে সে। অন্ধকার হয়ে গেল সব।

কয়েকমাস একটানা নিবিড় ঘুম দিয়ে জেগে উঠল যেন সে—চোখ মেলার পর এই

অনুভূতি হলো তৌফিকের। ডিসটেম্পার করা দেয়াল, চিনতে পারল না। কোথায় সে?

মনে পড়ল সব একে একে। তৌফিক আজিজ তার নাম। জেল হয়েছিল তার। 14-K, নতুন এক ধরনের ক্রাইম স্পেশালিস্ট, তাকে জেল থেকে বের করে আনে। নিকোলাস। কোথায় সে? এদিক ওদিক তাকাল তৌফিক।

'L' অক্ষরের মত একটা রুম। খাট, চেয়ার, সোফা, টেবিল, আলমারি, ওয়ারড্রোব, ছোট্ট একটা ফ্রিজ। নিকোলাস নেই। ধড়মড় করে উঠে বসল তৌফিক।

মাথাটা ভারি হয়ে আছে। মুখোমুখি একটা দরজা খোলা। ভিতরে দেখা যাচ্ছে কলের পাইপ। বাথরুম। পিছন দিকে তাকাল সে। আরও একটা দরজা। বন্ধ। ভুরু কুঁচকে উঠল দরজার গায়ে বুক-সমান উঁচুতে চৌকোণ ছোট্ট একটা কাঁচ দেখে।

মেঝেতে নেমে দাঁড়াল। পড়ে যাচ্ছিল সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর মত। খাটের স্ট্যাণ্ড ধরে সামলে নিল কোনমতে। শরীরে শক্তি নেই কেন? কতদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল ওরা তাকে?

বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে চিনতে পারল না তৌফিক।

মাথার চুল লালচে। কিন্তু দাড়ি ঘন কালো। দু'দিন কামানো হয়নি বড়জোর। ওরা কি দাড়ি কামিয়ে দিয়েছে তার ঘুমের মধ্যে? অসম্ভব নয়।

জানালার দিকে চোখ পড়তে পরিষ্কার হয়ে গেল একটা ব্যাপার। বন্দী সে এদের হাতে। মাঝখানে কাঁচের শার্সি, দু'দিকে লোহার রড। নিচে দেখা যাচ্ছে বড়সড় উঠান, ফাঁকা। চারদিকে গাছপালা।

মুখ হাত ধুয়ে দেয়াল ধরে ধরে ফিরে এল সে বিছানার কাছে। অন্যান্য জানালাগুলোও ওই একই রকম। দরজাটা বন্ধ বাইরে থেকে। রুমের অপর অংশটা দেখার জন্যে পা বাড়াল সে।

নিকোলাসকে শুয়ে থাকতে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল তৌফিক। ডাকল ওকে, কিন্তু সাড়া নেই দেখে গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা মারল। একই অবস্থা। নিশ্চয়ই ওষুধের ক্রিয়া চলছে ওর মধ্যে এখনও।

নিজের বিছানায় ফিরে এসে বসতেই খবরের কাগজটা চোখে পড়ল। চেয়ার থেকে তুলে নিল সেটা। কেউ অপেক্ষা করছিল তার ঘুম ভাঙার জন্যে, কাগজটা ভুলে ফেলে গেছে।

জেল ভেঙে পালাবার খবরটা হেডিং হয়েছে। চেরী-পিকার্সের ছবি ছাপা হয়েছে তিন কলাম জুড়ে। খুঁটিয়ে পড়ল সে খবরটা। সরকার দায়ী লোকদের কঠোর শাস্তি দেবার হুমকি দিয়েছেন। জোয়ারদার এখন হাসপাতালে, বাঁচবে, তবে আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। খবরের প্রায় সবটুকু জুড়ে রয়েছে নিকোলাস। মাস্টার স্পাই নিকোলাসের তুলনায় একজন কুখ্যাত আলবদর ও ডাকাত তৌফিক আজিজ যে কতটা নগণ্য, উপলব্ধি করল সে পরিষ্কার। সামান্য দু'চার লাইনে সারা হয়েছে ওর কথা। নিকোলাসের খবরটাই আসল খবর।

কাগজটা যথাস্থানে রাখতেই দরজা খুলে গেল। সাদা কোট পরা একজন

লোক ট্রলি ঠেলে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। কয়েকটা ডিশের উপর সিলভারের চকচকে ঢাকনি দেখল সে। সাদা কোটের পিছন পিছন ঢুকল আর এক লোক। মাথায় চুল কম। মুখটা গোল আলুর মত, গায়ের রঙটাও ওই আলুরই মত। কাপড়-চোপড়ে ফিটফাট।

'ভাল, ভাল,' বলল সে তৌফিককে। 'হালকা কিছু নাস্তা করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

লোকটাকে একবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল তৌফিক। উত্তরে বলল না কিছু। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না কি ভাবছে সে, কি তার অনুভূতি।

ট্রলি থেকে ডিশ এবং পট নামিয়ে টেবিল সাজিয়ে দিয়ে সাদা কোট চলে গেল।

'চা খেতে যদি থাকি, কিছু মনে করবেন নাকি?'

'না-না,' মন্থর কণ্ঠে বলল তৌফিক। 'আমার অতিথি যখন আপনি।'

মুখোমুখি বসল লোকটা, 'দেরাজে দুটো বোতল আছে হুইস্কির। আপনার কাপড়-চোপড় আছে ওয়ারড্রোবে।'

নিঃশব্দে উঠে ওয়ারড্রোবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তৌফিক। কাপড় চোপড়ের পকেটগুলো হাতড়ে ফিরে এল সে, 'পাসপোর্ট ইত্যাদি নেই কেন?'

নির্বিকার কণ্ঠে বলল লোকটা, 'ডকুমেন্টগুলো আপনাকে দেখতে দেয়া হয়েছিল, একটা এস্কেপকে নিখুঁত এবং নিরাপদ করে তোলার জন্যে আমরা কত কিছু করে থাকি তা দেখাবার জন্যে। এখুনি সেগুলো দরকার নেই আপনার। আপনার জার্নির পরবর্তী পর্যায়ে ফেরৎ দেয়া হবে সব। সিকিউরিটি—দ্যাটস্ দ্য ওয়াচ-ওয়ার্ড হিয়ার।'

'কোথায় রয়েছি আমি?' সঠিক উত্তর পাবে না জেনেও প্রশ্ন করল তৌফিক।

হাসল না লোকটা। বলল, 'আমি নিজেই জানি না। তবে এটা পৃথিবী, অফ দ্যাট আই হ্যাভ নো ডাউট! ভাল কথা, কি সিগারেট খান আপনি?'

'পাঁচশো পঞ্চান্ন।'

'হুঁ,' লোকটা বলল। 'যোগাড় করা যাবে। কি জানেন, আমার ওপর নির্দেশ আছে যেন আপনাদের সবরকম আরাম আয়েশের দিকে নজর রাখা হয়। আপনি যখন মোটা টাকা দিচ্ছেন, খরচ করতে অসুবিধে নেই। দশ লাখ পাচ্ছি আমরা, ঠিক তো?'

তৌফিক হাসল, 'উদ্দেশ্যটা কি? মেজাজ গরম করাতে পাঠিয়েছে নাকি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবেন তো?'

'ছি-ছি,' লোকটা স্বাভাবিকভাবে বলল, 'তা কেন! ভুলেই গিয়েছিলাম, দশ লাখ নয়, পাঁচ লাখ।'

'না, ভুলে যাননি। টোকা মেরে দেখছিলেন। সে যাক, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে আপনার।' তৌফিক লোকটার রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। 'ক'টা বাজে?'

চায়ের কাপ ধরতে গিয়ে হাতটা ফিরিয়ে নিল লোকটা, ঘড়ি দেখল, 'এগারোটা।'

'বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম?'

তৌফিকের চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল লোকটা। খানিকপর বলল, 'কি

বললেন?'

'কি বার? ক' তারিখ? কোন্ মাস?'

'জানি না।' চায়ের কাপ তুলে নিয়ে অন্য দিকে তাকাল লোকটা।

'এখানে কতদিন আছি? কতদিন থাকতে হবে?'

'জানি না। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত থাকতে হবে।' লোকটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে কাপটা টেবিলে রাখল ঠকাস করে। 'মি. তৌফিক, এসব ব্যাপারে অকারণে মাথা ঘামাচ্ছেন। আপনি টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তার বদলে আপনার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এর মধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। আপনি আপনার কথা ঠিক রাখলে আমরাও আমাদের কথা ঠিক রাখব। আমাদের এই 14-K-র গুড-উইল সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে, আপনার তা জানা উচিত। ফাঁকি আমরা দিইনি আজ পর্যন্ত কাউকে, কারও ফাঁকিতে পড়িওনি।'

হুমকিটা সুপ্ত হলেও, অনুভব করতে পারল তৌফিক।

'ঠিক আছে, Zuricher Ausffuhren Handelsbank-এর একটা চেক ফর্ম আনিয়ে দিন।'

গোল আলুর এই প্রথম হাসি হাসি মুখ দেখল তৌফিক, 'নাম্বার—অ্যাকাউন্ট নাম্বার বলুন?'

'চেক যখন লিখব, দেখতে পাবেন। সিকিউরিটি জ্ঞান আমারও আছে, বুঝতেই পারছেন।'

উঠল লোকটা। দরজার পাশে একটা বোতাম দেখিয়ে বলল, 'কোন কিছুর দরকার হলে এই বোতামটা এই ভাবে চেপে ধরবেন।' আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল বোতামটা। 'সঙ্গে সঙ্গে লোক এসে যাবে।' আশায় আশায় তাকিয়ে রইল দরজার দিকে।

দু'মিনিট পর এল সাদা কোট।

'রুস্তম আপনাদের সুবিধে অসুবিধে দেখবে,' গোল আলু বলল। 'মি. নিকোলাস আরও কিছুক্ষণ ঘুমাবেন, তা ঘুমান। আপনার চেয়ে দুর্বল কিনা, তাই দেরি হচ্ছে জাগতে। আপাতত যাই, কেমন? চলো রুস্তম।' বেরিয়ে গেল দু'জন, বন্ধ হয়ে গেল ভারি দরজা, তালা লাগিয়ে দেয়া হলো বাইরে থেকে।

চিন্তা করতে গিয়েই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হলো তৌফিক: কোথায় রয়েছে সে? গোল আলুর আচরণ সন্দেহজনক। এটা কি বাংলাদেশ নয়?

রুস্তম লোকটা একবারও কথা বলেনি। বোবা সে?

কোল্ড হেডেড বেলায়েত হোসেন খান, বিড় বিড় করে বলল তৌফিক, আপনি জানেন না নতুন এই কয়েদখানা থেকেও পালাবার কথা ভাবছি আমি!

পাঁচ

গ্রীক শিপিং ম্যাগনেটদেরকে পাঁচ তারা মার্কা হোটেলগুলো যে খাতির যত্ন করে,

সেই খাতির যত্ন পাচ্ছে ওরা। রুম-অ্যারেস্ট করে রাখা হয়েছে, তাছাড়া আর কোন কিছুতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে না। তবে, রেডিও বা টিভি চেয়ে নিরাশ হলো ওরা।

নিকোলাস বলল, 'প্রোগ্রাম দেখে-শুনে বুঝে ফেলব কোথায় রাখা হয়েছে আমাদেরকে, তাই।'

তৌফিক অভিনয় করল বোকার মত, 'কিন্তু নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা দিচ্ছে যে?'

কয়েক দিনের কাগজ তুলে নিয়ে এল নিকোলাস, 'এটা আজকের। তারিখ? পাঁচ। গতকালকেরটা ছিল চার তারিখের। আগামীকালেরটা হবে ছয় তারিখের। কিন্তু তার মানে কি এই যে আজ পাঁচ তারিখই? আমরা হয়তো রয়েছি আন্দামান কিংবা থাইল্যাণ্ডে, সিঙ্গাপুর কিংবা বোর্নিওতে। হয়তো দৈনিকগুলো বাংলাদেশ থেকে এয়ারমেইল যোগে আসছে এখানে।'

'সিঙ্গাপুর? তুমি মনে করো এটা সিঙ্গাপুর?'

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল নিকোলাস। ঘ্রাণ নিল শব্দ করে। শিকারী কুকুর যেন, ভাবল তৌফিক।

'সিঙ্গাপুরের মত দেখাচ্ছে না, গন্ধটাও অন্য রকম।' এদিক ওদিক মাথা দোলাল নিকোলাস। 'নাহ্! বলতে পারছি না।'

'কিছু এসে যায় বলেও মনে হচ্ছে না তোমাকে দেখে?'

হাসল নিকোলাস, 'যায় না, ঠিক। আমি জানি, স্বদেশে ফিরছি আমি।'

তৌফিক বলল, 'হুঁ। দেশটা কোথায়, মানে, কোন্ দেশের সিটিজেন তুমি, নিশ্চয়ই বলবে না? চাইও না জানতে। একটা কথা বুঝেছি, তোমার দেশ তোমাকে গুরুত্ব দেয়।'

'কেন, এখন বলতে আপত্তি কিসের? আমি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাশিয়ার, জাপানের, পশ্চিম জার্মানীর এবং আমেরিকার। গুরুত্ব—তা দেয় বৈকি, দেবে না?'

'তা কোথায় ফিরছ? মা দেখছি একটা নয় একাধিক, পিতা?'

ব্যঙ্গ এবং অপমানটা গায়ে মাখল না নিকোলাস। বলল, 'চারটের যে-কোন একটায় যাচ্ছি; সন্দেহ নেই। একটাতে গেলেই হলো।'

'একজন প্রফেশন্যাল হিসেবে 14-K-র সম্পর্কে তোমার মতামত কি?'

'অত্যন্ত উপযুক্ত। এক্সট্রা-অর্ডিনারী।'

'কি মনে হয়, তোমার লাইনের লোক এরা?'

'বুঝতে পারছি না। তবে এ ধরনের একটা নেটওয়ার্ক চালানো সহজ নয়। কে জানে, আমার দেশগুলোর একটিই হয়তো এটা পরিচালনা করছে। সে যাক, আমার কথা কি ভাব তুমি?'

'কি ভাবব?'

'তোমার দেশের বিরুদ্ধে স্পায়িং করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম আমি।'

'আমার দেশ? বাংলাদেশ নয়, লিবিয়া আমার দেশ,' তৌফিক বলল।

'আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম!'

নিতান্তই পুংলিঙ্গদের পরিচালিত ব্যবস্থাপনা। রুস্তম চার পাঁচবার খাবার বা পানীয় নিয়ে আসে, সাথে থাকে একজন লোক। লোকটাকে দেখেনি ওরা কেউ,

তার উপস্থিতি শুধু টের পেয়েছে বারবার দরজার বাইরে, করিডরে। এই লোকই চব্বিশ ঘণ্টা দরজার কাছে পাহারায় থাকে। আর মাঝেমধ্যে আসে গোল আলু। কথা প্রায় বলেই না। নিজের নামটা পর্যন্ত জানাতে চায়নি সে।

হুইস্কির অঢেল সরবরাহ। একটি একটি করে সদ্ব্যবহার করছে তৌফিক বোতলগুলোর। গোল আলু টের পেয়ে গেছে তার আসক্তির কথা। সন্তোষের ছাপ তার মুখের চেহারায় বোতলের সরবরাহ বেড়ে গেল দেখে নিশ্চিত হলো তৌফিক: লোকটা চাইছে মদে ডুবে থাকুক সে।

সাত দিনের দিন গোল আলু বের করে নিয়ে গেল নিকোলাসকে। দুঘণ্টা পর ফিরল, তৌফিকের প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কথাবার্তা হলো।' ব্যাখ্যা করল না।

পরদিন এল চেক ফর্ম। নিচে নিয়ে গেল তাকে গোল আলু।

সাজানো ড্রয়িংরুম। জানালা-দরজায় পর্দা। টেবিলে ফর্মটা মেলে ধরে গোলালু বলল, 'অ্যাকাউন্ট নাম্বার?'

কলম তুলে নিয়ে ইতস্তত করতে লাগল তৌফিক। অভিনয়টা না করলে খটকা লাগতে পারে প্রতিপক্ষের। 'দেখো, গোল আলু,' এই ক'দিনের একঘেয়েমি তৌফিককে বিরক্ত এবং মরিয়া করে তুলেছে। কলমটা টেবিলে রেখে দিয়ে পিঠ সোজা করে বসল সে, 'আমার এই অ্যাকাউন্ট নিয়ে ষড়যন্ত্র করলে স্রেফ মারা পড়বে তুমি। ছয় লাখ টাকার চেক লিখছি, তার বেশি যেন এক পয়সাও না ওঠে। পাঁচ রেখে আমাকে দেবে বাকি এক। সেই এক যেন যে-দেশে থাকব সেই দেশের কারেন্সিতে হয়। মনে রেখো, অ্যাকাউন্ট নিয়ে কোন রকম গোলমাল করলে তোমাকে আমি খুঁজে বের করব।'

'অত সহজ নাও হতে পারে,' মুচকি হাসল গোল আলু।

তৌফিক বলল, 'সহজ হোক বা না হোক, পাব তোমাকে। আমার রেকর্ড তোমার জানা আছে।'

গোল আলু হাত নেড়ে বলল, 'দূর! আমরা তেমন লোক নাকি! কথা রাখার রেপুটেশন আছে না আমাদের?'

কলম তুলে নিয়ে তৌফিক টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল। ধীরে ধীরে মুখস্থ করা নাম্বারটা লিখল সে, সংখ্যা এবং অক্ষর দিয়ে। নাম্বারটা লেখার সময় রূপার মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। নাম্বারটা যাতে ঠিক মত মনে রাখে তার জন্যে কত রকম পরামর্শ দিয়েছিল মেয়েটা। কতটা দূরত্ব এখন দু'জনের মধ্যে!

গোল আলু চেকটা তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর বাতাসে দোলাতে দোলাতে বলল, 'আরও দশদিন অপেক্ষা, তারপর জানা যাবে।'

তিনদিন পর নিকোলাস আবার নিচে গেল। কিন্তু এবার সে আর ফিরে এল না।

গোল আলু হঠাৎ করে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে তৌফিকের উপর থেকে। কোনদিন আসে কোনদিন আসে না। একদিন তৌফিকের বিরক্তি প্রকাশের উত্তরে বলল, 'এত কেন নার্ভাস? অ্যাকাউন্টে কিছু নেই নাকি?'

'টাকা?' তৌফিক বলল। 'তোমাদের পাওনার চেয়ে কয়েকগুণ বেশিই

আছে।'

'তাই যেন থাকে···অন্তত ছয় লাখ যেন থাকে. তোমার ভালর জন্যেই বলছি কথাটা।'

আরও ছয়দিন পর ছেলা আলুর মত চকচকে মুখ নিয়ে এল সে. 'আপনি আমাকে বিস্মিত করেছেন. মি. তৌফিক।'

মুখ তুলে নিঃশব্দে তাকাল তৌফিক।

'টাকা উঠিয়েছি আমরা—ছয় লাখ।'

তৌফিক বলল, 'কখন যাচ্ছি আমি?'

'বসুন, মি. তৌফিক,' নিজে বসতে বসতে বলল গোলালু। 'আপনার সাথে কিছু কথা আছে।'

না বসে ওয়াল-কেবিনেটের দিকে এগোল তৌফিক। বোতল এবং গ্লাস নিয়ে ফিরে এল টেবিলের কাছে। ডান হাতের বোতল থেকে বাঁ হাতের গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলল, 'অসহ্য! এখানে আর একটি মুহূর্ত থাকতে চাই না আমি।'

সিগারেট ধরাল গোলালু। এই প্রথম। বলল, 'যাবেন বৈকি! শুধু একটি ব্যাপারে আলোচনা করার পর।'

'কি বলতে চাইছ?' বলল তৌফিক। হাতের গ্লাসটা মুখের কাছে তুলল, কিন্তু চুমুক দিল না।

'জানেন না, কি বলতে চাইছি?'

তৌফিক চেয়ে রইল দুচোখের দিকে, 'না।'

'অন্য কোন কারণে নয়, শুধু রেকর্ড রাখার খাতিরেই আমরা জানতে চাই, মি. তৌফিক,' গোলালুর চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু উঁচু হয়ে উঠল কয়েকবার। 'আসলে কে আপনি, কি আপনার সত্যিকার পরিচয়?'

সাথে সাথে দৈত্যের একটা হাত যেন তৌফিকের তলপেট খামচে ধরল। মুখের চেহারা অপরিবর্তিত রাখল অতি কষ্টে, বলল, 'পাগল হলে নাকি?'

'ভালই জানেন, তা নই।'

দীর্ঘশ্বাস নিয়ে তৌফিক বলল, 'অবশ্যই প্রলাপ বকছ, গোল আলু। নয়তো, টাকা হাতে পেয়ে বেইমানী করার কথা ভাবছ। উচিত হচ্ছে কি?'

'হুমকি দেবেন না, মি. তৌফিক। হুমকি দেবার পজিশনে নেই আপনি। আপনার নাম যাই হোক তৌফিক আজিজ আপনি নন। এর মধ্যে রহস্য আছে। ত্রিপোলী থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আনিয়েছি আমরা। মেলেনি আপনার সাথে।'

হো-হো করে হেসে উঠল তৌফিক। তার হাসি থামার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তারপর বলল, 'অভিনয় করে পার পাবেন না। কি ভেবেছেন আপনি আমাদের? সাধারণ? নো। নো, নো, মাই ফ্রেণ্ড। উই আর নট অর্ডিনারী। আপনার সম্পর্কে আমরা ত্রিপোলীতে যাবতীয় খবর নিয়েছি, ফেল করেছেন আপনি। প্রমাণ হয়ে গেছে আপনি আর যেই হোন, তৌফিক আজিজ নন। কারণ, আপনি জানেন, তৌফিক আজিজ আজ ছয়মাস আগে মারা গেছে।' গোল আলু রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছার সময় আপাদমস্তক দেখল তৌফিকের। 'আমরা দুটো প্রশ্নের উত্তর চাই। এক, কে আপনি? দুই, কেন আপনি আমাদের দলের

সাথে নিজেকে জড়িয়েছেন? কেন, কেন?'

তৌফিক মুখে হাসি ধরে রেখে বলল, 'উত্তর দুটো তোমরাই খুঁজে বের করো। কারণ, উত্তর আমার জানা নেই। আমি জানি, আমি তৌফিক আজিজ।'

'যাচ্ছি,' গোল আলু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'আগামীকাল সকালে আসব।' বোতামে চাপ দিল সে তৌফিকের দিকে চোখ রেখে। 'সত্য ঘটনা শুনব এসে। যাবার আগে শুধু একটা কথা বলে যাই, আপনার পরিচয় না জানলেও নামটা আমরা ঠিকই বের করে ফেলেছি। আপনার নাম তৌফিক আজিজ নয়—আপনি মাসুদ রানা।'

বেরিয়ে গেল লোকটা। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

আমি তৌফিক আজিজ নই একথা জানা হয়ে গেছে ওদের! আরও কি এবং কতটুকু জেনেছে ওরা?

অস্থির পায়ে পায়চারি শুরু করল রানা খাঁচায় বন্দী বাঘের মত।

ছয়

সিসিলিতে ছিল রানা। পালার্মো বিমান বন্দরের কাছাকাছি হোটেল অ্যাপোলোতে নাচ, হুইস্কি, মেয়ে, রেস আর ঘুম নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছিল, একদিন সকালবেলা ক্রিং ক্রিং ফোনের বেল শুনে রিসিভার কানে ঠেকাতেই গায়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা লাগল।

'ঢাকা থেকে বলছি। মেজর জেনারেল রাহাত খানের সাথে কথা বলুন।' সোহানার কণ্ঠস্বর, অথচ কেমন আছ, কি করছ, কবে ফিরছ—কোন সৌজন্যসূচক প্রশ্ন নয়, শুধু কানেকশন দিয়েই কেটে পড়ল। কারণ অনুধাবন করতে এক সেকেণ্ডও দেরি হলো না রানার। সোহানা থামতেই ভারি ধমকের আওয়াজ।

'রানা?'

'ইয়েস, স্যার।' সতর্ক এবং উৎফুল্ল ভাবটা প্রচুর পরিমাণে কণ্ঠে ঢালতে কার্পণ্য করল না ও। গা জ্বালা করছে এদিকে। কারণ, জানে ও, ছুটি বাতিল করার জন্যে ফোন করা হয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তে খটকা লাগল। মেজর জেনারেল স্বয়ং কেন ফোন করছেন?

'তোমার ছুটি আরও দু'মাস বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ত্রিপোলীতে চলে যাও কালকের ফ্লাইটেই। হোটেল অ্যামব্যাসাডরে উঠবে।'

অমরত্ব লাভ করেছ তুমি—একথা শুনলেও রানা এতটা আশ্চর্য হত কিনা সন্দেহ। বলল, 'কি বললেন, স্যার? দু'মাসের ছুটি···কার?'

'আহ্! কথা শেষ করতে দাও,' ধমক। 'কায়রো থেকে আমাদের এজেন্ট ক্যায়সার তোমার কাছে যাচ্ছে আগামী রবিবারে। আমার চিঠি পাবে ওর কাছ থেকে। চিঠিতেই সব জানতে পারবে।'

'স্যার!'

'শরীর ভাল তোমার?'
'জ্বী, স্যার।'
'তোমার সাফল্য কামনা করি।' ব্যস, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।
তার মানে? মাই গড! রানা দীর্ঘ দুই পদক্ষেপে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজের দিকে তাকিয়ে রইল ক'সেকেণ্ড। বলল, 'তার মানে···ওহ্ গড! ফের অ্যাসাইনমেন্ট!'

মাঝখানে মেডিটারেনিয়ান পেরুলেই ত্রিপোলী।
অ্যাসাইনমেন্ট, হ্যাঁ। কিন্তু এ কি ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট? এটা তো ফাঁদ, যে ফাঁদে পা দিতে হবে জেনে শুনে, কিন্তু ফাঁদ থেকে বেরুবার জন্যে চেষ্টা করা চলবে না। চিঠিটা তৃতীয়বার পড়ল রানা। যা হয়, বারবার পড়ার ফলে আরও পরিষ্কার হলো মেজর জেনারেলের বক্তব্য। আরও বিপদ দেখতে পেল রানা ফাঁদের ভিতর। হোটেল অ্যামব্যাসাডরে গাঁথা পেরেকের মত পাঁচটা দিন আটকে রইল রানা। তারপর ঢাকা থেকে এলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটির চীফ মি. বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ। ভারিক্কি চেহারা। ক্লিনশেভড। ছাদের মধ্যিখানে মসৃণ টাক। ধূসর রঙের কমপ্লিট স্যুট, সাদা রুমালের কোণা উঁকি মারছে ব্রেস্ট পকেট থেকে। হাতে ব্রীফকেস, মুখে টোবাকো পাইপ।
ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে রানা বুঝল, এই আপাত সহজ সরল সাধারণ মানুষটির ভিতর রয়েছে জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।
হালকা ভঙ্গিতে ছোট্ট একটা ভূমিকা করলেন তিনি।
বললেন, 'আপনি স্যারের সুযোগ্য সহকারী এটুকুই শুধু জানি, ব্যস, আর কিছু জানিও না, জানবার দরকারও নেই। স্যার যখন আপনাকে নির্বাচন করেছেন, আমার আর কোন দুশ্চিন্তা নেই।' পাইপে ঘনঘন টান দিলেন। 'কি জানেন, প্রথম যখন স্যারের সাহায্য চাই, এমন কটমট করে ঝাড়া বিশ সেকেণ্ড তাকিয়ে ছিলেন, ভাবলাম এই বুঝি এগিয়ে এসে কান চেপে ধরে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন।'
নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা করে হাসতে লাগলেন বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ।
'মেজর জেনারেলের শিষ্য ছিলেন বুঝি?' মৃদু হেসে জানতে চাইল রানা।
'কে তাঁর শিষ্য নয় তাই বলুন?' বেলায়েত হোসেন বললেন। 'এই জেনারেশনটাই কি তাঁর ছাত্র নয়? সে যাক, তাঁর কটমটে দৃষ্টির সামনে থেকে কিভাবে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে আসব ভাবছিলাম, হঠাৎ বললেন, শোনাও তোমার প্রস্তাব। প্রস্তাবটা দিলাম।'
'কি বললেন মেজর জেনারেল?'
'একগাল হেসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, চমৎকার বুদ্ধি বের করেছ তো হে, বেলায়েত! প্রশংসা শুনে গলে গেলাম, ইচ্ছা হলো স্যারের পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করি, কিন্তু ধমক খাবার ভয়ে সেটা মনে মনে সারলাম, হাত বাড়াতে সাহস পেলাম না। যাই হোক, স্যার সাহায্য করতে রাজি হলেন শুধু

একটি মাত্র কারণে। কারণটা হলো নিকোলাস।'

কফি আসতে নড়েচড়ে বসলেন সিকিউরিটি চীফ। পাউচ বের করে পাইপে নতুন করে টোবাকো ভরলেন। 'বাংলাদেশ কিংবা এশিয়ার প্রিজন সিস্টেম সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে?'

'না,' বলল রানা।

'ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান—এই রকম তেরোটা দেশের জেল থেকে বছরে প্রায় তিন হাজার কয়েদী পালাচ্ছে।' সিকিউরিটি চীফ তাঁর প্রবলেমটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেবার প্রয়াস পেলেন। 'এদের মধ্যে অধিকাংশই পরে ধরা পড়ে, ঠিক। অল্প সংখ্যক, এই ধরুন শ'দুয়েক, কক্ষনো ধরা পড়ে না। এই সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে। চলতি বছরে এক ইন্দোনেশিয়া থেকেই কয়েদী পালিয়েছে তিনশো বাহাত্তর জন, ধরা পড়েছে মাত্র দুশো তিনজন। বছরের এখনও বাকি পাঁচ মাস। লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো যে সব কয়েদী ধরা পড়ছে না তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই লংটার্ম প্রিজনার। চোদ্দ বছর বা তারও বেশি দিনের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী এরা। শুধু তাই নয়, এদের কেস হিস্ট্রি ঘেঁটে দেখা গেছে শতকরা একশো জনই ধরা পড়বার সময় প্রচুর টাকার মালিক ছিল, যে-টাকা স্থানীয় পুলিস তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি। অর্থাৎ ধরা পড়বার আগে নিজেদের বিপুল সম্পদ এরা বাইরে রেখে গেছে।'

'তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন, বাইরে রেখে যাওয়া টাকার জোরে এবং টাকা উপভোগের জন্যে এরা জেল ভেঙে পালাচ্ছে।'

'টাকার জোরে—রাইট!' সিকিউরিটি চীফ বললেন, 'আমি নিজে বাংলাদেশী কয়েদীদের পলায়ন সম্পর্কে চিন্তিত। একজন মার্ডারার বা একজন রেপিস্ট, যার চোদ্দ বছর বা তারও বেশি দিনের জেল হয়েছে—সে জেল থেকে পালাবে অথচ সাধারণ পলাতক কয়েদীর মত ধরা পড়বে না—এ অসহ্য! আমি, বুঝতেই পারছেন, এর একটা বিহিত করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। চেষ্টা চলছে বেশ কিছুদিন থেকেই। প্রথমে পুলিস কোমর বেঁধে নামে। ফলাফল—শূন্য। তারপর আমরা আদাজল খেয়ে নামি। ফলাফল ওই—শূন্য! ব্যাপারটা প্রেসিডেন্টের গোচরীভূত হয়েছে। আমাকে ডেকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যে-কোন ভাবে এর সমাধান করতে হবে। বুঝতেই পারছেন, নিজেরা ব্যর্থ হবার পর আমাদের হাতে আর কোন উপায় নেই। তাই বাধ্য হয়ে স্যারের শরণাপন্ন হই।

'প্রস্তাব শুনে স্যার বললেন, নিকোলাসের যাবজ্জীবন হবে, তুমি কি আশঙ্কা করো, তাকেও জেল থেকে বের করে নিয়ে আসার ষড়যন্ত্র হবে? ওনার উৎকণ্ঠা টের পেয়ে গেলাম আমি। সাথে সাথে বললাম, হবে ম্ম মানে, নিশ্চয়ই হবে, স্যার। ব্যস, কাজ হয়ে গেল। বললেন, নিকোলাস যেন আগামী বিশ বছর জেল থেকে বেরুতে না পারে। ওর জন্যে তুমি সরাসরি দায়ী থাকবে। দরকার হলে এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য তুমি চাইতে পারো।'

রানা শুনছে চুপচাপ।

'সাহায্য করতে রাজি হলেন, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে আমাকে

বললেন, তুমি আগামীকাল আবার দেখা করো আমার সাথে। বাধ্য হয়ে ফিরে গেলাম।'

'পরদিন...?'

'পরদিন আমাকে নক আউট করলেন তিনি। গত বছর দেড়েক ধরে আমরা যাদের বিরুদ্ধে জীবন পণ করেছি অথচ তাদের সম্পর্কে আগাডগা কিছুই জানতে পারিনি, তিনি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সব জেনে ফেলেছেন। আমাকে বললেন, বিভিন্ন দেশের লংটার্ম প্রিজনারদেরকে জেল থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে যে-দলটি তার নাম 14-K। এদের হেডকোয়ার্টার সম্ভবত হংকং-এ, তবে ম্যাকাও হওয়াও বিচিত্র নয়। জানেন কিছু এই 14-K সম্পর্কে?' সিকিউরিটি চীফ প্রশ্ন করলেন।

'ফোরটিন ক্যারেট সপ্তদশ শতকের একটি গুপ্তচক্র,' রানা বলল। 'সিক্রেট চাইনীজ ব্লাড সোসাইটিগুলোর একটি। জেনারেল Kot Sui wong 14-ক্যারেটকে কুয়োমীনটাংয়ের সিক্রেট এজেন্সীতে রূপান্তরিত করে। হংকং থেকে সে ফরমোজায় চলে যায় ১৯৫০ সালে, কিন্তু ছদ্মবেশ নিয়ে ফিরে আসে আবার কলোনিতে। ফিরে এসে সে সেখানে ফোরটিন ক্যারেটের আঠারোটি দলকে নতুন করে সক্রিয় করে তোলে। পৃথিবী জুড়ে আশি হাজার সদস্য আছে 14-ক্যারেটের। উপদল আছে অসংখ্য। ১৯৫৩ সালে মারা যায় জেনারেল।'

'হুঁ,' বেলায়েত হোসেন বললেন। 'যাই হোক, এই 14-K-ই কুকর্মটি করছে। মোটা টাকার বিনিময়ে এরা কয়েদীদের বের করে নিয়ে যাচ্ছে। জেলখানার ভিতর নিরাপত্তার ব্যবস্থা যাচাই করে দেখা হয়েছে, কোথাও কোন ফাঁক ফোকর নেই। তবু, নিত্যনতুন পদ্ধতিতে প্রতিমাসেই ঘটছে ঘটনা। 14-K সম্পর্কে আপনাকে বলবার কিছু নেই আমার। এরা যে কতটুকু উপযুক্ত, কতটুকু ক্ষমতা রাখে, অরগানাইজেশন হিসেবে কি রকম মজবুত, জানেন আপনি। পুলিস বা সি. আই. ডি. এদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি। দু'একজন কয়েদী জেলের ভিতর থাকা অবস্থায় 14-K সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিল, তারা আমাদের লোকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। একদিন দেখা গেল...'

'জেলের ভিতর মরে পড়ে আছে।'

'না,' বেলায়েত হোসেন বললেন। 'দেখা গেল তারা জেল থেকে পালিয়েছে। পালিয়েছে মানে, স্বেচ্ছায় পালায়নি, তাদেরকে জেল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জোর করে। এবং...'

'খুন করা হয়েছে বাইরে।'

'হ্যাঁ,' বললেন সিকিউরিটি চীফ। 'এ থেকে 14-K-র ক্ষমতা টের পাওয়া যায়। যারা বেরুতে চায় তাদেরকেই শুধু নয়, যারা বেরুতে চায় না তাদেরকেও বের করার ক্ষমতা রাখে ওরা।'

রানা বলল, 'বুঝলাম। কিন্তু এসবের মধ্যে আমি কোথায়?'

'এটা একটা নতুন ধরনের ক্রাইম, 14-K ইনট্রোডিউস...'

'আমার স্থান কোথায় এর মধ্যে?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

বেলায়েত হোসেন চুপ করে রইলেন ক'সেকেণ্ড, তারপর পাইপের দিকে

তাকিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কণ্ঠে, অনেকটা চ্যালেঞ্জের মত করে জানতে চাইলেন। 'তৌফিক আজিজের নাম শুনেছেন?'

'আলবদর।'

ম্রিয়মান দেখাল বেলায়েত হোসেনকে, 'কিছুই কি অজানা নেই আপনাদের?'

মৃদু হাসল রানা।

'ঠিক আছে, বলছি সব,' বললেন। 'তৌফিককে যাবজ্জীবন দেয়া হয়েছে বাংলাদেশে। তার অনুপস্থিতিতেই বিচার এবং রায় হয়। সে বাংলাদেশে নেই। আসলে, মাত্র একুশ দিন আগে দুনিয়া থেকেও নেই হয়ে গেছে সে। এই ত্রিপোলীতে ছিল, মোটর-অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। পিওর অ্যাক্সিডেন্ট, নো ফানি বিজনেস সাসপেকটেড। এখানে বলে রাখা দরকার, প্রেসিডেন্ট সমস্যাটার বিহিত করার জন্যে কঠোর নির্দেশ জারী করার পর থেকেই আমি তৌফিক আজিজের মত একজন লোককে খুঁজছিলাম, যার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ হবে না। তৌফিক আজিজ ত্রিপোলীতে বসবাস করছিল লিবীয় নাগরিক হিসেবে। কয়লা যেমন ময়লা হয়ে থাকতে পছন্দ করে, তৌফিকও তেমনি ক্রিমিন্যাল হয়ে থাকতে পছন্দ করত। এই তৌফিক আজিজ যে বাংলাদেশের আলবদর তৌফিক আজিজ এখবর ত্রিপোলীর উচ্চপদস্থ দু'একজন পুলিস অফিসার ছাড়া আর কেউ জানত না, এখনও জানে না। তার মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়নি খবরের কাগজে। খবরটা কোনভাবেই রটানো হয়নি।' বেলায়েত হোসেন ওয়ালেট বের করলেন পকেট থেকে। 'এই হলো তার ফটো। আপনার সাথে কিন্তু বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।'

রানা বলল, 'আমি তৌফিক আজিজ হব?' ফটোটা হাত বাড়িয়ে নিল ও। 'কিন্তু এ ধরনের ছদ্মবেশ নেয়া খুব রিস্কি, যেকোন সময় পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'মনে হয় না,' বেলায়েত হোসেন বললেন। 'অন্যতম কারণ, তৌফিকের কোন ছবি বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। ব্যক্তিগতভাবে তাকে যারা চিনত, বেশিরভাগই তাদের মধ্যে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মারা গেছে, নয়তো দেশ ছেড়ে পালিয়েছে কিংবা জেলে পচছে। ঢাকা জেলে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারব আমি।'

'তৌফিকের লাশের কি হলো?'

'অন্য নামে দাফন করা হয়েছে তাকে,' বেলায়েত হোসেন বললেন। 'কৃতিত্বটা আপনার চীফের। তিনি ঢাকা থেকে কয়েকটা সূতো ধরে টান দেন, কলকব্জাগুলোকে নিজের ইচ্ছা মাফিক সাজিয়ে নেন।'

'তার আত্মীয় স্বজন?'

'বিয়ে করেইনি। মা-বাবা বাংলাদেশের গ্রামে। আর কেউ নেই।'

রানা খানিকক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, 'বেশ, হলাম তৌফিক আজিজ। গেলাম বাংলাদেশে। তারপর?'

'ধীরে,' বেলায়েত হোসেন বললেন। 'তৌফিক আজিজ এই ত্রিপোলীতেও একবার ফেঁসে যায়। গত বছর জেল হয়েছিল তার মাস কয়েকের। সুতরাং, এখানকার সেন্ট্রাল জেল এবং স্ল্যাং সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে আপনাকে।'

'আমাকে আসলে কি করতে হবে খুলে বলুন।'

রানার চোখে চোখ রেখে চুপ করে রইলেন বেলায়েত হোসেন। দীর্ঘক্ষণ দেখলেন রানাকে। তারপর মাথা নেড়ে যেন নিজেকেই অনুমতি দিলেন। বললেন, 'মাত্র চারজন লোক আমার এই পরিকল্পনার কথা জানছে। আমি, স্যার অর্থাৎ মেজর জেনারেল রাহাত খান, আপনি। দিস ইজ টপ সিক্রেট। বিশ্বাস করুন, প্রেসিডেন্টকে সবটা জানাতে গিয়ে ব্যর্থ হই আমি, কারণ কি জানেন?'

'কি কারণ?'

'তিনি আভাস পেয়েই সতর্ক হয়ে যান। বলেন, আমি জানতে চাই না।

রানা ঠিক যেন বুঝল না কথাটা।

'কেন?'

এই প্রথম গম্ভীর হলেন বেলায়েত হোসেন, 'একটা ক্রাইমের শিকড়-উৎপাটনের জন্যে আমরা আর একটা ক্রাইম করতে যাচ্ছি, এ তিনি অনুমান করতে পারেন। পরিষ্কার জানা হয়ে গেলে তিনি অনুমতি দিতে পারবেন না, তাই।

রানা চুপ করে রইল ।

'মেজর জেনারেল রাহাত খান আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, আপনার মতামত জেনে নিতে, মতামত চাইবার আগে আপনাকে বিপদের গুরুত্বটা বুঝিয়ে দিতে। পরিকল্পনাটা যদি ফেঁসে যায়, যদি ক্রটি বেরিয়ে পড়ে, আপনাকে যে বিপদের মধ্যে পড়তে হবে তার তুলনায় মৃত্যু শ্রেয়। অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিকল্পনা নিয়েছি আমি ।'

'ত্রিপোলীর পুলিস কর্মকর্তারা কতটুকু জানে?'

'কিছুই জানে না। তারা সুযোগ-সুবিধে চাইলে পায়; দরকারের সময় দেয়ও —এছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই।'

রানাকে চিন্তা করতে দেখে বেলায়েত হোসেন বললেন, 'হ্যাঁ, চিন্তা করে বুঝে দেখুন।'

রানা হেসে ফেলল, বলল, 'আপনি যা ভাবছেন আমি তা চিন্তা করছি না, বলুন।'

'সর্বশেষ প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলব এবার। পুলিস এবং সি. আই. ডি.-র যৌথ প্রচেষ্টা ছিল সেটা। বাংলাদেশের আটটা প্রধান প্রধান জেলে আমরা নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দিই কয়েদী হিসেবে। প্রত্যেকেই লঙটার্ম কয়েদী। আমরা সেন্ট পার্সেন্ট শিওর ছিলাম, অর্গানাইজেশনটি এবার ফাঁদে পা দেবে। কিন্তু, আটজনের একজনের সাথেও যোগাযোগ করেনি তারা। কি প্রমাণ হয় এ থেকে?'

'প্রমাণ হয়, 14-K-এর নিজস্ব এসপিওনাজ নেটওয়ার্ক আছে। যে কয়েদীকে এরা জেল থেকে বের করে আনার প্রস্তাব দেয় তার সম্পর্কে তাদের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আগেভাগেই যাবতীয় খবর সংগ্রহ করে।'

'ঠিক তাই ' বেলায়েত হোসেন খুশি হয়ে বললেন। 'সুতরাং, তৌফিক আজিজ যে নকল কয়েদী নয় তা প্রমাণ করতে হবে। পরিকল্পনার কোথাও যেন কোন খুঁত না থাকে তার দিকে সম্পূর্ণ মেধা এবং পরিশ্রম ঢালতে হবে কি করলে তা সম্ভব ?'

'তৌফিক আজিজ বাংলাদেশে গিয়ে আবার একটা ক্রাইম করবে।'

'গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক।' বেলায়েত হোসেন বললেন। 'উপযুক্ত ওস্তাদ এবং তার উপযুক্ত শিষ্যের কাছেই সাহায্য চাইতে এসেছি আমি, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে? আপনি যা বললেন, স্যারও তাই বলেছেন। গুড! তাহলে, আপনি তৌফিক আজিজ, ঢাকায় একটা ক্রাইম করবেন এবং ধরা পড়বেন, কেমন? ধরা পড়বার পর আপনার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। সবাই জানবে আপনি সেই রাজাকার আলবদর তৌফিক আজিজ, যার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ লংটার্মের জন্যে আপনাকে ঢোকানো হবে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।'

'কিন্তু কাগজে আমার ছবি বের হলে?'

'বেরুবে না। বেরুলেও সবাই দেখবে তৌফিক আজিজের সাথে আপনার চেহারার কোন অমিল নেই।'

রানা বলল, 'তারপর?'

'ক্রাইমটা এমন হতে হবে, যার ফলে আপনি মোটা অঙ্কের মালিক বনে যান। কমপক্ষে বিশ-পঁচিশ লাখ টাকা ডাকাতি করতে হবে আপনাকে। পুলিস আপনাকে গ্রেফতার করবে, কিন্তু ডাকাতি করা মালামাল উদ্ধার করতে পারবে না। 14-K স্বভাবতই আগ্রহ বোধ করবে আপনার সম্পর্কে। টাকার বিনিময়ে কাজ করে তারা, আপনি যে টাকা দিতে পারবেন এ ব্যাপারে তাদের মনে কোন সন্দেহ থাকবে না।'

'ক্রাইমটা...'

'না, ক্রাইমটা নকল হলে চলবে না,' বেলায়েত হোসেনের চোখ দুটোর চারপাশ কুঁচকে উঠেছে। 'ক্রাইমটা হতে হবে জেনুইন। ক্রাইমটা জেনুইন হবে বলেই, ক্রাইমটা করার সময় বা পরে যদি কোনরকম বিচ্যুতি ঘটে, কারও কিছু করার থাকবে না আপনার জন্যে। আমি আপনাকে বাঁচাতে পারব না। স্যারও পারবেন না আপনাকে উদ্ধার করতে। বিচারে যদি আপনার চোদ্দ বছর হয় এবং 14-K আপনার সাথে যোগাযোগ না করে, পচতে হবে আপনাকে জেলে। করণীয় কিছুই থাকবে না কারও।'

'চোদ্দ বছরের সাথে যোগ হবে তৌফিক আজিজের বিশ বছর,' রানা বলল। 'জীবনের আর রইল কি?'

রানার বক্তব্য শুনে একটু যেন দমে গেলেন বেলায়েত হোসেন খান। একটু সময় নিয়ে মন স্থির করলেন।

'মতামতটা এখনই চাই আমি। আপনি কি ঝুঁকিটা নিতে রাজি?'

মনে মনে হাসল রানা। বেলায়েত হোসেন খান জানেন না, ওর রাজী হওয়া না হওয়াতে কিছু এসে যায় না। ঢাকা থেকে কুখ্যাত সেই বুড়ো রায় পাঠিয়েছেন: 'কাজটায় ঝুঁকি আছে, কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে হবে তোমাকে। বিপদে পড়লে তোমাকে সাহায্য করার প্রশ্নই উঠবে না, তা ঠিক। কিন্তু রানা, জেল ভেঙে তো সাধারণ কয়েদীরাও পালায়।'

স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে বুড়ো। 14-K যদি যোগাযোগ নাই করে, জেল ভেঙে পালিয়ে আসার রাস্তা তো ওর জন্যে খোলাই থাকবে

'ঠিক আছে.' বলল রানা। 'নেব ঝুঁকিটা।'

'থ্যাঙ্কস. মেনি থ্যাঙ্কস.' ন্যাশনাল সিকিউরিটি চীফ সশব্দে হাঁফ ছাড়লেন। 'আপনি আমাকে বাঁচালেন।'

'ক্রাইমটা কি হবে?' জানতে চাইল রানা।

'সেটা আমি ঢাকায় ফিরে গিয়ে স্থির করব। তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। হাতে সময় নিয়ে পরিকল্পনাটাকে নিখুঁত ভাবে দাঁড় করাব আমরা। এবার আমি নিকোলাস সম্পর্কে বলি। সবটা অবশ্য জানি না...'

'ওর সম্পর্কে আমি জানি.' বলল রানা।

'সবটা?' ভুরু কুঁচকে উঠল সিকিউরিটি চীফের।

'সবটা কেউই জানে না। যতটুকু জানা সম্ভব, জানি তার সবটুকু।'

আহত কণ্ঠে বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ বললেন, 'আমি হচ্ছি ন্যাশনাল সিকিউরিটির চীফ, আমি জানি না সবটা, অথচ...'

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স নিকোলাসকে ধরেছে। সুতরাং তারা তো জানবেই,' বলল রানা। 'রূপা নামে এক মেয়ের ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট ছিল ওটা। সাকসেসফুল। মাইক্রোফিল্মগুলো উদ্ধার করেছে নিকোলাসের কাছ থেকে ও, গ্রেফতারও করেছে তাকে। প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই ও প্রমাণ করেছে নিজের যোগ্যতা।'

'মাইক্রোফিল্ম? কিসের মাইক্রোফিল্ম?'

'প্রথম থেকেই বলি,' বলল রানা। 'সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো এই, পাকিস্তানী আমলে দেশী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বহু অনুসন্ধানের ফলে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের বেশ কয়েক জায়গায় ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়।'

'তেল?'

'শুধু তেল নয়,' বলল রানা। 'তেল এবং অন্যান্য আরও কিছু। কিন্তু পাকিস্তান সরকার স্বীকারই করেনি কথাটা। বুঝতেই পারছেন...'

'পারছি,' বললেন সিকিউরিটি চীফ। 'মূল্যবান খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হলে পূর্ব-পাকিস্তানের ইমপর্ট্যান্স বেড়ে যাবে বহু গুণ, বাঙালীরাও রাতারাতি উন্নত জীবনের অধিকারী হয়ে উঠবে— এটা পাকিস্তান সরকার চায়নি।'

'পাকিস্তান বা অন্য কোন দেশ এখনও তা চায় না,' বলল রানা। 'বুঝতেই পারছেন, এই না চাওয়ার কারণ কি।'

মাথা দোলালেন সিকিউরিটি চীফ।

'খনিগুলো অধিকাংশই বর্ডার এলাকায়,' বলল রানা। 'বর্ডারের এপার ওপার দু'পার থেকে একই বেসিনে পৌঁছানো সম্ভব। বুঝতে পারছেন?'

'আ-আচ্ছা,' পরিষ্কার ধরতে পারলেন সিকিউরিটি চীফ রানার বক্তব্য। 'এবার বুঝেছি।'

'ফাইলগুলো লুকিয়ে ফেলে পাকিস্তান সরকার। ওগুলোয় নক্সা, খনিজ দ্রব্যের আনুমানিক পরিমাণ এবং আরও সব অসংখ্য প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন এবং ডাটা ছিল। ফাইলগুলো লুকিয়ে ফেললেও পিণ্ডিতে সরাবার বা নষ্ট করে ফেলার সময়

পায়নি তারা। ওগুলো রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোথায়, তা কেউ জানত না,' বলল রানা।

'নিকোলাস জানতে পারে, তাই না?' সিকিউরিটি চীফ প্রশ্ন করলেন। 'সে জানল কিভাবে?'

'জানল কিভাবে তা বলতে পারব না,' বলল রানা। 'তবে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে ঢোকে সে একজন স্পাই হিসেবে, ফাইলগুলো উদ্ধার করার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে। কয়েক বছরের চেষ্টায় সফল হয় সে, খুঁজে পায় ফাইলগুলো। ফাইলের সব কাগজপত্রের ছবি তুলে নিয়েছে সে। তারপর নষ্ট করে ফেলেছে এক এক করে সবগুলো ফাইল। মাইক্রোফিল্মগুলো নিয়ে পালাবার আগেই সে ধরা পড়ে রূপার হাতে ।'

'নিকোলাসকে তাহলে এখন আর ভয় করার কি আছে?' জানতে চাইলেন সিকিউরিটি চীফ। 'সে জেল থেকে যদি পালিয়েও যায়, বাংলাদেশের ক্ষতি কি? মাইক্রোফিল্ম তো এখন আমাদের হাতে ।'

'নিকোলাসকে হিপনোটাইজ করে দেখা হয়েছে, গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারে সে ইনফরমেশন এবং ডাটাগুলো। অদ্ভুত, দুর্লভ একটা ব্রেন রয়েছে ওর। যা দেখে তারই ছবি গেঁথে নেয় ব্রেনটা।'

'মাই গড!' আঁৎকে উঠলেন সিকিউরিটি চীফ । 'তার মানে নিকোলাসকে কোনমতেই হাতছাড়া করা চলবে না। কোথায় সে এখন?'

'হাসপাতালে। গুলি খেয়েছে দু'কোমরে। কমপক্ষে বিশ বছর জেল হবে তার। কিন্তু তাকে জেল থেকে বের করারও চেষ্টা চালাবে 14-K, এ জানা কথা।'

'হুঁ,' বেলায়েত হোসেন মাথা দোলালেন। 'এই কারণেই মেজর জেনারেল রাহাত খানকে অমন বিচলিত এবং উৎকণ্ঠিত দেখেছি।'

'নিকোলাস সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেবেন?'

গম্ভীর হলেন বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ।

'ওকে আটকে রাখতেই হবে । যেমন করে হোক ধ্বংস করে দিতে হবে ফোরটিন ক্যারেটকে। এটা করতে গিয়ে নিকোলাস যদি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় বাংলাদেশ কূটনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, ঠিক, কিন্তু আমার চোখে এক বিন্দুও পানি আসবে না।'

ভদ্রলোকের চোখের দিকে চেয়ে রানা টের পেল কী পরিমাণ নিবেদিত প্রাণ মানুষ তিনি। সাদামাঠা ভাবটা বহিরাবরণ, ভেতরে ভেতরে ভদ্রলোক পেরেকের মত শক্ত।

'ভাল কথা, ধরুন, 14-K আমার সাথে যোগাযোগ করল এবং আমি তাদের সাহায্যে জেল থেকে পালিয়ে গেলাম, তারপর?'

'জেল থেকে বের করেই আপনাকে রাস্তায় ছেড়ে দেবে না ওরা নিশ্চয়ই ওদের ভেতরের খবর জেনে নিয়েই বেরিয়ে আসবেন আপনি। বাকি কাজটা সারব আমরা।'

'আর যদি নিকোলাসকে ওরা বের করে নিয়ে যায় আমাকে বাদ দিয়ে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন সিকিউরিটি চীফ 'আপনাকে দোষ দেব না। সেক্ষেত্রে আপনি আর কি করবেন?'

'কিন্তু যদি এই রকম ঘটে,' রানা বলল 'ধরুন, নিকোলাস এবং আমি একত্রে জেল থেকে বেরুই। তখন কি হবে?'

'হুঁ,' বেলায়েত হোসেনকে ইতস্তত করতে দেখল রানা। 'বুঝতে পারছি আপনার প্রশ্নটা।'

'কোন্‌টা গুরুত্বপূর্ণ? কোন্‌টা আগে?' জানতে চাইল রানা '14-K-কে ধ্বংস করা, না নিকোলাসকে খাঁচায় ফিরিয়ে আনা নাকি...'

চুপ করে রইলেন বেলায়েত হোসেন কয়েক মুহূর্ত

তারপর জোর দিয়ে বললেন, 'নিকোলাস আগে। তাকে জেলে ফিরিয়ে আনতে পারুন বা না পারুন সেটা বড় কথা নয়, কোন থার্ড পার্টি যোগাযোগ করে তথ্যগুলো যেন তার মগজ থেকে খুঁড়ে বের করে নিতে না পারে,' সিলিঙের দিকে তাকিয়ে যেন জনান্তিকে আওড়ালেন। 'ডেড মেন টেল নো টেল্‌স্‌।'

অর্থাৎ, নিকোলাসকে খুন করার নির্দেশ।

প্রচুর কাজ সারতে হলো। সময়ও লাগল তাই যথেষ্ট। রানাকে ত্রিপোলীর কয়েদখানা সম্পর্কে শিখতে হলো হাতে কলমে একজন প্রিজন অফিসার তালিম দিল দুই সপ্তাহ ধরে। তৌফিক আজিজের ফাইল নিয়ে এসে দেয়া হলো ওকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সেটা ঘেঁটে তৌফিক আজিজ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল রানা। ফটো দেখে চেহারাটা ধীরে ধীরে যথাসম্ভব রূপান্তরিত করা হলো।

বেলায়েত হোসেন ত্রিপোলীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সেরে নিয়েছেন ইতিমধ্যেই। 14-K অত্যন্ত ওয়েল অর্গানাইজড। তারা যে এই ত্রিপোলীতেও খোঁজ নেবে তৌফিক আজিজের আইডেন্টিটি সম্পর্কে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কাজেই প্রচুর খাটাখাটনি করে সেদিকটা ঠিকঠাক করেছেন তিনি, যাতে খোঁজ নিলেও টিকে যায় রানা।

'একটা কথা আমাকে আপনি বলেননি। কিংবা বলতে ভুলে গেছেন,' বিদায়ের প্রাক্কালে বেলায়েত হোসেন খান মজলিশকে বলল রানা।

'কি?'

'চারজন মাত্র জানছে ব্যাপারটা, বলেছেন। একজন আমি, একজন মেজর জেনারেল রাহাত খান, একজন আপনি, আরও একজন জানে বা জানবে। কে সে?'

'ওহ্-হো!' বেলায়েত হোসেন বললেন 'বলিনি এই জন্যে যে তিনি ঠিক কতটা জানবেন, মানে তাকে আমি কতটা জানাব তা এখনও ঠিক করিনি। তিনি আপনাদেরই আর এক জুয়েল, মিস রূপা। মেজর জেনারেল আমার হাতে সোপর্দ করেছেন তাঁকে।'

'রূপাকে সব জানাতে হবে,' বলল রানা। 'আপনি যদি ট্রাকের নিচে চ্যাপ্টা হন এবং মেজর জেনারেল রাহাত খান যদি বোবার শত্রু নেই মনে করে চুপ করে থাকেন, বিপদের সময় আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবার আর কেউ থাকবে না। মেয়েটা জুনিয়র কোন সন্দেহ নেই। পরিচয় নেই। আমার পরিচয় বলেছেন তাকে?'

'আপনার পরিচয় আমি জানাব?' বেলায়েত হোসেনকে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়তে দেখল রানা। 'আমি জানলে তো! মেজর জেনারেল বললেন, পরিচয় জানার দরকার নেই. ছেলেটা সত্যি কাজের এটুকু গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি।'

চকচক করে উঠল রানার চোখ. 'বলেছেন একথা ?'

বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ কাজ সেরে ফিরে গেলেন ঢাকায় দু'মাস পর তাঁর চিঠি পেল রানা ত্রিপোলীতে: পটভূমি রচিত হয়েছে. চলে আসুন ঢাকায়।

সাত

পায়চারি থামিয়ে বোতল থেকে সরাসরি গলায় ঢালল রানা হুইস্কি।

সবই ঘটছিল ঠিক ঠিক। ডাকাতি. বিচার. জেল. নিকোলাস—এবং 14-K। তারপরই পালে উল্টোমুখী বাতাস লাগল। সিকিউরিটির ব্যাপারে 14-K যে-কোন প্রফেশন্যাল এসপিওনাজ এজেন্সির সমকক্ষ। ফলে ওর ছদ্ম-পরিচয় খসে পড়তে যাচ্ছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা. খসে গেছে।

সেই মেয়েটার হাইপোডারমিক সিরিঞ্জই যত নষ্টের গোড়া! এরকম কিছু ঘটবে. চিন্তা করেনি ও। এদের হাতে এভাবে বন্দী থাকতে হবে ভাবেনি তাও।

ওদিকে. নিকোলাস কাছ ছাড়া হয়ে গেছে।

বোতলের অর্ধেকটা খালি করে ফেলল রানা। নিকোলাসকে হারিয়ে সর্বনাশের ষোলো কলা পূর্ণ করেছে ও। সে যখন ঘুমাচ্ছিল. রুটি কাটা ছুরি দিয়ে গলাটা দু'ফাঁক করে দিতে পারত নাকি? কিংবা গলায় দড়ি জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে পারত না চীফের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে?

নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সেগুলো আবার খণ্ডন করার চেষ্টা করছে রানা। নিকোলাসকে যদি খুন করত ও. পরদিন সকালে খুন হতে হত নিজেকে

কিন্তু ও খুন হত কি না হত সেটা তো পরবর্তী পর্যায়ের ব্যাপার. সুতরাং যুক্তি হিসেবে বিবেচনার যোগ্য নয়। নিকোলাসকে খুন করে নিজেকে খুন হওয়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলে সফল হতেও তো পারত সে। সম্ভাবনাটাকে কখনোই উড়িয়ে দেয়া চলে না।

দুটো হাত বালিশে রেখে তার উপর মাথা দিয়ে বিছানায় লম্বা হলো রানা। ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারে গোল আলু যে মিথ্যে কথা বলছে. সন্দেহ নেই। কারণ. ত্রিপোলীর পুলিস হেডকোয়ার্টারের ফাইলে তৌফিক আজিজের যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল তা সরিয়ে ফেলে রেখে আসা হয়েছে ওরটা। ত্রিপোলী থেকে যদি কোন প্রিন্ট আনিয়েও থাকে এরা. ওর হাতের সাথে মিলতে বাধ্য। তার মানে. ফিঙ্গারপ্রিন্টের কারণে 14-K ওকে তৌফিক আজিজ নয় বলে সন্দেহ করছে না. অন্য কারণ আছে—হয়তো। কারণ না থাকাও বিচিত্র নয়। স্রেফ সন্দেহ দূর করার জন্যে খোঁচা মেরে পরীক্ষা করতে চাইছে. সম্ভবত। না! জোরাল কোন কারণ আছে সন্দেহ করার। কি সেটা?

হয়তো কোথাও কোন ভুল করে ফেলেছে ও।

ঢাকায় পা দেবার পর থেকে যা যা করেছে একে একে সব স্মরণ করল রানা কোথায়, কি ভুল? ভুল যদি করে থাকে, ধরা পড়ছে না কেন?

আচ্ছা!

খচ্ করে বিঁধল সন্দেহের কাঁটা। অপ্রীতিকর সন্দেহ। অস্বস্তিকর। বেলায়েত হোসেন স্রেফ মুখ ফিরিয়ে নেননি তো ওর দিক থেকে? চীফ মাত্রই সাপের মত এঁকেবেঁকে চলেন। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে তিনি ওর পরিচয় প্রকাশ করাটাকে যদি লাভজনক বলে মনে করেন, তিন সেকেণ্ডের বেশি ইতস্তত না করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

কিন্তু ওর পরিচয় প্রকাশ করে দিলে লাভ হয় না কোনভাবেই, চিন্তা করে আবিষ্কার করল রানা।

অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে, বেইমানী।

কে?

বেলায়েত হোসেন? নাহ্! রূপা? কে জানে! মনে হয় না। রাহাত খান কি তেমন কাউকে এমন গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেণ্ট দেবেন? চিঠিতে প্রশংসা করেছেন তিনি রূপার।

তাহলে?

শত্রুপক্ষ কি আগে থেকেই লক্ষ্য রেখেছিল বেলায়েত হোসেনের উপর। তার অফিসে কি লুকিয়ে রেখেছিল কোন গোপন মাইক্রোফোন কিংবা টেপরেকর্ডার?

বাথরুমে ঢুকে মুখ, কান, ঘাড় ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে নিল রানা। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এল বেডরুমে। বদলে গেছে ওর চোখের দৃষ্টি। রুমের চারদিক দেখল তীক্ষ্ণ চোখে। চার কোনায় চারবার দাঁড়াল। প্রত্যেক কোণায় দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করল রুমটাকে।

রুমটার দ্বিতীয় অংশে কোন জানালা-দরজা নেই। সম্মুখ ভাগটা জরিপ করে নিয়ে সোফায় ফিরে এসে বসল ও। বাথরুমে ঢোকার আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পালাতে হবে। সোফায় বসার আগেই পালাবার পদ্ধতিটা স্থির করে ফেলল।

বন্ধ একটা রুম থেকে বেরুবার অনেক উপায় আছে। গুলি করে তালা ভাঙা যেতে পারে, যদি রিভলভার বা পিস্তল থাকে। তা যখন নেই, ওটা বাদ। আগুন ধরিয়ে দেয়া যায় ঘরে। তবে সেটা রিস্কি। পালানো সম্ভব, এমন গ্যারান্টি নেই। পরিণতির কথাটাও মনে রাখতে হবে। পোড়া ইঁদুরের বীভৎস দেহ ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। শত্রুকে কুপোকাত করা যেতে পারে তা করা প্রায় অসম্ভবই বলা যায়। অত্যন্ত সতর্ক লোক গোল আলু। দরজা খোলার পর ভিতরে ঢুকে দাঁড়ায় সে, রুমের চারদিক দেখে, দেখে রানা কোথায় আছে, কি করছে। ইতিমধ্যে বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে যায় দরজা, তালা লাগানো হয়।

এরপর গোল আলু পা বাড়ায় রানার দিকে। ভুলেও সে এই সময়টা রানার দিকে পিঠ ফেরায় না। দু'একবার লোকটার পিছনে যাবার চেষ্টা করেছে রানা পরীক্ষা করার জন্যে। গোল আলু যেতে দেয়নি ওকে। ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

কয়েকমুহূর্ত চিন্তা করার পর ওয়ারড্রোব থেকে মোজা বের করে বাথরুমের

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ফুলের প্রত্যেকটা টব থেকে খানিকটা করে আধভেজা মাটি নিয়ে মোজার অর্ধেকটা ভরল , মুখের কাছটা মুঠো করে ধরে শূন্যে ঘোরাল খানিক। তারপর বাঁ হাতের সিধে পিঠে মারল জোরে। ব্যথায় অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল গলা থেকে বেশ ভারি এবং শক্ত হয়েছে জিনিসটা।

গোল আলুর কাছে রিভলভার বা পিস্তল আছে। পকেট থেকে সেটা আজ পর্যন্ত একবারও উঁকি মারেনি, তবে অস্তিত্বটা পরিষ্কার টের পাওয়া যায়।

গোল আলুর পিছনে যেতে হবে তা শুধু বিশেষ এক কৌশলের সাহায্যেই সম্ভব । তাকে বিশ্বাস করাতে হবে ও সামনে আছে, অথচ সেই সময় ও থাকবে আসলে তার পিছনে।

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, প্রজাপতির মত নিঃশব্দে উড়ে এসে আলতোভাবে বসল মাথায় সহজ বুদ্ধিটা। সাথে সাথে আনন্দ এবং কৌতুক সশব্দ হাসি হয়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল, ছিপি এঁটে রাস্তা বন্ধ করে দিল রানা।

রোজ সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট আসে। কিন্তু পরদিন সকাল দশটা বাজতেও পাকস্থলীর বিক্ষোভে সাড়া দিল না ব্রেকফাস্ট। রুস্তম এল ট্রলি না নিয়েই, বুড়োআঙুল ধনুকের মত বাঁকা করে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল রানা।

নব ধরে পিছন দিকে ঘাড় ফেরাল রানা, 'বোবা?'

রুস্তমের পকেটে ঢোকানো হাতটার কব্জি বেরিয়ে এল বাইরে। চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে জবাব নেই।

নিচের হলরুমে একজোড়া বুড়োবুড়ি মাথা হেঁট করে এমন ভাবে বসে আছে, দেখে রানার মনে হলো এদের একমাত্র সন্তান এদেরকে ফেলে পালিয়ে গেছে ইহজগৎ থেকে, নিঃশব্দে কাঁদছে ভাই। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল দু'জনই, কিন্তু চোখাচোখি হলে ওদের চোখের করুণ দৃষ্টি সহ্য হবে না আশঙ্কা করে রানা তাকালই না।

ড্রয়িংরুমে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে।

হাসি জিনিসটা যে সর্বদা আনন্দসঞ্জাত নয়, আর একবার মনে পড়ে গেল রানার গোল আলুর ঠোঁট বাঁকা হতে দেখে। ডেস্কের উপর দু'হাত বিছিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন। সারারাত ধরে কি গল্প তৈরি করলেন?'

'ঘুমিয়ে কাটিয়েছি রাতটা,' রানা বলল। 'যে গল্প বলেছি সেটাই সত্যি।

'তুমি মিথ্যেবাদী!' সম্বোধন পাল্টে গেল, চোখ পাকাল গোল আলু। 'এবং বুদ্ধু। মগজ থাকলে বুঝতে পারতে যে তোমাদের সেট-আপ ভেঙে পড়েছে। আমরা জানি তুমি তৌফিক আজিজ নও। কে, জানতে পারিনি যদিও।'

তৌফিক আজিজ নই একথা স্বীকার করার সাথে সাথে মাকড়সার জালে আটকা পড়ে যাব, ভাবল রানা। জানতে চাইবে, আমি কে, আমার গুরুত্ব কতটুকু, যোগাযোগ কার কার সঙ্গে, উদ্দেশ্য কি, কতটুকু জানি ওদের সম্পর্কে, কাদের হয়ে কাজ করছি, কেন?

বিচলিত বোধ করল রানা। ও যে তৌফিক আজিজ নয় সে ব্যাপারে গোল আলুকে ওভারশিওর মনে হচ্ছে।

'আমি তৌফিক আজিজ ।'

'নও,' মাথা দোলাল গোল আলু। 'নিজেই এইমাত্র প্রমাণ করেছ।' রানাকে চমকে দিয়ে বলল। 'হলে তৌফিক আজিজের বাবা-মা বসে আছে। তুমি ওদেরকে তোমার বাবা-মা বলে মনে করো?'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ধাপ্পাও হতে পারে ব্যাপারটা । তৌফিক আজিজের বাবা-মা নয় হয়তো ওরা।

'বাজে কথা শোনাবার জন্যে নামিয়ে এনেছ নাকি আমাকে?' হেসে উঠল রানা হঠাৎ। 'ওরা আমার বাবা-মা নয় এবং আমিই তৌফিক আজিজ । গোল আলু, তোমরা বেইমানী করছ। কথা ছিল…'

'পাঁঠা আর বলে কাকে!' গোল আলুকে দাঁতে দাঁত চাপতে দেখল রানা। 'বলছি না, তোমাদের সেট-আপ ভেঙে পড়েছে?' দীর্ঘ, বিলম্বিত লয়ে নামটা উচ্চারণ করল সে । 'বে…লা…য়ে…ত হো…সে…ন খা…ন ম…জ…লি…শ।'

তলপেটে শূন্যতা অনুভব করল রানা। কিন্তু মুখের হাসিটাকে এতটুকু ম্লান হতে না দিয়ে সাথে সাথে বলল, 'বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ ? চিনি না, কে?'

'বেশ,' রিস্টওয়াচ দেখল গোল আলু। 'ওষুধের ব্যবস্থা করতেই হবে, বুঝতে পারছি। এই মুহূর্তে হাতে অন্য কাজ রয়েছে আমার। তোমাকে দু'ঘণ্টা সময় দিচ্ছি ওষুধের কথাটা মনে রেখে নতুন এবং সত্য কাহিনী তৈরি করার জন্যে । আমাকে যদি দু'ঘণ্টা পর সন্তুষ্ট করতে না পারো, তোমার অকাল মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী থাকব না।

গম্ভীর দেখাল রানাকে। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল গোল আলুর মুখের দিকে। বলল, 'নতুন কাহিনী শুনতে চাও? বেশ। তৈরি করার চেষ্টা করব।'

'তৈরি করা কাহিনী নয়,' গোল আলু বলল। 'সত্য কথাটা জানতে চাই আমরা।'

'সত্য কাহিনী একটাই হয়। সেটা তোমাকে বলেছি।'

শ্রাগ করে চেয়ার ছাড়ল গোল আলু , ইঙ্গিত করল রানার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা পালোয়ান রুস্তমকে ।

উপরের রুমে উঠে সোফায় বসল রানা। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সিগারেট ধরিয়ে ভাবল খানিক। দু'চার টান দিয়ে অ্যাশট্রের মাথার সাথে জ্বলন্ত মাথাটা গুঁড়িয়ে আগুন নেভাল , তারপর ফেলে দিল ভিতরে। বাথরুমের দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে চিন্তা করল কয়েক সেকেণ্ড আরও। তারপর বাথরুমে ঢুকল।

শেভ করল তাড়াহুড়ো করে।

বেডরুমে ফিরে এসে বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়াল আবার। এক এক করে খুলল শার্ট, ট্রাউজার, গেঞ্জি এবং আণ্ডারওয়্যার। সবগুলো জড় করা অবস্থায় ওখানেই রেখে ওয়ারড্রোবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভিতর থেকে ব্রাউন রঙের ট্রাউজার এবং সাদা শার্ট, সেই সাথে নতুন গেঞ্জি ও আণ্ডারওয়্যার বের করে পরে নিল দ্রুত।

বাথরুমে ঢুকে খুলে দিল পানির কল । সশব্দে পানি পড়তে শুরু করল বালতিতে। বেডরুমে ফিরে এসে বাথরুমের দরজাটা ভিজিয়ে দিল, ফাঁক হয়ে রইল

সেটা একটু।

বিছানায় বসে মোজা আর জুতো পায়ে গলিয়ে পকেটে ভরে নিল কয়েকটি জিনিস। রুমটা দেখল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে। তারপর দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে। হাতের ভারি মোজাটকে ক্রমশ আরও ভারি বলে মনে হতে লাগল ওর।

প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো কাটতে চায় না। ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই। দু'ঘণ্টার কথা বলে গোল আলু যদি দু'দিন পরও আসে, ওখান থেকে নড়া চলবে না ওর।

দীর্ঘ সময় মনে হলেও, গোল আলু মাত্র এক ঘণ্টা পরই এসে পড়ল। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঢুকল সে। অভ্যাস মত ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড়টা সোজা, পেশী টান টান। বাথরুমে পানি পড়ার শব্দ কানে যেতেই ঢিলেঢালা হয়ে গেল ভঙ্গিটা। আরও এক পা এগোল, পিছন থেকে দরজায় তালা লাগার ক্লিক শব্দটা কানে বাজতেই । তার পিছনে হাত খানেক বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ঘাড় ফেরালেই দেখতে পাবে। কিন্তু ফেরাল না। রানা বাথরুমে এ তো সে বুঝতেই পারছে।

আক্রমণটা আসছে কিভাবে যেন টের পেয়ে গেল লোকটা। মোজা ধরা হাতটা উপরে তুলেছে রানা, ঝট্ করে তাকাল সে রানার দিকে।

মুখোমুখি হওয়ায় সুবিধে হলো। ভারি মোজাটা সজোরে মাথার চাঁদিতে নামিয়ে দিয়ে ডান পা মেঝে থেকে তুলে লোকটার দু'উরুর সংযোগস্থলে গুঁতো মারল রানা হাঁটু দিয়ে। গাঁক করে শব্দ হলো একটা।

গোল আলুকে আলিঙ্গন করল রানা। গায়ের সাথে লেপ্টে ধরে রাখল। শব্দটা জোরেই বেরিয়েছে, বাইরে থেকেও শোনা গেছে কিনা বোঝার জন্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে ক'সেকেণ্ড। কিছুই ঘটল না।

গোল আলুর পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করে নিল ও প্রথমে। চ্যাপ্টা অটোমেটিক, ম্যাগাজিনে নয় রাউণ্ড, কিন্তু চেম্বার ফাঁকা। অ্যামেচার লোক।

চেম্বারে গুলি ভরে সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা। পকেটে রাখল সেটা। গোল আলুর মুখ বাঁধল রুমাল দিয়ে। বাথরুম থেকে পানি নিয়ে এসে ভিজিয়ে দিল মুখটা। নিস্তব্ধতা গার্ডের সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে ভেবে প্রথম থেকেই আলাপের ভঙ্গিতে বকবক করে চলেছে ও একনাগাড়ে।

লোকটার জ্যাকেটের পকেট থেকে মানিব্যাগ পাওয়া গেল। নোটগুলো দেখে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করতে হলো। তিন দেশের নোট। বাংলাদেশী, ভারতীয় এবং সিঙ্গাপুরী। মানে? এটা তাহলে কোন্ দেশ?

ট্রাউজারের পকেট থেকে পাওয়া গেল একটা ছুরি। তক্ষুণি কাজে লাগাল রানা সেটাকে। মেঝের কার্পেটটা কয়েক ফালি করে কাটল, কাটা ফালিগুলো স্তূপ করল এক জায়গায়। ব্র্যাণ্ডির দুটো বোতল খালি করল সেগুলোর উপর।

চোখ মেলেই গোল আলু দেখল তারই নিজের পিস্তল, এক চোখো শয়তানটা চেয়ে আছে তার দু'চোখের মাঝখানে।

'বুঝতেই পারছ,' বিরতি নিয়ে রানা বলল। 'তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাব

আমি, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। কোনরকম চালাকি করতে চাইলে কি ঘটবে তা আমি ব্যাখ্যা করে বলতে চাই না। তবে ঘটনাটার পরও বেঁচে থাকব আমি, তুমি থাকবে না। ওঠো, দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও।'

গোল আলুর চোখের কোণে পানি। জ্ঞান ফিরে পাবার সাথে সাথে ব্যথা অনুভব করছে সে। উঠে দাঁড়াল। নড়বড়ে খুঁটির মত দুলছে দেখে রানা পিছন থেকে শিরদাঁড়ার উপর খোঁচা মারল পিস্তল দিয়ে, 'অভিনয় কোরো না। দরজার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলে মনে করব গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছ—গুলি করব তখুনি।'

কার্পেটে আগুন ধরাল রানা। পিঠে রিভলভার ঠেকিয়ে গোল আলুকে নিয়ে গেল দরজার কাছাকাছি। বাঁ হাত বাড়িয়ে কলিং বেলের বোতাম চেপে ধরল।

মিনিট খানেক পর ক্লিক করে খুলে গেল তালা। কবাট দুটো ফাঁক হতে শুরু করেছে। গোল আলুর বগলের নিচে দিয়ে একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা কবাট ধরে একঝটকায় টেনে উন্মুক্ত করল রানা, চিৎকার করে উঠল, 'ফায়ার: ফায়ার!'

আগুন ইতিমধ্যে হলুদ রঙ ধারণ করছে। হু-হু করে উঠছে কালো ধোঁয়া। গোল আলুর কাঁধের উপর দিয়ে দৃষ্টি ফেলে রানা গার্ডের হতচকিত মুখটা দেখতে পেল। শিরদাঁড়ায় রিভলভারের খোঁচা খেয়ে পা বাড়াল সেই সময় গোল আলু। বাঁ হাতের তালু দিয়ে রানা তার পিঠের মাঝখানে জোরে ধাক্কা মারল।

পতন এড়াবার জন্যে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল গোল আলু গার্ডকে, জড়াজড়ি করে পড়ল দু'জনেই দেয়ালের গায়ে, সেখান থেকে মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আট হাত-পায়ে প্যাঁচ লেগে গেছে। প্যাঁচটা লাফ দিয়ে টপকে ছুটল রানা।

পিছন থেকে শব্দ হলো পিস্তলের, কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। পিছন থেকেই ভেসে এল আতঙ্কিত একটা কর্কশ চিৎকার।

বাঁক নিয়ে ছুটছে রানা। হাতে সেফটি ক্যাচ অফ করা অটোমেটিক।

বাড়িটার সবদিক থেকে ভেসে আসছে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। সেইসাথে হাঁক-ডাক, চিৎকার, গালাগালি। পালাতে গিয়ে সবাই যা করে তা না করে সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠতে শুরু করল রানা।

তিনতলার করিডরের পাশাপাশি কয়েকটা রুম। খোলা একটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে যাবে, হাত দুটো স্থির হয়ে গেল রানার। ছুটন্ত পদশব্দ কাছে এসে পড়েছে । কবাট নড়তে দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে লোকটা, গুলি না করে উপায় থাকবে না রানার।

দু'ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে লোকটাকে সিঁড়ির দিকে ছুটে যেতে দেখল রানা, দরজায় খিল এঁটে দিয়ে দ্রুত পরীক্ষা করল ও জানালাগুলো। খোলা অসম্ভব ।

দরজা খুলে উঁকি দিল, বেরিয়ে এল আবার করিডরে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে গোল আলুর চিৎকার, 'গাধার বাচ্চারা! আগুন লেগেছে তো কি হয়েছে, আমি তৌফিককে চাই। রুস্তম নিচটা দেখো। নাসির, তিনতলায় যাও।'

একটি মেয়েলী পুরুষকণ্ঠ বলল, 'উপরে নেই কেউ, এই তো নেমে এলাম আমি।'

'রুস্তম ছিল সিঁড়ির নিচে, তৌফিককে দেখেনি সে!' কণ্ঠে উল্লাসের আভাস।

'তার মানে কুত্তাটা এই দোতলাতেই কোথাও লুকিয়ে আছে। ছড়িয়ে পড়ো সবাই চারদিকে। ঘেরাও করো।'

'কিন্তু আগুন যে···।'

'তৌফিককে না পেলে এমনিতেই এ-বাড়ি ছাড়তে হবে!' দূরে সরে গেল গোল আলুর কণ্ঠস্বর।

পিছনের পেঁচানো সিঁড়িটা খুঁজে বের করে নিল রানা। অর্ধেকটা নেমে বাঁক নিতেই প্রায় সরাসরি নিচে রুস্তমকে দেখতে পেল ও। ব্যাকডোরটা খোলা। দোরগোড়ায় নয়, দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছ থেকে তিন হাত পিছনে, চওড়া প্যাসেজের দিকে চোখ।

পিস্তলটা উল্টো করে ধরে রেলিং টপকে লাফ দিল রানা নিচের দিকে।

রুস্তমের পিছনে নামল সশব্দে। কংক্রিটের মেঝেতে পা পড়ার আগেই রুস্তমের খুলির পিছন দিকটা ফাটিয়ে দিয়েছে পিস্তলের বাঁটের ঘা মেরে। পতনোন্মুখ শরীরটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল রানা। পিছন ফিরে একবার তাকালও না।

গাছপালার প্রাচীর ভেদ করে মাঠ, তারপর ধান খেতের আল ধরে ছুটল রানা। দূরে চওড়া, পিচ ঢালা উঁচু রাস্তা। পিছন ফিরল রানা রাস্তায় উঠে। বাড়িটার দোতলা পুড়ছে। ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। এতক্ষণে খেয়াল হলো ওর, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে কখন থেকে যেন।

কাছাকাছি বাসস্ট্যাণ্ড। দূর থেকে তিনজন লোককে দেখতে পেল ও। প্যান্ট-শার্ট পরা কালা আদমী। বাংলাদেশই তাহলে এটা।

বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াল রানা। উদাস এবং অন্যমনস্কতার ভাব ফুটিয়ে তুলল মুখে। এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল লোকগুলোর সাথে চোখাচোখি হবার ভয়ে। দৃষ্টি আটকে গেল লাইট পোস্টের গায়ে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ডে।

সাইনবোর্ডের উপরে লেখা বাসস্টপ, বাংলায়। তার নিচে, ওই একই কথা ইংরেজিতে লেখা। তার নিচের লেখাটার দিকে চোখ পড়তেই ধক করে উঠল বুক।

সম্মোহিতের মত লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল রানা। অক্ষরগুলো বাংলার মত দেখতে হলেও বাংলা নয়। এ ভাষা বাংলাদেশে চলে না। তবে চেনা অক্ষর, বহুবার দেখেছে ও।

শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, আসছে একটা বাস। বাসটার কপালে আঁকা রঙচঙে অক্ষরগুলো নাচতে লাগল ওর চোখের সামনে। বাংলা বা ইংরেজি অক্ষর নেই একটাও, সব হিন্দী।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সহজেই সামলে নিল ও। এ ধরনের কিছু একটা আশা করছিল ও মনে মনে। হাসি পেল একটা কথা ভেবে: 14-K তাদের কথা রেখেছে, বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে সরিয়ে এনেছে তারা ওকে।

ভারতে।

হংকং সম্রাট-২

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৭৭

এক

'কোথায় যাবেন, দাদা?'

গোল আলুর মানিব্যাগ থেকে ভারতীয় পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে বাড়িয়ে দিল রানা। 'শেষ মাথা পর্যন্ত।' কোথায় গিয়ে থামবে বাস জানে না ও।

কণ্ডাক্টর আপাদমস্তক দেখল ওর। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। আধ ঘণ্টা চলবার পরই কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকতে লাগল ওর চোখে সব কিছু।

শেষ মাথায় পৌঁছুবার আগেই, জানালা দিয়ে এয়ারপোর্ট এলাকাটা চিনতে পেরেই নেমে পড়ল ও। কণ্ডাক্টর বলল, 'কি হলো দাদা, মন ঘুরে গেল নাকি?'

দমদম এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের ভিতর ঢুকল রানা। বুকস্টল থেকে কিনল কয়েকটা বাংলা এবং ইংরেজি দৈনিক। কোলকাতার একটা ম্যাপও কিনল সেই সাথে। ওগুলো নিয়ে ঢুকল রিফ্রেশমেন্ট লাউঞ্জে। কোনার একটা টেবিল দখল করে ওয়েটারকে চিংড়ির কাটলেট আর কফি আনার অর্ডার দিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল একটা দৈনিক।

জেল ভেঙে পালানোর খবরটা এখনও তাজা। ঢাকার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই দু'কলম ব্যাপী খবর ছাপা হয়েছে। খবরের বিষয়বস্তু হরেকরকম এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। চাকরি গেছে একজন হেড কনস্টেবলের, দু'জন জমাদারের, একজন সুবেদারের। এক ডিপ্‌টিকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। বদলি করা হয়েছে চীফ সিকিউরিটি অফিসার, জেল সুপার এবং আরও কয়েকজনকে। ঢাকা পুলিস পশ্চিমবঙ্গ এবং বার্মা পুলিসকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে নিকোলাস এবং তৌফিক আজিজ সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্যে, কারণ এরা বর্ডার ক্রস করে দু'দেশের যে কোন দেশে ঢুকে গা ঢাকা দিতে পারে। নিকোলাসকে ধরিয়ে দেবার জন্যে বাংলাদেশ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই পুরস্কার যে-কোন দেশের যে-কোন নাগরিক পেতে পারেন। তৌফিক আজিজের জন্যে কোন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি। তবে, উল্লেখ করা হয়েছে যে নিকোলাস তৌফিকের সাথে আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তৌফিককে পাওয়া গেলে নিকোলাসকেও গ্রেফতার করা সম্ভব হতে পারে।

কাগজ নামিয়ে রেখে পকেট থেকে গোল আলুর সম্পত্তি বের করল রানা। মানিব্যাগের ইনার চেম্বার খুলে পাওয়া গেল তিনটে ড্রাইভিং লাইসেন্স। বাংলাদেশ ও ভারতের তো বটেই, সিঙ্গাপুরেরও রয়েছে একটা।

সিঙ্গাপুর নামটার সাথে দু'বার ঘষা খেল রানা। এর আগে সিঙ্গাপুরী ডলার দেখেছে ও মানিব্যাগে। গোলালুর সাথে সিঙ্গাপুরের কোন সম্পর্ক আছে। কি সেটা?

ছোট্ট নোটবুকটা এই প্রথম পকেট থেকে বের করল ও। নীল কাভার উল্টে দেখল গোটা গোটা অক্ষরে লেখা: ইয়াকুব আলী।

কোথাও কেনাকাটার বিবরণ, কোথাও ফোন নম্বর, কোথাও হিন্দিতে কি সব লেখা। বন্ধ করে রেখে দিতে যাবে, একটা পৃষ্ঠায় কয়েকটা নাম ইংরেজিতে লেখা দেখে মনোযোগ দিল রানা। দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথম থেকে সাত নম্বর পর্যন্ত কোন নামই পরিচিত নয়।

দ্বিতীয় নামটি, ঠিকানাসহ লেখা: বেলায়েত হোসেন খান মজলিশ। রিভোলী ট্রেডার্স। ফার্স্টক্লাস কন্ট্রাক্টর অ্যাণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স, থার্ড ফ্লোর, ১১/১১, মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া, ঢাকা।

বেলায়েত হোসেন খানের কাভার এখন ফাটা বেলুন। তেতো হয়ে গেল রানার মেজাজ।

পরের পৃষ্ঠায় আরও তিনটে ঠিকানা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর।

বিবরণসহ নাম ঠিকানাগুলো এই রকম:

ওয়ান। ম্যারিনো—চিটাগাঙ পোর্ট। টোয়েনটি সিক্সথ জুন টু সেকেণ্ড জুলাই।

টু। বিশাখাপট্টম। সেভেনথ জুলাই টু ইলেভেনথ জুলাই।

থ্রী। মাদ্রাজ। ফিফটিনথ জুলাই টু সেভেনটিনথ জুলাই।

ফোর। সিঙ্গাপুর। রিফুয়েলিং।

ফাইভ। ম্যাকাও। হংকং।

পরের পৃষ্ঠায় ছোট্ট করে লেখা: খান আবদুর রউফ খান। দমদম এয়ারপোর্ট। সিক্সথ্ জুলাই।

চোখের পাতা পড়ে না রানার। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল নামটার দিকে। এর অর্থ? গোল আলু ওরফে ইয়াকুবের নোটবুকে এ নাম কেন? রাজনীতির সাথে 14-K-র সম্পর্ক কি? আবদুর রউফ খান, সাবেক সরকারী দলের প্রভাবশালী সদস্য, প্রতিমন্ত্রী হয়েছিল একবার। যদিও অজ্ঞাত কারণে সম্ভবত কোন ক্রাইম করার অপরাধে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাকে দল থেকে, চাকরিটাও কেড়ে নেয়া হয়েছিল সেই আমলেই। এই লোকই চাকরি দিয়েছিল নিকোলাসকে। এ লোক ইদানীংকার ঢাকার ঘরোয়া রাজনীতিতে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। এর সাথে কি সম্পর্ক?

পরের পৃষ্ঠায় আর একটা এন্ট্রি।

লেখা রয়েছে: রুস্তমকে পাঠাতে হবে সান চিন চিন-এর কাছে। ওয়াঙ হো, চীনা পাড়া।

ম্যানেজারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঢাকার একটা টেলিফোন নম্বর বুক করল রানা। দশ মিনিট পর কানেকশন পাওয়া গেল।

বেলায়েত হোসেন খান নন, কথা বলল রূপা।

'রিভোলী ট্রেডার্স।'

'কে, রূপা?'

মিষ্টি কণ্ঠস্বরটা এক সেকেণ্ডে বদলে গেল। রীতিমত ভর্ৎসনার আভাস তাতে। 'আপনি কোলকাতায় কি করছেন?'

'কি আর করব, খই ভাজছি,' বলল রানা। 'বেলায়েত সাহেবের সাথে কথা বলতে চাই।'

পরিষ্কার জানিয়ে দিল রূপা, 'তাকে পাওয়া যাবে না।' তারপর বলল, 'যা বলবার আমাকে বলুন। আমি এখন চার্জে। হয়েছে কি?'

'বেলায়েত সাহেবকে পাওয়া যাবে না কেন?' বলল রানা। 'পাওয়া যাতে যায় তার ব্যবস্থা করো। এণ্ড ডু ইট কুইকলি।'

'মি. তৌফিক, চেক ইওর ল্যাঙগুয়েজ। ''করো'' না—করুন,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রূপা। 'তিনি হসপিটালে। একটা ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়েছেন।'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। 'অবস্থা?'

এতটুকু ভাবাবেগ বা অন্য কোন রকম প্রতিক্রিয়া নেই রূপার কণ্ঠে। খবর পাঠিকার মত নিরপেক্ষ কণ্ঠস্বর। 'ডাক্তাররা বলছেন বাঁচার আশা নেই।'

দ্রুত বদলে যাচ্ছে রানার চেহারা। চকচকে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে। বাঁ হাতের দু'আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে সিগারেট। লম্বায় বড় হচ্ছে ছাই।

'কবে, কোথায় ঘটেছে অ্যাক্সিডেন্ট?'

'আপনাদের জেল থেকে বেরুবার দিনই।'

ওই একই দিন স্নায়রা ওকে বলে, ও তৌফিক আজিজ নয়।

'ওটা অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে না,' বলল রানা। 'আমাদের কাভার ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।'

সেই নির্বিকার কণ্ঠ স্বর রূপার। 'হয়তো।'

'মাত্র চারজন জানতাম আমরা,' বলল রানা। 'আমাদেরই কেউ···

'একজনকে বাদ দেয়া যেতে পারে,' বলল রূপা।

'কার কথা বলছেন?' ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

'মেজর জেনারেল রাহাত খান।'

'হয়তো,' বলল রানা। 'কিন্তু একজন 14-K-র নোট বুকে রিভোলী ট্রেডার্সের নাম লেখা রয়েছে। বেলায়েত সাহেবের নামও আছে।' হজম করার সময় দিয়ে বলল আবার। 'রূপা, ঢাকার পরবর্তী টার্গেট আপনি। টেক ভেরি গুড কেয়ার অফ ইওরসেলফ। বেলায়েত সাহেবকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, ওটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। তার মুখ থেকে বা তার কাছ থেকে পাওয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে জেনেছে ওরা আমাদের পরিচয়।'

'কতটা জেনেছে?'

'বুঝতে পারছি না এখনও,' বলল রানা। 'তবে সূত্র যখন পেয়েছে আগে পরে সবটা জানবেই। ভাল ঠেকছে না অবস্থা, চম্পট দিতে হবে অন্য কোথাও।' প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে শেষ কথাটা বলল রানা।

রূপা চুপ করে রইল।

নিজের অবস্থা?—ভাবছে রানা, বেলায়েত সাহেব বাঁচে কিনা সন্দেহ, রূপাকে

যদি 14-K ঘায়েল করতে পারে—থাকবে ও একা। রাহাত খান—ও ধরা পড়লে তিনি স্বীকারই করবেন না ওকে নিজের লোক বলে। একজন রানার চেয়ে তাঁর কাছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

রূপাই এখন ওর একমাত্র ইনশিওরেন্স। পুলিস যদি ওকে ধরতে পারে, ডাকাতির অপরাধ, জেল ভেঙে পালাবার অপরাধ এবং হত্যার প্রচেষ্টার অপরাধে সাজা হবে ওর, তৌফিক আজিজের যাবজ্জীবন থেকে মুক্তি পেলেও। রূপাই একমাত্র রক্ষা করতে পারে ওকে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দিয়ে।

সংবিৎ ফিরল ওর রূপার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে। প্রশ্ন করল সে। 'নিকোলাস কোথায়?'

'হাতছাড়া হয়ে গেছে। কোথায় এখন জানি না।'

'হোয়াট? কি বললেন?' রূপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল। 'সর্বনাশের ষোলো কলা পূর্ণ করে পরামর্শ চাইবার কি দরকার ছিল?'

'পরামর্শ চাইছি কে বলল?' বিরক্ত হয়ে বলতে গিয়েও কথা শেষ করতে পারল না রানা।

রূপা থামিয়ে দিল ওকে। 'খানিক অপেক্ষা করুন।' বলে তিন মিনিট কাটিয়ে আবার ফিরে এল অপরপ্রান্তে। 'ফ্লাইংক্লাবের একটা প্লেন নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে দু'ঘণ্টার মধ্যে নামছি আমি। কিছু দরকার আছে আপনার?'

'টাকা। নতুন কাগজপত্র।'

'আপনার বর্তমান পরিচয়টাই বহাল থাকুক। সুটকেসে আপনার কাপড়চোপড় এবং পাসপোর্ট নিয়ে আসছি আমি। লাউঞ্জে থাকুন আমার অপেক্ষায়।' অনুরোধ নয়, আদেশের সুর কণ্ঠে।

'রিভোলীর কাছ থেকে দূরে থাকুন।' সাবধান করে দিল রানা। 'কেউ অনুসরণ করছে কিনা লক্ষ্য রাখুন সব সময়। লাউঞ্জে আমি থাকছি না। এয়ারপোর্টে পুলিস ছাড়াও নানাধরনের লোক যাওয়া-আসা করে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল রয়্যালের রেস্তোরাঁয় চলে আসুন সরাসরি। কেবিন নিয়ে অপেক্ষা করব আমি।'

'ঠিক আছে। আর, যদিও আমাকে সাবধান করে দেবার প্রয়োজন ছিল না, তবু, ধন্যবাদ।' দয়া করে সৌজন্যটুকু প্রকাশ করল যেন রূপা। 'কত টাকা?'

'আটচল্লিশ লাখ থেকে যতটা আনতে পারেন।' ডাঁট কি মেয়ের! কাছে এসো, বের করছি ডাঁট! মনে মনে বলল রানা, জীবনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টে সাফল্য অর্জন করে বিগড়ে গেছে মাথা, চ্যাটাং-চ্যাটাং বুলি ছাড়ছ তাই। 'আচ্ছা, দু'ঘণ্টার মধ্যে আসতে পারছেন তো?'

যদি বকবক করে আরও দেরি করিয়ে না দেন,' ঝাঁঝের সাথে বলল রূপা। 'ক্যালকাটা পুলিসকে অ্যালার্ট করে দেয়া হয়েছে, আমি না পৌছানো পর্যন্ত দয়া করে ওদের হাতে ধরা পড়বেন না,' আদেশের সুরে কথাটা বলে সশব্দে রেখে দিল সে রিসিভার।

রূপা সম্পর্কে অধিকতর খেয়াল আরোপ করল রানা যখন দেখল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দু'ঘণ্টা পর কেবিনের পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল মেয়েটা। ডান হাতের

লেদার ব্যাগটা রাখল টেবিলের উপর।

'এসেছেন?'

ভুরু কুঁচকে দেখল রূপা রানাকে। 'মানে? সন্দেহ ছিল নাকি? কি মনে করেন আপনি আমাকে?'

রূপার আপাদমস্তক দেখল রানা। মৃদু হাসল। 'মিস্টার রূপা।'

উঁহু, হাসল না মেয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ারটা দেখে নিয়ে বসল নিঃশব্দে। তারপর ব্যাখ্যা দাবি করার ভঙ্গি করে বলল, 'ফোনে বোকার মত কথা বললেন কেন?"

'কি বলেছি?'

'চম্পট দিতে হবে অন্য কোথাও,' উল্লেখ করল কথাটা রূপা। 'কথাটার অর্থ? আমি কি ধরে নেব মেজর জেনারেল রাহাত খান একটা কাওয়ার্ডকে এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব দিয়েছেন?'

হাসি চেপে রানা বলল, 'সবই তো ভণ্ডুল হয়ে গেছে। করবটা কি এখন?'

জেরা করছে যেন রূপা। 'নিকোলাসকে পালিয়ে যেতে দিলেন কেন?'

'আমি দিইনি। সে নিজেই সুযোগটা তৈরি করে নিয়েছে।'

'কিছু না কিছু নিশ্চয়ই করার ছিল আপনার!' ধমক।

'তা ছিল। যখন ঘুমাচ্ছিল, ধড়টা আলাদা করে দিতে পারতাম মুণ্ডু থেকে। আপনি হলে তাই করতেন, না?'

'বোকার মত কথা বলবেন না,' চরম বিরক্তি প্রকাশ করল রূপা। 'এই অ্যাসাইনমেন্টের আমি প্ল্যানার এবং সুপারভাইজার, অ্যাকশনের দায়িত্ব ছিল আপনার ওপর। অ্যাসাইনমেন্টটার যে হাল করেছেন, এখন দেখছি আমাকেই নামতে হবে অ্যাকশনে।'

'প্লীজ, সবটা না হলেও হাফ দায়িত্ব নিন দয়া করে,' বলল রানা। 'সাথে যদি একটা মেয়ে, আই মীন, ভদ্রমহিলা থাকেন, উৎসাহ বেড়ে যাবে আমার কয়েকশো গুণ। তখন হয়তো সফল হওয়া অসম্ভব হবে না।'

স্পর্ধা দেখে বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইল রূপা।

তাড়াতাড়ি কাজের কথা পাড়ল রানা। '14-K-কে আমরা যতটা ভেবেছি তার চেয়ে অনেক বেশি হুঁশিয়ার, রূপা,' বলল রানা। 'নিকোলাসের ধারণা, সে যেসব দেশের নাগরিক সেই সব দেশের যে কোন দেশ 14-K-এর উদ্যোক্তা হতে পারে। 14-K খুব সম্ভব সাধারণ ক্রিমিন্যালদের অর্গানাইজেশন নয়।'

বিরোধিতা করার ভঙ্গিতে একমত হলো রূপা। 'জানি। পুরানো কথা। নতুন কিছু বলবার থাকলে বলুন।'

'বেলায়েত সাহেবকে কেমন দেখে এলেন?'

'টেলিফোন করেছিলাম। বলল, পরিবর্তন নেই।'

'ঘটনাটার বিবরণ দিতে পারেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'রাত এগারোটার দিকে ধানমণ্ডির একটা সাইড-রোড থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, একটা ট্রাক পিছন থেকে ধাক্কা মারে। এক ভদ্রলোক তাঁকে হসপিটালে পৌঁছে দেন নিজের গাড়িতে তুলে। ট্রাকটাকে এই ভদ্রলোক দূর থেকে

দেখেছিলেন, নম্বর টুকতে সময় পাননি।'

'অত রাতে ধানমণ্ডিতে কেন গিয়েছিলেন?'

'সন্ধ্যার পর থেকে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন তিনি,' বলল রূপা। 'প্রেসিডেন্ট, উপদেষ্টা, আমাদের চীফ এবং আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যান তিনি। এরা সবাই নিকোলাসের কোন খবর না পাওয়ায় জবাবদিহি চাইবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে।'

চোয়াল দুটো উঁচু উঁচু হয়ে উঠল দু'বার রানার। অন্যমনস্কভাবে 'হুঁ' বলে উঠে দাঁড়াল ও। 'চলুন. গাড়ি ভাড়া করে রেখেছি একটা।'

'কোথায়?'

'চীনা পাড়ায়।'

চেয়ার ছাড়ল না রূপা, উঠবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না তার মধ্যে। 'কেন?'

'ইয়াকুবের—একজন 14-K-র নোটবুকে লেখা আছে: রুস্তমকে চীনাপাড়ায়, ওয়াঙ হো রেস্তোরাঁয় পাঠাতে হবে,' বলল রানা। 'রুস্তমকে চিনি আমি। দেখা যাক, ওখানে ওকে পাওয়া যায় কিনা। আজ ক' তারিখ?'

'জুলাইয়ের দশ।' চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে বলল রূপা।

রেস্তোরাঁ ছেড়ে বাইরে বের হলো দু'জন। রেণ্ট-এ কার-এর-একটা অ্যাম্বাসাডর নিয়ে রওনা হলো।

'ম্যারিনো নামটা শুনেছেন কখনও?' প্রশ্ন করল রানা।

'ম্যারিনো?' চিন্তা করে উত্তর দিল রূপা, 'না। কেন?'

'নোটবুকে এই নামটাও আছে,' বলল রানা। 'সম্ভবত কোন জাহাজ বা ইয়টের নাম।'

ঝট্ করে তাকাল রূপা রানার দিকে।

'মাসুদ রানার নাম শুনেছেন?'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রূপা। 'কি সম্পর্ক তার সাথে এই অ্যাসাইনমেন্টের?'

'সম্পর্ক নেই, আবার আছেও।'

'না, সম্পর্ক নেই,' বলল রূপা। 'সে এখন ইটালীতে, যতদূর জানি। বর্তমান অ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গে কথা বলবেন না আমার সাথে।' নির্দেশ জারি করল সে।

'দেখেছেন কখনও ছোকরাকে?'

'না,' বলল রূপা। 'আমি স্পেশাল ট্রেনিংয়ে জার্মানীতে ছিলাম, নতুন রিক্রুট। হেডকোয়ার্টারে জয়েন করেছি অল্প কিছুদিন মাত্র। মাসুদ রানার কথা এত জানতে চাইছেন কেন? নিজে সামলাতে পারবেন না মনে করে তার সাহায্য পাবেন কিনা ভাবছেন?'

রানা উত্তর দেবার আগে রূপাই আবার বলল, 'কারও সাহায্যের দরকার নেই। আমরাই পারব।'

মুখ ফিরিয়ে তাকাল রানা, 'বলছেন পারব?'

'যদি আমার কথা শোনেন, নির্দেশ মানেন।'
'আপনি তাহলে লিডার?'
'তাছাড়া উপায় কি,' বলল রূপা। 'কেউ যদি নিজেকে অযোগ্য মনে করে, তার জায়গায় একজনকে না একজনকে আসতেই হবে। আর কেউ নেই যখন, আমাকেই দখল করতে হবে তার জায়গা।'
শব্দ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'যাক, বাবা, বাঁচলাম। এতদিনে সাক্ষাৎ মিলল তাহলে!'
'কার?'
'জোয়ান অফ আর্কের।'
কটমট করে চাইল রূপা, কিন্তু কোন কথা বলল না।
খানিকপর নিস্তব্ধতা ভাঙল সে-ই। 'আর যাকে তাকে যা তা বলবেন না আমার সামনে।'
'সেরকম কোন অপরাধ করেছি নাকি?'
'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সই শুধু নয়, গোটা এসপিওনাজ জগতে 'মাসুদ রানা' নাম একটা কিংবদন্তীর মত—সে একাই একটা ইন্সটিটিউশন, তাকে ছোকরা বলার স্পর্ধা আপনার হলো কি ভাবে?'
'অফিসের মেয়েরা তাকে পুজো করে,' বলল রানা হাসি চেপে রেখে। 'আপনিও দেখছি তাদেরই দলে। কিন্তু মেয়েদের এই ব্যাপারটা আমি বুঝি না। চেহারা বা চালচলনে আমার তো মনে হয় তার চেয়ে কোন অংশে কম নই আমিও, কিন্তু কই…'
'বাজে কথা রাখুন!' ধমকের সুরে বলল রূপা। 'পুজো নয়, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ঠিক তাকে নয়, তার যোগ্যতাকে, তার কাজকে শ্রদ্ধা করি আমি। আর…দয়া করে তার সাথে নিজের মিল খুঁজবেন না, হাসতে হাসতে পাগল হয়ে যাবে লোকে।'
রানা বলল, 'শুনেছি তার চোখে পড়ে গেলে নাকি কোন মেয়ের নিস্তার নেই।'
'নিস্তার নেই মানে… ও,—ইস্!' রূপা ঠোঁট বাঁকাল। 'অত সহজ নাকি?'
নির্জন বিকেল, ফুরফুরে বাতাস, গড়ের মাঠ দেখা যাচ্ছে দূরে, গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাঁ হাত রাখল রানা রূপার কাঁধে, 'সাপোজ মনে করো আমি মাসুদ রানা। তোমাকে যদি একটা চুমু…'
এক ঝটকায় হাতটা নামিয়ে দিয়ে সশব্দে চড় মারল রূপা রানার গালে। পরমুহূর্তে অপর হাত দিয়ে খুলে ফেলল গাড়ির দরজা। দৃঢ় গলায় বলল, 'ভুল করছেন আপনি। এর আগে যে-সব মেয়ের সাথে মিশেছেন সম্ভবত তাদের মত নই আমি। ভুল না ভাঙা পর্যন্ত আপনার সাথে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। হিলটন হোটেলের রেস্তোরাঁয় আগামী দু'দিন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি থাকব। ক্ষমা চাইবার ইচ্ছা যদি জাগে, ওখানে দেখা করতে পারেন। আপনি না গেলে আমি ফিরে গিয়ে মেজর জেনারেলের কাছে রিপোর্ট করব।'
চড় খাওয়া গালে হাত বুলাতে বুলাতে রানা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'দুঃখিত। ঠাট্টা করছিলাম। এরকম ভুল আর কখনও হবে না।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। কারও মুখে কথা নেই আর। রূপার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, লক্ষ্য করল রানা।

খানিকপর, অত্যন্ত সহজ গলায়, যেন কিছুই হয়নি, রূপা জানতে চাইল, 'চীনাপাড়ার কাউকে চেনেন?'

'আমার এক পুরানো বন্ধু আছে, চে, দেখা যাক পাওয়া যায় কিনা,' বলল রানা সামনের দিকে চোখ রেখে। 'কিন্তু চীনাপাড়ায় যাবার আগে হোটেলে দুটো রুম ভাড়া করতে চাই আমি।'

'দুটো নয়, একটা রুম,' বলল রূপা। 'হোটেল ম্যানেজমেন্ট সন্দেহ করবে দুটো রুম নিলে। থাকতে হবে আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে।'

কথা না বলে রূপার দিকে সকৌতুকে তাকাল রানা।

'কাউকে ভয় করি না আমি,' দৃঢ় গলায় বলল রূপা। 'আত্মরক্ষার কৌশল জানা আছে আমার।'

হোটেলে রুম ভাড়া করে আবার গাড়িতে চড়ল ওরা। রানা সবিনয়ে বলল, 'চড়ের ব্যাপারে অভয় দিলে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি।'

'করুন।'

'চড়টা···মানে, কোন্ অপরাধে চড়টা খেলাম? তুমি বলে সম্বোধন করেছি বলে, না চুমু খেতে চেয়েছি বলে, নাকি নিজেকে মাসুদ রানার সমকক্ষ হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি বলে?'

'তিনটের কোনটির জন্যেই নয়,' স্পষ্ট স্বরে বলল রূপা। 'তোমাকে আমার পছন্দ হয়নি বলে।'

'সম্বোধন বদলে গেল—ভাল, ভাল! ধীরে ধীরে অগ্রগতি হচ্ছে তাহলে।'

'স্বামী-স্ত্রীর মত আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে—তাই,' বলল রূপা। 'অন্য কোন কারণে নয়। আমার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা দয়া করে বাদ দিন। মাসুদ রানা হওয়া যেমন আপনার পক্ষে এজন্মে সম্ভব নয়, তেমনি ওটাও সম্ভব নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। 'হায়! কেন যে রানা হয়ে জন্মাইনি!'

রূপা শান্তভাবে বলল, 'রানা হয়ে রানাও জন্মায়নি। নিজেকে সে তৈরি করে নিয়েছে।'

'কি করলে রানার মত হতে পারব?'

'আপনার জন্যে ব্যাপারটা দিবাস্বপ্ন দেখার সামিল।' ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট্ট আয়না আর লিপস্টিক বের করে ঠোঁটের পরিচর্যা শুরু করল রূপা।

'কোন আশাই কি নেই তাহলে আমার?'

'আছে,' মুখ না তুলে উত্তর দিল রূপা। '14-K-কে ধ্বংস করতে পারলে, নিকোলাসকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে।'

হাসতে শুরু করল রানা। 'প্রতিজ্ঞা করছি, দুটো কাজই করব। না করতে পারলে রানার মত হতে চাইব না আর।'

'খুশি হলাম।' আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে মন্তব্য করল রূপা।

ঘিঞ্জি চীনাপাড়ায় ঢুকতেই মনে হলো, ব্ল্যাকআউট। অন্ধকার গলির দু'পাশে ছোট

ছোট বারান্দা আর জানালা। জানালা থেকে যে আলো বেরিয়ে আসছে তাতে মানুষ দেখা যায় না, মানুষের কাঠামো টের পাওয়া যায় মাত্র। খক্-খক্ কাশি, হিস্-হিস্ কথা, হ্যাহ্-হ্যাহ্ চাপা হাসির শব্দ শুনে মনে হতে লাগল রানার, চারদিকে ষড়যন্ত্র চলছে।

গাড়িটা থামাতে হলো। সরু গলিতে ঢুকে রানা রূপার একটা হাত ধরল। 'ভয় পাচ্ছ একথা স্বীকার করে নিলে দেখবে দূর হয়ে গেছে ভয়।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল রূপা। 'কি যে মনে করো নিজেকে!'

গলি পেরিয়ে বাজারে অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তায় পৌঁছুল ওরা।

'চে একটা রেস্তোরাঁর মালিক,' বলল রানা। 'আগে আমি ঢুকব, পরে তুমি। দরজার কাছাকাছি টেবিল দখল করে বসবে তুমি। তোমাকে একা দেখে কেউ যদি কিছু...'

'সে ভয় নেই,' ফোঁড়ন কাটল রূপা। 'বাহাদুরী দেখাবার জন্যে অন্তত আমার কোন ক্ষতি হতে দেবে না নিশ্চয়ই তুমি।'

'আচ্ছা, রূপা, আমি মাসুদ রানা নই, একথা তোমার কেন মনে হয়? মানে, রানার সাথে আমার তফাৎটা খুঁজছি আমি।'

রূপা গম্ভীর করল মুখ। বলল, 'অন্যতম কারণ, আমার ধারণা, মাসুদ রানাকে মেজর জেনারেল কক্ষনো কুখ্যাত তৌফিক আজিজ সাজতে বলতে পারেন না। রানার প্রেস্টিজ আছে। সে নিজেও রাজি হত না তৌফিক আজিজ হতে।'

'তোমার সম্বোধন শুনে মনে হচ্ছে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তার সাথে তোমার। তাকে "সে" বলছ, অথচ দেখোইনি কখনও।'

'বিখ্যাত লোকদেরকে "তুমি" বলে সম্বোধন করা যায়,' রূপা জ্ঞান দান করার ভঙ্গিতে বলল।

বাজারটা সরগরম। হেন জিনিস্ কোলকাতায় নেই যা চীনা বাজারে পাওয়া যায় না। আলোর বন্যা বইছে চারদিকে। মারওয়াড়ী, চীনা, মাদ্রাজী, বোম্বাইওয়ালা, পাঞ্জাবী ছেলেমেয়ের দুর্দান্ত ভিড়। বাজার এলাকা ছাড়িয়ে আবার প্রায় অন্ধকারে চলে এল ওরা।

দূরে নীল, হলুদ এবং লাল রঙের নিয়নসাইন: চে রেস্তোরাঁ।

বলতে হলো না, রূপা নিজেই পিছিয়ে পড়ল। চে রেস্তোরাঁর ভিতর যখন ঢুকল রানা, সে তখন গজ বিশেক পিছনে। নির্জন, প্রায় অন্ধকার রাস্তার উপর একা রূপা, পরিবেশের সাথে খাপ খাবার জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলল, বের করল বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার।

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঢুকল সে ভিতরে।

ফাঁকা নিস্তব্ধ বাইরেটাকে দেখে ভিতরের অবস্থা আঁচ করার কোন উপায় নেই। হলরুমের মত প্রশস্ত জায়গা। ছোট্ট একটা স্টেজও আছে এক কোনায়। কেবিনগুলো হলের এক ধারে, অপর ধারের দেয়াল জুড়ে এক হাত চওড়া আয়নার ফালি নেমে এসেছে সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত। ছোট ছোট টেবিল কাছাকাছি দাঁড় করানো। প্রচুর ভিড়। চীনা, জাপানী, ভারতীয় ছাড়াও কয়েকজোড়া ইউরোপীয়ান হিপ্পিও রয়েছে। এত ভিড়ে রানাকে দেখতেই পেল না রূপা। টেবিল খালি নেই

একটাও দরজার কাছাকাছি। ইতস্তত করছিল ও, দেখল. একজন ওয়েটার দু'জন চীনা যুবককে নিচু গলায় কি যেন বলছে, যুবক দু'জন চেয়ে আছে রূপার দিকে। কষে টান মারল রূপা সিগারেটে। বাঁকা চোখে তাকাল চারদিকে।

যুবক দু'জন নিঃশব্দে উঠে চলে গেল বাইরে। ওয়েটার রূপার সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল, ভাঙা হিন্দীতে বলল, 'ম্যাডাম, টেবিল খালি হয়েছে, আপনি বসুন।'

ওর নির্দিষ্ট টেবিলে গিয়ে বসেছে রানা। স্টেজের পাশে মেঝে থেকে খানিকটা উঁচুতে টেবিলটা। ওখান থেকে হলের সর্বত্র দেখা যায়। চে-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জন্যে কয়েকটা টেবিল রাখা আছে এখানে। তারাই একমাত্র এখানে বসবার অধিকারী।

একজন ওয়েটার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল রানাকে দেখতে পেয়েই। 'মি. চে তো নেই, স্যার!'

'নেই?' রানা হাসল। 'কোথায় সে?'

'ঠিক বলতে পারব না, স্যার,' বলল লোকটা। 'মি. চে-এর বড় ছেলে মি. তাও পঙ শ্যেন আছেন। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

ওয়েটার ঘাড় ফিরিয়ে হলের দিকে তাকাল একবার। ইতস্তত করল খানিক। বলল, 'তিনি এই মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যস্ত...'

'ডেকে নিয়ে এসো তাকে।'

উদ্বিগ্ন দেখাল ওয়েটারকে। প্রায় ছুটেই চলে গেল সে।

মিনিট তিনেক পর বেঁটে খাটো, রোগা পটকা এক অল্প বয়সী যুবক রানার সামনে এসে দাঁড়াল। 'আপনি কে?'

যুবকের আপাদমস্তক দেখল রানা। হুবহু না হলেও, চে-র ছেলে বাপের মতই দেখতে। চেহারায় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তার ছাপ।'

'আমি মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'আমাকে তুমি চিনবে না। তোমার বাবার বন্ধু আমি।'

'রানা? আপনি মাসুদ রানা?' চঞ্চল চোখে হলের দিকে এদিক ওদিক দ্রুত তাকাল তাও, তারপর ফিরল আবার রানার দিকে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। লক্ষ্য করল, ভয়ে অস্থির হয়ে আছে তাও। 'কি হয়েছে বলো তো? চে কোথায়?'

চিংড়ি মাছের মত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল তাও। হাত তুলে ঝটপট টেনে দিল দু'দিকের স্ক্রীন। শব্দ করে তালি মারল দু'বার। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে রানার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে আশ্চর্য আবেগের সাথে কথা বলে উঠল সে, 'আপনিই সেই মানুষ, যিনি মঙ চু চাওয়ের রেপিস্ট গ্রুপের হাত থেকে আমার মাকে বাঁচিয়েছিলেন?'

ঘটনাটা কয়েক বছর আগে ঘটেছিল। আণ্ডারওয়ার্ল্ডের একটা গ্রুপ প্রতিপক্ষের কাছ থেকে টাকা খেয়ে তাদের নির্দেশ মত যে-কোন লোকের স্ত্রী বা মেয়েকে রেপ করত। চে-র ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী এই গ্রুপটাকে লেলিয়ে দেয়, তারা একরাতে দল বেঁধে এসে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয় রেস্তোরাঁ। কর্মচারী এবং চে-কে তারা দড়ি

দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখে মেঝেতে। চে-র সুন্দরী স্ত্রী আনা ওয়াংকে নগ্ন করে তারা, পনেরো জনের একটা দল তৈরি হয়ে যায় রেপ করার জন্যে। রানা এসব জানত না। রেস্তোরাঁয় ঢোকার মুখে বাধা পায় ও। তিনজন লোক ওর পথ আটকায়। ফিরেই যেত রানা। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই এলাকায় আসেনি ও। রাতের চীনাপাড়া দেখতে কেমন জানতে এসেছিল। কিন্তু ফেরা হলো না রেস্তোরাঁর ভিতর থেকে নারী কণ্ঠের চিৎকার কানে ঢুকতে।

তিনজনকে আধমরা করে ভিতরে ঢুকে রানা দেখে এক মহিলার চার হাত-পা টেনে ধরে রেখেছে চারজনে, আর একজন কাপড় খুলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তার উপর। অন্যান্য আরও কয়েকজন লোক উল্লাসে লাফঝাঁপ দিচ্ছে চারদিকে।

পিস্তল ছিল না সাথে, সম্পূর্ণভাবে ভরসা করতে হয়েছিল ওকে জুডো আর কারাতের উপর। কিন্তু প্রতিপক্ষ সংখ্যায় বেশি। ঝাড়া বিশ মিনিট মরণপণ মারপিটের পর গোটা দলটাকে অচল করে দেয় ও। সেই থেকে চে-র সাথে বন্ধুত্ব।

মৃদু হাসল রানা। 'হ্যাঁ। তখন তুমি ফরমোজায় ছিলে, না?'

'হ্যাঁ,' সিধে হয়ে দাঁড়াল তাও। এতক্ষণে রানা দেখল তাওয়ের পিছনে দু'জন লোক নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

তাও নির্দেশ দিতে লাগল। 'চু, স্যারকে আপ্যায়ন করো। ইনি আমার মায়ের বড় ভাই। ফেং, পাহারায় থাকো। ডাকলেই যেন পাই।'

বেরিয়ে গেল দু'জন।

'পাহারা কেন, তাও?' প্রশ্ন করল রানা। 'কিছু যেন আশঙ্কা করছ তুমি। কি ব্যাপার?'

কি যেন বলতে গিয়েও বলল না তাও। 'তেমন কিছু নয়। হয়তো অকারণে ভয় পাচ্ছি আমি। সে যাক, আপনাকে জড়াতে চাই না।'

'তোমার মা কোথায়?' জানতে চাইল রানা। 'জাপান থেকে ফেরেনি?'

অন্যমনস্কভাবে তাও বলল, 'না। আপনি কি যে মন্ত্র দিয়ে গেছেন, সেই যে কারাত শিখতে গেল, ফিরছেই না। গত পরশু একটা চিঠি পেয়েছি, জাপানের জাতীয় কারাতে ইন্সট্রাক্টর হয়েছে গতমাসে। আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে আসবে লিখেছে।' তাও গলা নামাল। 'বাবা গেছেন বিশাখাপট্টমে। খুব জরুরী দরকার ছিল আপনার? আমাকে দিয়ে কোন কাজ হয় না?'

কথা শেষ করে অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়াল তাও, পর মুহূর্তে বসে পড়ল আবার। চোখের দৃষ্টি হলের নির্দিষ্ট একটা টেবিলের দিকে। টেবিলটায় চারজন লোক বসে আছে, আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। তিনজন চীনা, একজন বাঙালী। চারজনেরই কর্কশ চেহারা।

'বিশাখাপট্টমে গেছে চে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'কেন?'

তাও শুনছে না, চেয়ে আছে সে টেবিলটার দিকে। সেদিকে তাকাল রানাও। লাল টি-শার্ট পরা বাঙালী লোকটা ওদের দিকে তাকিয়ে তার চীনা সঙ্গীদের উদ্দেশে কিছু যেন বলছে বলে মনে হলো।

'কারা ওরা?'

উত্তেজনা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে তাও বলল, 'সান চিন চিন-এর লোক এরা। আপনি যে রেপিস্ট গ্রুপটাকে ধ্বংস করেছিলেন সেই মঙ চাও গ্রুপের হোতা ছিল সান চিন চিন। এখন সে হংকঙের স্টার ক্রিমিন্যাল ইয়ান ভ্যান ডক-এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে এখানে। সান চিন চিন বাবার জন্মশত্রু। তবে বাবাকে যমের মত ভয় করে এসেছে এতদিন। সে বা তার লোক ভুলেও আমাদের রেস্তোরাঁয় পা ফেলেনি কখনও। অথচ আজ চারজনের একটা দল ঘণ্টা দুয়েক আগে ঢুকে এখনও বেরুবার নাম করছে না। ওদের কোন উদ্দেশ্য আছে. বাবা নেই...'

'এটাই তোমার দুশ্চিন্তার কারণ?'

'হ্যাঁ,' বলল তাও। 'এমন কখনও হয়নি। সান চিন চিনের লোকেরা আমাদের রেস্তোরাঁয় ঢুকেছে এটা কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ. ওরা প্রত্যেকে কুখ্যাত দাগী লোক। পুলিস সব সময় খুঁজছে ওদের। ওরা জানে, বাবার সাথে পুলিসের ভাল সম্পর্ক আছে। বাবা এখানে নেই একথা জানলেও এখানে ঢোকার সাহস হবার কথা নয় ওদের।'

'পুলিসে খবর দিলেই তো পারো।'

'বাইরেও ওদের লোক রয়েছে,' চাপা গলায় বলল তাও। 'কাউকে পাঠাবার উপায় নেই। ফোনেরও কানেকশন পাচ্ছি না, ডেড। খুব সম্ভব তার কেটে দিয়েছে ওরা।'

এতক্ষণে বিপদটা গুরুত্ব পেল রানার কাছে।

'তোমার বাবার অনুপস্থিতির সাথে এদের এই দুঃসাহসের সম্পর্ক আছে,' বলল রানা। 'সে যে বিশাখাপট্টমে গেছে, সবাই জানে?'

'কাকপক্ষীরও টের পাবার কথা নয়,' বলল তাও বিচলিত কণ্ঠে।

'কেন গেছে সে বিশাখাপট্টমে?'

'ইয়ান ভ্যান ডক-এর সাথে জরুরী একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে গেছে,' বলল তাও। 'এই সান চিন চিন-এরই ব্যাপারে। সান চিন চিন ইয়ান ভ্যান ডকের এজেন্ট নিযুক্ত হবার পর থেকে বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে, বাবা গেছে নালিশ করতে।'

'ইয়ান ভ্যান ডক,' বলল রানা। 'নামটা কোথায় যেন শুনেছি?' স্মরণ করার চেষ্টা করল ও।

তাও ওকে সাহায্য করল। 'ফার ইস্টের সবচেয়ে ধনী এবং কুখ্যাত লোক ইয়ান ভ্যান ডক। মাস্টার ক্রিমিন্যাল। হংকং-এ হেড অফিস ওর। লোকে ডাকে —হংকং সম্রাট।'

সুতো ধরে কেউ যেন টান দিল, ঝুঁকে পড়ল রানা তাওয়ের দিকে। 'সে এখন বিশাখাপট্টমে? হংকঙের মাস্টার ক্রিমিন্যাল বিশাখাপট্টমে কি করছে?'

'কি করছে ঠিক জানি না,' বলল তাও। 'তবে তার এবারকার সমুদ্র ভ্রমণটা খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে। প্রত্যেক বছরই বেরোয় সে, তবে এশিয়ার বাইরে যায় না। কিন্তু এবার সে ইউরোপ, আফ্রিকা ঘুরে এসেছে। রহস্যময় ব্যাপার হলো, চট্টগ্রাম পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছে এদিকে, অথচ হংকঙের দিকে ফেরার কথা তার। কারণটা বোঝা যাচ্ছে না।'

'এত খবর রাখো তুমি?'

'আমি না, বাবা গত ক'মাস থেকে ইয়ান ভ্যান ডক সম্পর্কে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করেছিলেন, সান চিন চিন তার এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে। এসব আমি বাবার মুখেই শুনেছি।'

'আফ্রিকা বা ইউরোপের কোন্ কোন্ জায়গা হয়ে এসেছে সে জানো?'

'ক্যাসাব্লাঙ্কা, পালার্মো, আলিকজাণ্ড্রিয়া, জেদ্দা, পোর্টসুদান, এডেন, মোম্বাসা, ম্যাডাগাস্কার এই সব জায়গার নাম বলতে শুনেছি বাবাকে।'

তাওয়ের পরের কথাগুলো তখন কানে ঢুকছে না রানার। গত কয়েক মাসের খবরের কাগজে পড়া নির্দিষ্ট কিছু খবর একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে ওর।

রাবাত সেন্ট্রাল জেল থেকে এগারোজন রাষ্ট্রদ্রোহী, যাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল কিন্তু কার্যকরী করা হয়নি, পালিয়ে যায় অদ্ভুত কৌশলে গত মে মাসের তিন তারিখে। ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে রাবাত খুব একটা দূর নয়। আর একটা ঘটনা ঘটে দশ তারিখে, পালার্মো সেন্ট্রাল জেলে। গ্রীক শিপিং ম্যাগনেট ভিনসেন্ট রব তার স্টেপ-ডটারকে খুন করার অপরাধে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পায়, তাকে রাখা হয় পালার্মো সেন্ট্রাল জেলে। দশ তারিখে পালায় সে। তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে পনেরো বিশ দিন পরই আলেকজাণ্ড্রিয়ায় ঘটে আর এক ঘটনা। ওখানকার জেল ভেঙে পালায় সাতজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী এক সাথে। পরিষ্কার মনে আছে রানার, এই একই ধরনের জেল ভাঙার ঘটনা ঘটে পর পর জেদ্দা, পোর্ট সুদান, এডেন, মোম্বাসা এবং ম্যাডাগাস্কারে।

দুয়ে দুয়ে চারের মতই জলবৎ তরলং হয়ে গেল ইয়ান ভ্যান ডকের সাথে জেল ভাঙার সম্পর্ক অনুমান করে নেয়া।

'ভ্যান ডকের ইয়টের নাম ম্যারিনো, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল তাও। 'বৃটিশ রয়্যাল ইয়টগুলোর মত বড়সড়।'

'আর কি জানো তুমি ভ্যান ডক সম্পর্কে, তাও?'

'গোটা তিনেক ফাইভস্টার হোটেলের মালিক। ফারইস্টের প্রায় সব বড় বড় শহরে কোন না কোন ব্যবসা আছে, প্রকাশ্য ব্যবসার ভিতর ভিতর চোরাচালানই আসল ব্যবসা।'

'রুস্তম নামে কাউকে চেনো, কিংবা ইয়াকুব আলি?'

'চিনি না মানে?' তাও বলল। 'দু'জনেই সান চিন চিন-এর লোক।'

খানিক চিন্তা করল রানা। তারপর বলল। 'পর্দা উঠিয়ে দিলে হয় না? সাথে সঙ্গিনী আছে, আলাদা বসেছে ও

'মিসেস রানা?' তাওকে বিস্মিত দেখাল। 'একা বসিয়ে রেখেছেন কেন? লোক দিয়ে এখানে ডেকে পাঠাব?'

'দরকার নেই,' বলল রানা। 'মিসেস নয়, মিস।'

তাও তালি মারল। ফেং ঢুকল ভিতরে।

'পর্দা সরিয়ে দাও।'

পর্দা সরাতে রেস্তোরাঁর সম্পূর্ণ চেহারাটা দেখা গেল। ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। রূপাকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

'কি হলো, মি. রানা?'

রূপাকে টয়লেট থেকে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বেরিয়ে আসতে দেখে মুখের চেহারা থেকে কালো ছায়া সরে গেল রানার। 'না কিছু না,' বলল তাওয়ের দিকে তাকিয়ে। 'তাও, সান চিন চিন-এর একজন লোককে ডাকলে কেমন হয়?'

'ডাকবেন? কেন?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল তাও।

'আলাপ করে দেখা যেত কি ওরা চায়।'

মাথা একদিকে কাত করে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করল তাও। খানিকপর মুখ খুলল। 'উচিত হবে কি? তাছাড়া, কি জিজ্ঞেস করব আমি?'

'তুমি কিছুই জিজ্ঞেস করবে না,' বলল রানা। 'প্রশ্ন যা করার আমি করব। তাছাড়া, রুস্তম আর ইয়াকুব সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা দেখতাম।'

'কিন্তু ওরা একটা বদ মতলবে এখানে ঢুকেছে। আমাদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা নিয়ে বসে আছে। এর মধ্যে আপনাকে আমি জড়াতে চাই না, মি. রানা। যে প্রশ্নই করুন, ওরা ধরেই নেবে আপনি আমাদের শুভানুধ্যায়ী।'

'বাঙালীটা কে জানো?'

'আবরার হোসেন। বাংলাদেশী। ইয়াকুবের সাথে গভীর বন্ধুত্ব আছে। আপনাদের সেই কুখ্যাত পনেরোই আগস্টের পর দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে, ফিরে যাবার মুখ নেই আর। আর চীনাগুলো সান চিন চিন-এর বডিগার্ড। আবরারের সাথে সান চিন চিন-এর সম্পর্ক কি তা আমি জানি না। ইদানীং হয়তো তার চাকরি নিয়েছে।'

রানা বলল, 'কৌতূহল বেড়ে গেল। স্বদেশীর সাথে আলাপ না করে থাকি কিভাবে বলো? ডাকতে পাঠাও ওকে, তাও। দেখা যাক, কি বলে।'

ফেংকে ইঙ্গিতে ডাকল তাও। তাকে নির্দেশ দিতে চলে গেল সে পশ্চিম কোনায়।

'আমার পরিচয় দিয়ো না,' বলল রানা। 'তোমাকে কোন প্রশ্ন না করলে তুমি চুপ করে থাকবে।'

ফেং পৌঁছে গেছে পশ্চিম কোনায়। কথা বলছে সে আবরার হোসেনের সাথে। আবরার চেয়ে আছে গ্রীবা উঁচু করে এদিকে। হাতে টোবাকোর পাউচটা ধরে নাড়াচাড়া করছে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে পাইপটা। মেদবহুল, ভারি চেহারা। খুব আরামে আছে, দেখলেই বোঝা যায়। লোকটার দিকে চোখ রেখে রানা বলল, 'তাও, ওয়াঙ হো কার নাম?'

'ওটা তো সান চিন চিন-এর রেস্তোরাঁ।'

আবরার হোসেন পরামর্শ করছে তার চীনা বন্ধুদের সাথে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে না কিছু, তবে মনে হচ্ছে তর্ক বা ঝগড়া হচ্ছে ওদের মধ্যে।

'চে মারাত্মক একটা বোকামির কাজ করেছে, তাও,' বলল রানা। 'ইয়ান ভ্যান ডকের পেয়ারার লোক সান চিন চিন, তার সম্পর্কে ইয়ানের কাছে সে নালিশ জানাতে গেল কোন্ বুদ্ধিতে?'

'অনেক বুঝিয়েছি, শোনেনি,' তাও বলল। 'শেষ বয়সে বাবা অতিরিক্ত ভীতু হয়ে পড়েছেন। তার ধারণা, ভ্যান ডককে বুঝিয়ে বললেই বুঝবে সে, এবং সান

চিন-চিনকে কঠোর নির্দেশ দেবে আমাদের কোন ক্ষতি না করার জন্যে।'

'হাস্যকর শোনাচ্ছে,' বলল রানা। 'ফিরবে কবে?'

'ঠিক নেই।'

'চে-এর জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার, তাও,' বলল রানা। অনেকটা আপন মনে বলল, 'বিশাখাপট্টমে পৌছুতে পেরেছে তো সে?'

তাও গম্ভীর হয়ে বসে রইল নিঃশব্দে।

আবরার হোসেন চেয়ার ছাড়ছে না। ফিরে আসছে ফেং।

'আসতে চাইছে না,' বলল রানা। 'ভয়ে? না, স্পর্ধা দেখাতে চাইছে?'

তাও বলল, 'ওরা আজ অন্তত ভীত নয়। ভয়ের প্রকাশ এটা নয়।'

আবরার হোসেন ডাকছে ফেংকে। ফেং মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছে আবার।

'কবে রওনা হয়েছে চে?'

'আট তারিখে। সকালের ফ্লাইটে।'

ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকাল রানা। স্পর্শ করল পিস্তলটা।

ফেং আবরার হোসেনের কাছে ফিরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চেয়ে আছে এদিকে। অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। আশপাশের টেবিলের লোকজন সবাই চেয়ে আছে আবরার হোসেন, তার তিনজন চীনা সঙ্গী এবং ফেংয়ের দিকে।

মৃদু কিন্তু দ্রুত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা, 'তোমাদের নিজস্ব লোকজনরা কোথায়?'

'গার্ডদের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আছে তারা,' বলল তাও। 'কেন?'

'গোলমাল হবে বলে মনে হচ্ছে। ফেংকে ওরা দাঁড় করিয়ে রেখেছে দেখতে পাচ্ছ না?' পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা, রাখল সেটা উরুর উপর। 'তোমার কাছে অস্ত্র আছে?'

'পকেটে রিভলভার আছে,' পশ্চিম কোণায় চোখ রেখে বলল তাও। 'ফেংকে চলে আসতে বলব?'

'ফেংকে ওরা আসতে দেবে না,' বলল রানা।

'মি. রানা, বিপদ একটা ঘটবেই এ আমি জানতাম। আমার মনই বলছিল। কিন্তু আপনি চলে যান। আপনাকে আমি জড়াতে দেব না এতে। উঠুন...'

মৃদু হাসল রানা। 'জড়াতে দেবে না বলছ, কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই জড়িয়ে গেছি, তাও। তোমার বাবা আমার বন্ধু। তোমার বিপদ দেখে আমি চুপচাপ চলে যেতে পারি না।'

'কিন্তু...'

'এর মধ্যে তোমার কোন হাত নেই,' বলল রানা। 'আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে আমি চলে যাব না।'

নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। খালি হয়ে যাচ্ছে রেস্তোরাঁ। পানাহার শেষ না করে উঠে পড়ছে সবাই। বেরিয়ে যাচ্ছে দরজা দিয়ে।

'নীল শার্ট পরা ক'জনকে দেখছি,' বলল রানা। 'এরা কারা?'

'গার্ড। আমাদের।'
'সশস্ত্র?'
'হ্যাঁ।' তাওকে দিশেহারার মত দেখাচ্ছে। 'ব্যাপার কি? কি ঘটতে যাচ্ছে? গার্ডদের নির্দেশ দিলেই ফেংকে নিয়ে আসার জন্যে এগোবে ওরা...।'
'বিপদটা কত বড় আকার নিয়ে আসছে ঠিক বুঝতে পারছি না, তাও,' বলল রানা। 'উত্তেজিত হোয়ো না, ধৈর্য ধরো। গার্ডদেরকে ওরা এগোতে দেখলেই গোলাগুলি শুরু করে দেবে এখুনি। আরও খানিক অপেক্ষা করে দেখতে চাই আমি কি ঘটে। মনে হচ্ছে আবরার হোসেনও কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে।'
'কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে সে?'
'বুঝতে পারছি না,' বলল রানা।
'বাবা থাকলে...'
'তোমার বাবার অনুপস্থিতিটাই এই বিপদের কারণ সম্ভবত, তাও। ওদের অপেক্ষা করার ভঙ্গি দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে, যা কল্পনা করা যায় না তেমন কিছু একটা ঘটে গেছে।'

দুই

'কি! কি ঘটতে পারে?'
রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল তাও।
রেস্তোরাঁ প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। কাউন্টারে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবতী আর এক প্রৌঢ়। নীল শার্ট পরা চারজন লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে হলের এদিক সেদিক। প্রত্যেকের পকেটে ঢোকানো রয়েছে হাত। চারজনই নিষ্পলক চোখে চেয়ে রয়েছে তাওয়ের দিকে, যেন নির্দেশের অপেক্ষায়।
ওয়েটাররা ভেগেছে।
কাঁদ কাঁদ মুখে দাঁড়িয়ে আছে ফেং, চেয়ে আছে করুণ দৃষ্টিতে তাওয়ের দিকে।
বাজনার শেষ ধ্বনিও স্তিমিত হয়ে এল। স্টেজ থেকে সরে গেল বাদকের দল। আবরার হোসেন রিস্টওয়াচ দেখছে হাত তুলে।
পিন-পতন স্তব্ধতা।
শান্তভাবে বসে আছে আবরার হোসেন। তার চীনা বন্ধুরা ঝুঁকে পড়েছে তার দিকে। চারটে মাথা একত্রিত। নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে আলোচনা করছে তারা। উত্তেজনা বা ভয়ের কোন চিহ্নই নেই আচরণে।
'বাইরে লোক আছে তোমাদের?'
'দু'জন,' তাও ঢোক গিলল। 'যা হবার আমাদের ওপর দিয়ে হয়ে যাক। আপনারা চলে যান। আমি রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি...।'
রানা নিঃশব্দে হাসল।

রূপার দিকে চোখ পড়তে চিন্তিত হয়ে উঠল ও। উঠে আসতে চাইছে সে। চোখের ইশারায় নিষেধ করল রানা। কিন্তু শুনল না রূপা। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে।

একই সাথে উঠে দাঁড়াল আবরার হোসেন পশ্চিম কোণায়।

'বসে থাকো ওখানেই।' গমগম করে উঠল কণ্ঠস্বর।

শুনল না রূপা। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে। হাই হিলের খট-খট শব্দ নিস্তব্ধতা ভাঙছে। তারপর ছুটল রূপা। কান ফাটানো শব্দ হলো পিস্তলের।

দরজার কাঁচে গিয়ে লাগল বুলেট। দরজা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রূপা রেস্তোরাঁর বাইরে।

আবরার হোসেনের হাতে পিস্তল দেখা যাচ্ছে। রানা চেয়ার ছাড়েনি, তবে হাতের পিস্তলটা সবার অলক্ষ্যে আবরারের দিকে তাক করে ধরে রেখেছে ও।

কিন্তু গুলি আবরার করেনি। করেছে নীল শার্ট পরা চে-এর একজন গার্ড।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে তাও।

'টাকায় সব হয়, তাও,' রানা বলল। 'দল ত্যাগ করেছে ওরা। প্রশ্ন হলো, কেন? শুধুই কি টাকার লোভে? আমার তা মনে হয় না।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না…।'

'সান চিন চিন এবং তার দলের লোকেরা এমন কিছু করেছে, যার ফলে ভয় পেয়েছে গার্ডরা।'

'আপনি বলছেন…'

কথা চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু রূপার কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছে রানা। রূপা যে হঠাৎ এমন কাণ্ড করে বসবে ভাবতে পারেনি ও। অন্যদিকে, বিপদের গুরুত্বটা অনুধাবন করে ও এইরকমও ভাবছে, যদি নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে এলাকা থেকে, তাহলে ভালই হয়। কিন্তু পুলিসে না খবর দিলেই হয় এখন।

তাও বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার দিকে।

রানা বলল, 'ওরা জানে তোমার বাবা গোয়েন্দা বিভাগের একজন স্থানীয় ইনফরমার, তার গায়ে হাত দিলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে। জানা সত্ত্বেও সান চিন চিনের লোকেরা এমন বেপরোয়া হয় কিভাবে?'

বুঝতে না পেরে তাও চেয়ে রইল বোকার মত।

রানা বলল, 'চে ভুল করেছে। তার উচিত ছিল আঁটঘাট বেঁধে এগোনো। নিজের তার যাওয়াই উচিত হয়নি ইয়ান ভ্যান ডকের কাছে। সে কি পুলিসকে জানিয়ে গিয়েছিল?'

'না।'

তাওয়ের কথা শেষ হতেই ঠাস-ঠাস করে পিস্তলের দুটো গুলি হলো বাইরে।

রূপা? মেরে ফেলা হলো ওকে? দরজার দিকে তাকিয়ে রইল রানা। তীর বেগে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে ওর…হো-হো হাসির শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে পশ্চিম কোণায় তাকাল ও।

ওর দিকে তাকিয়ে তিন চীনা হাসছে।

ঘড়ি দেখছে আবরার হোসেন। একটু অধৈর্য মনে হচ্ছে ওকে।

আরও মিনিট পাঁচেক কাটল নিঃশব্দে। কিছুই ঘটল না। তারপর কানে এল যান্ত্রিক শব্দ। একটা ট্রাক এসে থামল রেস্তোরাঁর বাইরে।

আবরার হোসেন উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল তার সঙ্গীরাও গার্ড চারজন দাঁড়িয়ে আছে নিজের নিজের জায়গায়। প্রত্যেকের হাতে রিভলভার।

এক ঝটকায় খুলে গেল দরজা। চার পাঁচজন চীনা ধরাধরি করে একটা লম্বা কাঠের বাক্স নিয়ে এল ভিতরে। তাদের সাথে স্টেন হাতে ঢুকল আরও একজন।

বাক্সটাকে নিয়ে আবরার হোসেনের দিকে এগোচ্ছে লোকগুলো, আবরার হোসেন আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল তাওয়ের দিকে।

দলটা ঘুরল। এগিয়ে আসছে।

উরুর উপর থেকে পিস্তলটা তুলে নিল রানা। আড়াল করেই ধরে রাখল সে। ফিসফিস করে বলল, 'তাও, যাই ঘটুক, মাথা গরম কোরো না। আমার কাছ থেকে ইঙ্গিত না পেয়ে গুলি কোরো না, যদি বাঁচতে চাও।' একটু রূঢ় শোনাল রানার কথাগুলো।

আবরার হোসেন আর তার সঙ্গীরা এগিয়ে আসছে দলটার পিছু পিছু। ফেং দাঁড়িয়ে আছে সেই একই জায়গায়।

বাক্সটা রাখা হলো ওদের কাছ থেকে দু'হাত দূরে। কার্পেটের উপর। লোকগুলো বাক্সটা নামিয়ে পিছিয়ে গেল। এগিয়ে এল সামনে আবরার হোসেন আর তার তিন সঙ্গী।

কোমরে এক হাত রেখে, অপর হাতে ধরা পিস্তলটা ঘোরাতে ঘোরাতে আবরার বলল, 'তাও, বাক্সের ভিতর কি আছে জানো?'

তাও চেয়ে রইল। জবাব দেবার সাহস নেই তার।

'তুমি কে?' আবরার তাকাল রানার দিকে। 'চে-এর সাথে কি সম্পর্ক?'

'রানা বলল, 'চে কে?'

'চে কে চেনো না?'

রানা এদিক ওদিক মাথা দোলাল, 'না। আমি তাওয়ের কাছে এসেছি...'

রানাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আবরার জানতে চাইল, 'আসার কারণ?'

রানা বলল, 'সেটা গোপনীয়। বলা যাবে না।'

'বাংলাদেশ থেকে এসেছ?'

'না। আমি এখানেরই লোক!'

'কি কাজ?'

'বললাম তো গোপনীয়।'

'ফেংকে পাঠিয়েছিলে কেন?'

'আমি পাঠাইনি, তাও পাঠিয়েছিল।'

'কেন, তাও?' আবরার তাকাল তাওয়ের দিকে। অনবরত ঘুরছে তার হাতের পিস্তল।

তাও বলল, 'তোমাদের ভাবগতিক দেখে সন্দেহ হচ্ছিল, তাই।'

'কি সন্দেহ হচ্ছিল?'

'উদ্দেশ্য খারাপ।'

একজন চীনা বিরক্তির সাথে বলল: 'আবরার ছোড়ো ইসব।'

আবরার ইঙ্গিত করতে তার সঙ্গীরা বাক্সটা খোলার জন্যে হাত লাগাল।

'ভাল করে দেখো, তাও। দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো।'

আবরার হাসছে।

ডালাটা তোলা হতেই দেখা গেল লাশটা।

রানার ভয় হচ্ছিল, তাও বুঝি ঝট্ করে ওর দিকে তাকাবে। কিন্তু এতটুকু নড়ল না তাও। নিহত বাবার মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে বসে রইল সে। মূর্তির মত।

'চলো, আবরার।' কে যেন বিদঘুটে উচ্চারণে নিস্তব্ধতা ভাঙল।

'তাও,' বলল আবরার কঠিন ভঙ্গিতে। 'বুঝতেই পারছ সান চিন চিন চীনাপাড়ার লিডার হতে চাইছেন। শেষ কাঁটাটা ছিল তোমার বাবা। কাঁটাটা উৎপাটনের সাথে সাথে সান চিন চিন এখন চীনাপাড়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি চান না তুমি এ-পাড়ায় থাকো। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিতে রাজি হয়েছেন তিনি। অর্থাৎ আগামীকাল রাত দশটার পর তোমাকে যেন এ-এলাকায় দেখা না যায়।' সঙ্গীদের দিকে ফিরল আবরার। 'চলো হে।'

চলে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ আবরার, তাকাল রানার দিকে।

'তোমাকে আমরা কিছু বললাম না। কিন্তু এদিকে যদি কখনও দেখি, তোমার বাপের অবস্থাও ওইরকম করে ছাড়ব।' বাক্সে শোয়ানো চে-এর লাশটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল আবরার। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়াল।

ধীরে সুস্থে গুলি করল রানা দরজার দিকে। স্টেনধারী চীনাটা দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ, হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেল। তারপর কি হলো দেখবার সুযোগটা নিল না রানা। পরপর এদিক ওদিক চারটে গুলি করল ও দ্রুত।

টুঁ শব্দটি হলো না কারও গলা থেকে, অন্ধকার হয়ে গেছে রেস্তোরাঁ। সবগুলো বালব গুঁড়িয়ে দিয়েছে রানা।

আলো থাকতেই দেখে নিয়েছিল ও দরজার দিকে যাবার পথটা। তাওকে নিয়ে নিঃশব্দে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। পথে কুড়িয়ে নিল শত্রুর স্টেনটা।

কেউ নড়ছে না ভিতরে, ফিসফিস করে কথা বলছে আবরারের লোকজন। শুয়ে পড়েছে সবাই কার্পেটের উপর।

তাওয়ের কানে কানে কথা বলল রানা। রিভলভারটা হাতে নিয়ে ক্রল করে এগোল তাও। দরজা খুলতেই আলোর মৃদু আভা ঢুকল ভিতরে। সেই সাথে গর্জে উঠল কয়েকটা পিস্তল।

পিস্তলের অবস্থান লক্ষ্য করে স্টেন চালালে কমপক্ষে তিনজনকে স্তব্ধ করে দেয়া যায়। কিন্তু আবরার বা তার সঙ্গীদের প্রাণ কেড়ে নেবার কোন ইচ্ছা হলো না রানার। এদের সংখ্যার সীমা নেই, টাকা দিলেই এদেরকে ভাড়ায় পাওয়া যায়, মেরে কূল পাওয়া যাবে না। খতম করতে হবে হোতাগুলোকে যারা এদেরকে তৈরি করে।

টেবিলের আড়াল থেকে রানা অনুমান করল আবরারের দল অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে। দরজার দিকে আসবে না তারা। বেরিয়ে যাবার আর একটা পথ হলো

স্টেজ। স্টেজে উঠে বাঁ পাশ দিয়ে বেরিয়ে পৌঁছুনো যায় একটা প্যাসেজে, ব্যাকডোরটা শেষ মাথায়। কিন্তু সেদিকে যেতে হলে দরজার কাছাকাছি দিয়ে এগোতে হবে।

পাঁচ মিনিট পর আলোর মৃদু আভা ঢুকল আবার। তাও ফিরে আসছে ক্রল করে। পিস্তলের শব্দ আশা করছিল রানা, কিন্তু নিরাশ হলো ও।

আবরার সাবধান হয়ে গেছে। গুলি অপচয় করতে চাইছে না সে।

রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে তাও বলল, 'মিস রূপা অপেক্ষা করছেন গাড়ি নিয়ে। পুলিসে খবর দিয়েছেন তিনি···।'

রানা বলল, 'সর্বনাশ!'

'এ বরং ভালই হয়েছে,' তাও বলল। 'ব্যাকডোর ভাঙতে দশ মিনিট সময় লাগবে ওদের। সামনের দরজায় আমি আছি। আপনি চলে যান। পুলিস পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে। আমার কোন ভয় নেই। বাবার লাশ দেখেই তারা বুঝে নেবে সব।'

তর্ক করল না রানা। তাওকে বিপদে ফেলে যাচ্ছে না ও। তবু জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তারপর? পুলিস চলে গেলে? পারবে তুমি টিকতে?' তাওয়ের কাঁধে মৃদু চাপড় দিল রানা।

'সে প্রশ্ন ওঠে না,' তাও বলল। 'আমি যত তাড়াতাড়ি পারি মায়ের কাছে চলে যাব।'

'স্টেনটা রইল। আনা ওয়াঙকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো। দরজা ছেড়ে নোড়ো না তাও, কোনরকম অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ো না।' ক্রল করে এগোল রানা।

বাইরে বেরিয়ে উঠে দাঁড়াবার আগে চারদিক ভাল করে দেখে নিল রানা। দুটো নীল শার্ট পরা লোক মরে পড়ে আছে। একধারে আলোকিত এলাকাটা অতিক্রম করল ও হামাগুড়ি দিয়ে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

গাড়ির শব্দ। জীপ আসছে। বাজারের দিকে ছুটল রানা। পিছন থেকে স্টেনের শব্দ ভেসে আসছে। সাবধান করে দিচ্ছে তাও শত্রুদের।

যা আশা করেছিল, তাই। বাজার এলাকাটা সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে গেছে। একটা কুকুর বিড়াল পর্যন্ত নেই কোথাও। আলোকিত জায়গাটা পেরিয়ে গেল রানা। অন্ধকার গলিতে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। জুতোর শব্দ! কেউ ছুটে আসছে বাজারের দিক থেকে।

অন্ধকার গলি ধরে ছুটল রানা। অনেকগুলো বাঁক। পঞ্চমবার বাঁক নেবার পর রানা উপলব্ধি করল রাস্তা ভুল করে ফেলেছে ও। পঞ্চমবার বাঁক নেবার পরই গাড়িটা দেখতে পাবার কথা ওর। তার বদলে দীর্ঘ, আলোকিত, সরু একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে ও।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার মানে শত্রুদের সুযোগ করে দেয়া। জোড়া পদধ্বনি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

ছুটল রানা আবার। কিন্তু শেষ মাথায় পৌঁছুনোর আগেই ধাওয়ারত লোক দু'জন দেখতে পাবে ওকে।

গলির মাঝামাঝি জায়গায় একটা দরজা। কবাটে গা ঠেকিয়ে আড়াল করল ও

নিজেকে। পিস্তলের নলটা বের করে রাখল বাইরে, তারপর উঁকি দিয়ে তাকাল।

বাঁক নিচ্ছে, ছুটে আসছে লোক দু'জন। সাদা ঘোমটার মত দেখাচ্ছে রুস্তমের মাথার ব্যাণ্ডেজটা। সঙ্গের লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি রানা, একজন চীনা।

হাতটা আরও একটু বাড়িয়ে গুলি করল রানা।

ডাইভ দিয়ে গলির উপর পড়ল রুস্তম, দেখাদেখি তার সঙ্গীও, পিস্তল বা রিভলভার কিছুই নেই ওদের হাতে। স্বস্তি অনুভব করল রানা।

দরজার কবাট থেকে পিঠ সরিয়ে নিতে যাবে, খুলে গেল কবাট দুটো। পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াবার আগেই লোহার মত দুটো হাত জড়িয়ে ধরল পিছন থেকে ওকে। একই সাথে আরও দুটো হাত এগিয়ে এল অজ্ঞাতস্থান থেকে। রানার মাথার চুল ধরল খামচে একটা, অপরটা ধরল পিস্তল ধরা হাতটা।

ধস্তাধস্তি করে লাভ নেই বুঝতে পেরে ছেড়ে দিল রানা নিজেকে ওদের হাতে। দরজার ভিতর টেনে হিঁচড়ে ঢোকানো হলো ওকে। পিস্তলটা কেড়ে নিল ওরা। পিছন থেকে লাথি খেয়ে পাঁচিলের গায়ে পড়ল রানা। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, চারজন হোঁৎকা চেহারার চীনা।

চারজন মিলে ধরল ওকে, শূন্যে তুলল। তারপর বস্তার মত ছুঁড়ে মারল দরজা দিয়ে বাইরে গলির দিকে। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

পিস্তলটা উপার্জন করল চীনাগুলো।

এই বিচিত্র ঘটনায় রানার হাসি পেলেও অবকাশ মিলল না হাসবার। ব্যাপার অনুমান করে উঠে পড়েছে রুস্তম ও তার সঙ্গী। শিকারী কুকুরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে দু'জন, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দেখল রানা।

দৌড়াল আবার।

গলিটার তিন মাথায় পৌঁছে মুহূর্তের জন্যে থামল রানা। অন্ধকার বাঁ দিকের আর একটা গলিতে ঢুকল ও। গোলকধাঁধার ভিতর জড়িয়ে ফেলছে নিজেকে সে, বুঝতে পেরেও করার কিছু নেই।

আরও চার-পাঁচবার বাঁক নেবার পর দৌড় থামাল ও। পিছনের শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দিতে পেরেছে অন্তত। পিছনে তাদের কোন সাড়া শব্দ নেই।

মাইল খানেক দৌড়েছে, অনুমান করল রানা। বোকা মনে হলো নিজেকে। পথ ভুল করা উচিত হয়নি ওর। রূপার কথা ভেবে অস্থিরতা অনুভব করল নিজের ভিতর।

সামনে আরও একটা বাঁক। তেমাথা। ক্লান্ত পায়ে বাঁক নিয়ে বাঁ দিকে তাকাতেই দূরে, গলির শেষ মাথায় অ্যামব্যাসাডরকে দেখতে পেল ও। হাঁটার গতি বেড়ে গেল সেই সাথে।

গলিটা মৃদু আলোকিত। অ্যামব্যাসাডর পঁচিশ গজ দূরে তখনও, নাকটা দেখা যাচ্ছে শুধু। পিছনে কি মনে করে তাকাতেই দেখল দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রুস্তম।

ঝট করে বসে পড়ল রানা। হুমড়ি খেয়ে পড়ল রুস্তম ওর পিঠের উপর। গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে যাবে রানা, পাঁজরে লাথি খেয়ে গড়িয়ে গেল ও তিন হাত।

লাফিয়ে বুকের উপর এসে চেপে বসল চীনাটা। রুস্তম উঠে দাঁড়িয়ে গলির দু'দিক দেখে নিয়ে পকেট থেকে বের করল ছোরাটা। রানার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল সে।

চীনাটা রানার গলা চেপে ধরেছে দু'হাত দিয়ে। হাত দুটোকে সরাবার জন্যে ব্যস্ত রানা। ঘাড় নাড়াতে পারছে না ও। রুস্তম ঝুঁকে পড়ল পিছন থেকে। ছোরার হাতলটা মুঠো করে লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করছে সে রানার একটা চোখে ডগাটা গেঁথে দেবার জন্যে।

শিউরে উঠল রানা।

সবেগে নেমে এল ছোরাটা। এক পাশে সরিয়ে নিল রানা মাথাটা। চুলের ভিতর দিয়ে নেমে গেল ছোরার ডগা, কানের পাশ দিয়ে খুলির চামড়ায় লম্বা দাগ কেটে মাটিতে গেঁথে গেল।

বোবা রুস্তম গ্ গ্ করে গালাগালি করল চীনাটাকে। রানার গলা ছেড়ে দিয়ে চীনাটা দু'হাত দিয়ে সাঁড়াশির মত চেপে ধরল ওর মাথাটা। রানার হাত দুটো দু'জন মিলে চেপে ধরে দেহের পাশে লম্বা করে দিল। চীনাটা দু'পা দিয়ে চেপে ধরল হাত দুটো। ছোরা তুলেছে আবার রুস্তম।

প্রায় নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে ঘটনাটা।

ভাঁজ করা হাঁটু তুলে এনে চীনাটার বুকের পাশে লাথি মারল রানা, টলে উঠল শত্রু কিন্তু স্থানচ্যুত করা গেল না তাকে। আবার গ্ গ্ করে উঠল রুস্তম। লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না সে।

রাগে অন্ধ চীনাটা মাথা ছেড়ে দিয়ে দু'হাত একত্রিত করে প্রচণ্ড আঘাত করল রানার মুখে। মাথাটা সরিয়ে নিয়ে ভারসাম্য হারাতে সাহায্য করল রানা তাকে, হাত দুটো এক টানে পায়ের নিচ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রুস্তমের নাকে ঘুষি মারল ও।

মুখের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে চীনাটা। ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে গড়িয়ে দু'হাত দূরে সরে গেল রানা। উঠে বসতে যাবে, দেখল ছোরাটা নেমে আসছে বুকের উপর। হাত তুলল ও। খপ্ করে ধরল কব্জিটা।

কান ফাটানো গুলির আওয়াজ শোনা গেল। রুস্তমের ছোরা ধরা হাতের কব্জিটা ছেড়ে দিতে যাবে রানা, দেখল রুস্তম চেয়ে আছে বোবা দৃষ্টিতে ওর দিকে। কপালহীন দুটো চোখ। চোখের উপর কিছু নেই। তাজা লাল রক্ত আর মগজ গলগল করে বেরিয়ে এল, ঢাকা পড়ে গেল চোখ দুটো।

চীনাটার ছুটন্ত পদশব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বুকের উপর রক্ত আর হলুদ মগজ নিয়ে উঠে বসল রানা। দাঁড়াল।

পাঁচ হাত দূরে ছোট্ট একটা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে রূপা।

শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে পা বাড়াল রানা। রূপার সামনে গিয়ে তার একটা হাত ধরে হেঁচকা টান মারল, 'এখানে আর এক সেকেণ্ডও নয়।'

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা।

তিন

'আমি নিকোলাসের কথা ভাবছি,' বলল রানা। 'চারদিন আগে ইয়াকুব তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ইয়টটার গতিবিধি সম্পর্কে এক্ষুণি খোঁজ খবর করা দরকার। কোন সন্দেহ নেই আমার, নিকোলাস ম্যারিনোয় আছে।'

পরদিন সকাল। শাওয়ার সেরে এইমাত্র ব্রেকফাস্ট শেষ করেছে ওরা। কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা। উঠে গিয়ে ওয়ারড্রোব থেকে লেদার ব্যাগটা বের করে আনল রূপা।

'রূপা, তুমি আজ ঢাকায় ফিরে যাচ্ছ।'

'ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি? কেন?' ব্যাগটা খোলা হলো না তার।

'অ্যাসাইনমেন্টটা ব্যর্থ হতে চলেছে, এটুকু অন্তত বুঝতে পারছ তো?' গম্ভীর হয়ে বলল রানা। 'গতরাতের ঘটনাটা বিপদ বাড়িয়ে দিয়েছে আরও। পুলিসের কানে সব কথাই উঠবে। তারা এখন শিওর, তৌফিক আজিজ এই শহরেই আশ্রয় নিয়েছে। ইয়াকুবও মরিয়া হয়ে উঠবে রুস্তমের খুন হবার খবর পেয়ে। ওদিকে, তাওয়ের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিস যাবে সান চিন চিনকে ধরতে। ধরা সে পড়বে না, আমার বিশ্বাস। পালাবে। পালিয়ে সে যাবে কোথায়? ইয়ান ভ্যান ডকের কাছে, সম্ভবত। ভ্যান ডক আমার খবর পাবে। আমি যে তৌফিক আজিজ নই একথা সে জানে। নিকোলাসকে আমি ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করব, বুঝতে অসুবিধা হবে না ওদের। সাবধান হয়ে যাবে ওরা। গভীর সমুদ্রে গিয়ে পড়বে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তার মানে, নিকোলাসকে বাগে পাওয়ার আর কোন উপায় থাকবে না। তবু, আমি শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই। কিন্তু সাথে তুমি থাকলে ঝামেলা বাড়বে, আমি ফ্রীলি মুভ করতে পারব না।'

'কিন্তু রানা, গতরাতে যা ঘটেছে তারপর ফ্রীলি মুভ করা তোমার পক্ষে আর সম্ভব নয় এ শহরে,' রূপা বলল। 'তুমি বাইরে বেরুলে ধরা পড়ে যাবে পুলিস বা ইয়াকুবের দলের হাতে। দুটো দলই তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।'

অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা, 'নামটা জানলে কি ভাবে?' পরমুহূর্তে নিজেই আবিষ্কার করল ও। 'বুঝেছি! তাও গতরাতে বলেছে তোমাকে।'

বিস্ময়টা বাড়ল বৈ কমল না। রাতেই জেনেছে রূপা ওর আসল পরিচয়। অথচ তার মধ্যে এতটুকু পরিবর্তন লক্ষ করেনি ও। দুটো মধুর কথা নয়, পাঁচ সেকেণ্ডের মুগ্ধ দৃষ্টি নয়—সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিল তার হাবভাব। অথচ, মাসুদ রানা নামটি একটি কিংবদন্তীর মত, এটা তারই সংলাপ। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল রানা, কোন ভাবান্তর নেই। ব্যাগ খুলে ভিতরে হাত নাড়ছে। ভাবটা যেন অনেকটা এই রকম, মাসুদ রানা হও আর লাট সাহেব হও, আমি কেয়ার করি না!

রানা বলল, 'কিন্তু তুমি থাকলে সুবিধে হচ্ছে কিছু?'

'হচ্ছে,' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল রূপা। 'নিকোলাসকে ফেরত পাবার

অ্যাসাইনমেন্টে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। এই মুহূর্তে তোমার বাইরে বের হওয়া উচিত হবে না। সব কাজ আমাকে করতে হবে। শত্রুপক্ষ আমাকে ভাল করে চেনে না এখনও।' ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। 'টাকা'।'

প্যাকেটটা লুফে নিয়ে জানতে চাইল রানা। 'কত আছে?'

'বিশ হাজার।'

প্যাকেট খুলে একশো এবং পাঁচশো টাকার নোট বের করল রানা। 'এক্সচেঞ্জ করার ঝামেলা পোহাতে হবে দেখছি।'

রূপা বলল। 'আমাকে তো বেরুতেই হবে বাইরে, তখনই বদলে আনব।'

'বাইরে যাবে কেন?'

'ফোন করতে হবে ঢাকায়,' বলল রূপা। 'এই হোটেল থেকে করতে চাই না।'

কথা উঠতেই ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল ফোনটা।

রিসিভার তুলল রূপা, কানে ঠেকিয়ে শুনল, বাড়িয়ে দিল সেটা রানার দিকে। 'তাও।'

'রানা বলছি,' রিসিভার কানে ঠেকাল রানা। 'খবর কি তাও?'

'সান চিন চিনকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিস। আব্বার হোসেন সহ অন্য সবাইকেও। মি. রানা, আপনাকে একটা জরুরী খবর দেবার জন্যে ফোন করছি...'

'বলো, তাও।'

'আবদুর রউফ খান নামে কাউকে চেনেন?'

চেপে ধরল রানা আরও জোরে রিসিভারটা। 'চিনি, কেন?'

'ম্যারিনোয় আছে সে। এইমাত্র সান চিন চিনের ডান হাত আমাকে বলে গেল। লোকটা এসেছিল দয়া ভিক্ষা করতে, তার নাম যেন পুলিসকে না জানাই...।'

'আর কে আছে ইয়টে?'

'আর কারও কথা সে বলতে পারেনি,' বলল তাও। 'ইয়টে ওঠেনি সে। শুধু পৌঁছে দিয়ে এসেছে খান আবদুর রউফ খানকে।'

'ধন্যবাদ, তাও,' বলল রানা। 'তোমার জন্যে আমার কি করার আছে বলো এবার।'

'আপনার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, মি. রানা,' তাও বলল। 'না, করার কিছু নেই। আজই আমি চলে যাচ্ছি জাপানে। মায়ের ঠিকানাটা রাখবেন? যদি কখনও জাপান যান...'

'ঠিকানাটা বলো, তাও।'

তাও ঠিকানা বলতে লিখে নিল রানা। 'তোমার মাকে আমার সমবেদনা জানিয়ো, তাও,' কথাটা বলে ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও।

রূপা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

'খান আবদুর রউফ খান আছে ভ্যান ডকের ম্যারিনোয়। এই লোকটা সম্পর্কে সম্ভব হলে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তোমাকে, রূপা,' বলল রানা। 'আরও কাজ

আছে তোমার। ম্যারিনো কবে নোঙর তুলবে জেনে আসতে হবে তোমাকে। সবচেয়ে বড় কাজ, নিকোলাস ম্যারিনোয় আছে কিনা পজিটিভলি জানতে হবে।'

দু'ঘণ্টা পর ফিরল রূপা। খবর নিয়ে এল, ম্যারিনো আজ ভোর বেলা মাদ্রাজ পোর্টের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। নিকোলাস ম্যারিনোয় আছে কিনা জানতে পারেনি ও। ওদিকে, ঢাকায় বেলায়েত হোসেন খানের কোন পরিবর্তন নেই, কঠোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাল্লা দিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে।

বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। 'মাদ্রাজ? ম্যারিনো মাদ্রাজের দিকে যাচ্ছে? কিন্তু বিশাখাপট্টম থেকে সিঙ্গাপুরের দিকে টার্ন নেবার কথা তার।'

রূপা বলল, 'কেন যাচ্ছে না সেদিকে তা জানি না।' একটু থেমে বলল, 'মাদ্রাজে যাওয়া যেতে পারে। যাবে?'

রানা বলল, 'দমদম এয়ারপোর্টে প্যাসেঞ্জারদের চেয়ে পুলিসের ভিড় বেশি হবে বলে আশঙ্কা করছি আমি।'

'তোমাকে আমি ঠিকই আড়াল করে নিয়ে যেতে পারব,' ভরসা দিল রূপা।

কারও মনে সন্দেহের ঢেউ না তুলে নিরাপদে এয়ারপোর্টের ভিতর ঢুকল ওরা। পোর্ট কাস্টমস এবং পুলিস অফিসারদের চোখের সামনে রানাকে এক হাত দিয়ে শরীরের সাথে লেপ্টে ধরে চারদিকে হাসির ঝঙ্কার তুলে এগোল রূপা।

ছোট বিভার বিমান, রূপাই পাইলটের ভূমিকা নিল। মিনিট পনেরো ধরে রেডিও-টকের পর স্টার্ট নিল বিভার। চে রেস্তোরাঁয় রূপার সিগারেট ফোঁকার ভঙ্গিটা মনে পড়ে গেল রানার ওকে প্লেন চালাতে দেখে। মেয়েটার এটা আর এক গুণ, যাই করে, ভঙ্গি নিয়ে করে।

রিজ হোটেলে উঠল ওরা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে সোফায় বসতে বসতে রানা বলল, 'হারবার মাস্টারকে ফোন করে জেনে নাও।'

হারবার মাস্টার অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানালেন, হ্যাঁ, ম্যারিনোকে আশা করছেন তিনি। মি. ইয়ান ভ্যান ডক রেডিও মারফত জানিয়েছেন রিফুয়েলিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে। না, ইয়ট কখন ভিড়বে বন্দরে তা তিনি সঠিক বলতে পারছেন না, তবে কমপক্ষে দিন দুই বন্দরে থাকবে।

রূপা রিসিভার রেখে দিতে রানা লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। 'ইয়টে উঠতে হবে আমাকে। সেজন্যে প্রস্তুতি দরকার।'

'প্রস্তুতি মানে?'

'ম্যারিনো সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। যদি...'

'ব্যবস্থা করছি,' বলল রূপা। 'হাতের কাছে টেলিফোন থাকতে চিন্তা কি!'

খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পর্দা সরিয়ে তাকাল বাইরে। মাদ্রাজ বন্দর নগরী। চারদিকে ব্যস্ততা। নিচে প্রশস্ত মাহাত্মা গান্ধী রোড। রিকশা, ঠেলাগাড়ি, ট্রাক আর প্রাইভেট কারের ব্যাপক প্রদর্শনী মেলা বসেছে যেন।

অন্যমনস্কভাবে রূপার কথা শুনছে রানা। সংবাদসংস্থাগুলোর সাথে

যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে সে। মাঝে মাঝে তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে রানা মনে মনে একটা হাইপথিসিস খাড়া করার চেষ্টা করছে ও। ওর ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে কোন সন্দেহ নেই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে, নিকোলাস যত বড় হুমকিই হোক, নিকোলাসের চেয়ে অনেক বড় শত্রু এই খান আবদুর রউফ খান।

গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল রানা, রূপার কথায় উঠে এল বাস্তবে।

'এখনকার মত যতটুকু সম্ভব, যোগাড় করছি,' রূপা বলল। 'সকালে বাকিগুলো সংগ্রহ করব।'

সোফায় এসে বসল রানা। রূপা তার নোট বইটা খুলল। পাতার পর পাতা শর্টহ্যাণ্ডে লেখা নোট দেখল রানা।

'আগে কোন্‌টা? ইয়ট, না খান?'

'ইয়ট।'

চোখের সামনে নোটবুক তুলল রূপা, 'নাম ম্যারিনো। ডিজাইনড বাই পার্কার, বিল্ট বাই ক্লিল্যাণ্ডস। ইয়ান ভ্যান ডক সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কেনে, ম্যারিনোর বয়স তখন মাত্র দু'বছর, ডিজাইনটির প্রচলিত নাম পার্কার-ক্লিল্যাণ্ডস। গুরুত্বপূর্ণ এটা, কেন তা পরে বলছি। ওভারঅল লেংথ,—১১১ ফিট, বিম—২২ ফিট, ক্রুজিং স্পীড—১২ নটস, স্পীড ফ্ল্যাট আউট—১৩ নটস। ৩৫০ হর্স পাওয়ারের দুটো রোলস-রয়েস ডিজেল ইঞ্জিন আছে তার। এইসব তথ্যই জানতে চাইছ তো?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল। 'রেঞ্জ কতটুকু তাও জানতে চাই।'

'এখনও জানতে পারিনি,' বলল রূপা। 'তবে খবর আসবে বলে আশা করছি। সাতজন ক্রু—স্কিপার, ইঞ্জিনিয়ার, কুক, স্টুয়ার্ড এবং তিনজন সী-মেন। আটাশ জনের অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা আছে।'

'অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা কি রকম?'

'কাল সকালে জানতে পারব। ম্যারিনোর সিস্টার শিপের প্ল্যান কয়েক বছর আগে ছাপা হয়েছে। প্ল্যানটার ছবি তুলে ইটালী থেকে বেতারে পাঠানো হবে মাদ্রাজের রয়টার অফিসে। ওখান থেকে উদ্ধার করে আনব আমি, সাথে ম্যারিনোর ছবিও থাকবে।'

'চমৎকার,' বলল রানা, 'এবার আগে খান পরে খানের কথা কিছু শোনাও।'

'ঢাকা বলছে, কোথায় তিনি আছেন তা কেউ জানে না।'

'আমরা জানি।'

রূপা বলে চলল, 'গত বছর দু'বার এবং চলতি বছরের প্রথম মাসে একবার ইনি হংকং গেছেন, দেশের একজন অন্যতম শিল্পপতি এবং ইমপোর্টার হিসেবে নিজস্ব ব্যবসার সুযোগ সুবিধে বৃদ্ধি করার জন্যে। হংকং-এর স্টীল কিং কোম্পানীর সাথে যৌথ উদ্যোগে একটা ইস্পাত মিল এবং দা রয়েল ইন্টারন্যাশনাল হোটেল কোম্পানীর সাথে যৌথ উদ্যোগে একটা পাঁচ তারা হোটেল তৈরির জন্যে তিনি সরকারের কাছ থেকে আনুমতি চেয়েছেন এবছর। মজার কথা কি জানো, হংকং-এর ওই দুটো কোম্পানীরই চেয়ারম্যান হলো ইয়ান ভ্যান ডক।'

'আর কিছু?'

'নিকোলাসকে তার মন্ত্রণালয়ে চাকরি দেন ইনি, প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন।

নিকোলাসের চাকরি পাওয়াটা ছিল অবৈধ। কোনরকম পরীক্ষা ছাড়াই তাকে নিযুক্ত করা হয় রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের হেড এবং অ্যাডভাইজার হিসেবে। নিকোলাসের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ তুলেছিলেন এক ভদ্রলোক, খান সাহেব তার চাকরি খান। এদিকে তৌফিক আজিজ এবং নিকোলাস জেল থেকে পালাবার পর ইনিই সবচেয়ে বেশি শোরগোল শুরু করেন। সরকারকে শ্বেতহস্তী, জেলখানাকে মামার বাড়ি বলে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি।'

চুপ করে রইল রানা ঝাড়া তিন মিনিট। তারপর বলল, 'নিকোলাস সম্পর্কে কি করতে হবে জানি। কিন্তু বিভীষণকে নিয়ে কি করব আমি?'

রূপা বিছানার মাঝখানে কোল-বালিশ লম্বা করে রেখে পাঁচিল তৈরি করল, বলল, 'টপকালে পুলিস ডাকব।'

রাত্রে ভাল ঘুম হলো না রানার। নিকোলাসের কথা যত না ভাবছে ও, তার চেয়ে বেশি ভাবছে খান আবদুর রউফ খানের কথা। সন্দেহাতীত ভাবে যদি প্রমাণ হয় লোকটা দেশের শত্রু কি অ্যাকশন নেবে ও?

লোকটার প্রভাব তো আর কম নয়। অনেকেরই ধারণা পরবর্তী সুযোগে ক্ষমতায় আসছে ওদেরই দল। এরকম একটা আশা ছড়িয়ে আছে বলেই মস্ত হৈ-চৈ শুরু হয়ে যাবে লোকটার বিরুদ্ধে কিছু করা হলেই।

দিনের প্রথম টেলিফোন কল করল রূপা, মাদ্রাজের হারবার মাস্টার জানালেন, ম্যারিনো খানিক আগে নোঙর করেছিল, তাড়াহুড়ো করে ফুয়েল নিয়ে আবার রওনা হয়ে গেছে। কলম্বো বন্দর তার গন্তব্যস্থান।

'আবার হারালাম!'

রূপা বলল, 'হারালাম বলা যায় না। চারদিন পর কোথায় সে পৌঁছুবে তা আমরা জানি।'

'জানার মধ্যে কতরকমের ভুল থাকতে পারে তা ভেবে দেখেছ?' বিরক্তি প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে। 'গভীর সমুদ্রে গিয়ে যদি কোন সাবমেরিন বা ট্রলারে তুলে দেয় নিকোলাসকে ডক? কিংবা ইতিমধ্যেই আর কেউ যদি কিনে নিয়ে থাকে নিকোলাসকে?'

রূপা বলল, 'হ্যাঁ, সে ভয় আছে।'

'নিকোলাস ম্যারিনোয় আছে কিনা তাও আমরা সঠিক জানি না। অনুমান করছি মাত্র।' রানা পায়চারি শুরু করল। 'এমনও তো হতে পারে, কলম্বোর দিকে যাচ্ছি বলে আসলে ডক হয়তো যাচ্ছে সিঙ্গাপুরের দিকে? সত্যি কথা বলতে কি, ম্যারিনো কলম্বোর দিকে যাচ্ছে একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'কেন?'

'ওদিক থেকে এসেছে সে, ফিরছিল হেডকোয়ার্টারের দিকে। চট্টগ্রাম পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছে বিশাখাপট্টমে, সেখান থেকে মাদ্রাজে। এই ফিরে আসাটার একটা যুক্তি আছে। চট্টগ্রামে ভিড়েছিল নিকোলাসকে তুলে নেবার জন্যে। যে-কোন কারণেই হোক, তা সম্ভব হয়নি। বিশাখাপট্টমে সেটা সম্ভব হয়। এরপর মাদ্রাজে নোঙর করেছিল। কেন?'

'কেন?' রানার প্রশ্নই উচ্চারণ করল রূপা।

'সম্ভবত নিকোলাসকে কারও হাতে তুলে দেবার জন্যে,' রানা বলল। 'কিন্তু মাদ্রাজে এত অল্প সময় কাটিয়েছে, কোনরকম আদান প্রদানের ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে?'

'মাদ্রাজে নোঙর করার উদ্দেশ্যটা হয়তো নির্ভেজাল রিফুয়েলিং,' বলল রানা। 'কিংবা, এমনও হতে পারে, ভ্যান ডক আমার সম্পর্কে মোটামুটি প্রায় সবই জানে, জানে আমি কি ভাবছি, কি আমার উদ্দেশ্য এবং তাই সে আমাকে ধোঁকা দেবার জন্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে পশ্চিম দিকেই তার গন্তব্যস্থান, আসলে গভীর সমুদ্রে পৌঁছে বাঁক নিয়ে চলে যাবে সে পুব দিকে। আমি পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকব বোকার মত, যখন ফাঁকিটা ধরতে পারব তখন সে হংকং-এ, সাফল্যের আনন্দে অট্টহাসি হাসছে।'

রূপা বলল, 'কিংবা এমনও তো হতে পারে, কলম্বো থেকে আরও কয়েদী কালেক্ট করার ইচ্ছা আছে তার?'

'অসম্ভব নয়।' চিন্তিত দেখাল রানাকে।

'নিকোলাসকে হস্তান্তর করবে কোথায় সেটা যদি···।'

'আমার বিশ্বাস, হস্তান্তরটা জটিল না হয়ে পারে না। দর কষাকষির ব্যাপার আছে। আকাশচুম্বী দাম হাঁকবে ভ্যান ডক। তাছাড়া, ম্যারিনোয় আরও কয়েদী আছে। এদের সবাইকে নিরাপদ কোথাও নামিয়ে দিতে হবে তার। হংকং বা ম্যাকাও ছাড়া তেমন নিরাপদ জায়গা আর আছে সারা দুনিয়ায়? নিজের হেডকোয়ার্টারে বসে দর কষাকষি করাও সহজ হবে তার পক্ষে।'

'নিকোলাসের সম্ভাব্য খরিদ্দার কে হতে পারে?'

রানা বলল, 'ঠিক বলতে পারব না। যে-কেউ হতে পারে।' গম্ভীর হয়ে উঠল রানা, মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে রিপিট করল শেষ কথাটা। 'যে-কেউ!'

রূপাই বেরুল বাইরে। রয়টারের কার্যালয় থেকে বড় সাইজের দুটো এনভেলাপ নিয়ে ফিরে এল ও ঘণ্টা দুয়েক পর।

এনভেলাপ খুলে অনেকগুলো রেডিও ফটো আবিষ্কার করল রানা। তার মধ্যে দুটো ভ্যান ডকের।

ইয়ান ভ্যান ডক চীনা বংশোদ্ভুত হলেও চেহারাটা তার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। নাকটা প্রায় খাড়া। লম্বা মুখ। কাঁধ দুটোকে বৃষস্কন্ধ হিসেবে স্বীকার করল রানা মনে মনে। লম্বাতেও সে হার মানিয়েছে সাধারণ চীনাদেরকে। প্রায় ছয়ফুট। লোকটার চেহারার মধ্যে ক্রিমিন্যালের ছাপ নেই, বরং মার্জিত, অভিজাত ভদ্রলোক বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। এ লোককে দেখামাত্র চিনবে রানা।

অন্যান্য ছবির মধ্যে রয়েছে, দূর থেকে তোলা ম্যারিনোর একটা ছবি। আর একটা ম্যারিনোর সিস্টারশিপের প্ল্যান-এর।

ম্যারিনোর ইঞ্জিনরুমের সামনে মালিকের জন্যে নির্দিষ্ট একটা ডবল-কেবিন। পিছন দিকে তেরোটা, ছাব্বিশজন প্যাসেঞ্জার বা গেস্টের জন্যে। ক্রুরা থাকে ইয়টের সামনের দিকে, স্কিপার ছাড়া। সে থাকে হুইল হাউসের পিছনে, মাস্টার্স

কেবিনে।

ম্যারিনোর প্রত্যেকটা অংশ, প্যাসেজ, দরজার ছবি স্মৃতিতে গেঁথে নিল রানা। ইয়টে ওঠার পর যেন পথ খুঁজে সময় নষ্ট করতে না হয়।

'এরপর? কি করা?'

'কলম্বোয় যাব আমরা,' বলল রানা। 'তোমার বিভার পারবে নিয়ে যেতে?'

'পারবে।'

'তবে আর সমস্যা কি?'

হাতে প্রচুর সময় থাকায় রূপাকে ঢাকায় পাঠাল রানা। বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে মেজর জেনারেলের মতামত জানতে চায় সে।

পরদিন সন্ধ্যায় ফোন করল রূপা। 'সমুদ্রে ম্যারিনোকে দেখেছি আমি।'

'তাই নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'কোন্‌দিকে চলেছে?'

'সোজা পুব দিকে। কলম্বো যাওয়ার ব্যাপারটা ভাঁওতা।'

'অর্থাৎ সিঙ্গাপুরেই রিফুয়েলিঙের জন্যে থামবে,' রানা বলল। 'তোমাকে দেখেনি তো?'

'পাঁচ হাজার ফিটের ওপর থেকে দেখেছি আমি, মেঘও ছিল ঘন।'

'বেলায়েত সাহেব কেমন আছেন?'

'আগের চেয়ে ভাল, তবে এখনও সেনসলেস। দু'মিনিটের জন্যে কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ দেয়া হয়েছিল আজ আমাকে। রানা?'

'বলো।'

'মেজর জেনারেলের সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি।'

রানা চুপ করে কান পেতে রইল।

'এয়ারপোর্টেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে আমাকে—দেখা করার চেষ্টা যেন না করি।'

'কারণ?'

'জানি না।'

চিন্তা করে কূল পেল না রানা। রূপা কি চিহ্নিত হয়ে গেছে শত্রুদের কাছে? সেজন্যেই এই অস্বাভাবিক সাবধানতা মেজর জেনারেলের? হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে আসতেই অনেক কিছু পরিষ্কার দেখতে পেল যেন রানা।

'রূপা?'

'কি?'

'আচ্ছা, বড়দার কি খবর বলতে পারবে?'

'বড়দা? সে আবার কে?'

'যার দোকান লোপাট করে জেলে গিয়েছিলাম।'

'ওহ্-হো…কেন? দিব্যি দোকান চালাচ্ছে দু'ভাই মিলে।'

'কি বিক্রি করছে দোকানে? সবই তো সাফ করে দিয়েছিলাম আমি।'

'কেন, তুমি জানো না? সবই তো ফেরত দেয়া হয়েছে ওদের। তুমি জেলে যাওয়ার পর চার কিস্তিতে সমস্ত লুটের মাল ফেরত দেয়া হয়েছে ওদের গোপনে।'

প্রথম কিস্তিতে?'

'নগদ টাকা। দ্বিতীয় কিস্তিতে সোনার বারগুলো। তৃতীয় কিস্তিতে ফেরত দেয়া হয়েছে দামী স্টোনগুলো। আর চতুর্থ কিস্তিতে…।'

'অলঙ্কারগুলো। এবং সেই সাথে ডোবানো হয়েছে আমাকে!' রাগত কণ্ঠে বলল রানা।

'ঠিক বুঝলাম না,' রানার হঠাৎ চটে ওঠার কারণ বুঝতে পারল না রূপা। 'তুমি কি ভেবেছিলে ডাকাতি করেছ বলে অলঙ্কারগুলো তোমার…'

'তা ভাবিনি। ভাবছি মেয়েমানুষ হয়ে তুমি কি করে এই ভুল করলে?'

'কি ভুল? হেঁয়ালী রেখে একটু পরিষ্কার করে…'

'গহনাগুলো তুমি দেখেছিলে? অন্তত একবার নিশ্চয়ই…'

'দেখেছি।'

'ওর যে কোন একটা যদি আবার দেখো, চিনতে পারবে?'

'পারব।'

'তুমি একবার দেখেই চিনতে পারবে। আর ওই দোকানের সেলসম্যানরা? যারা প্রতিদিন দশ-বারো ঘণ্টা নাড়াচাড়া করছে ওসব গহনা—কি করে ভাবলে যে ওরা চিনতে পারবে না?'

ঝাড়া দুই মিনিট চুপ করে থাকল রূপা। তারপর ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'সত্যিই। ভুল হয়ে গেছে। অমার্জনীয় ভুল। চুরি হয়ে যাওয়া অলঙ্কার সব ফিরে গেল দোকানে, মালিক পক্ষ চুপ করে থাকবে ঠিকই, কিন্তু সেলসম্যানদের কি গরজ পড়েছে এমন তাজ্জব কারবার দেখেও মুখ বন্ধ রাখবার? কানাঘুষো হতে হতে চাপা থাকেনি আর ব্যাপারটা।'

'শুধু আমার সম্পর্কেই নয়, বড়দা কিংবা ছোড়দাকে তিন দাবড়ি দিয়ে তোমাদের সম্পর্কেও জেনে নিয়েছে ওরা অনেক কিছুই। তার ফলশ্রুতি হচ্ছে খান মজলিশ সাহেবের অ্যাকসিডেন্ট। তুমিও বিপদমুক্ত নও, রূপা। শুধু বিপদগ্রস্তই নও, বিপজ্জনকও হয়ে দাঁড়িয়েছ হেড অফিসের জন্যে।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

'কি করব এখন, রানা?'

'কাম ব্যাক টু মি!' কানেকশন কেটে দিল রানা।

রানার হাতে প্লেনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল রূপা।

দীর্ঘ এবং একঘেয়ে ফ্লাইট। নিচে সাগর ছাড়া দেখবার কিছুই নেই। কদাচ ছোটখাট দু'একটা দ্বীপ চোখে পড়ে কি পড়ে না। ইয়ট বা কোন জাহাজ দেখল না রানা।

ঘণ্টায় দেড়শো মাইল গতিবেগ বিভারের। ম্যারিন্যের চেয়ে বারো গুণ বেশি।

নিচে নিকোবরগুলোকে দেখা যেতে ঘুম থেকে জাগাল রানা রূপাকে, 'কত ঘুমাও?'

'তো কি করব,' বোঝা গেল ঘুমাচ্ছিল না সে, কিংবা, খানিক আগে ঘুম ভেঙেছে।

'আমরা সিংহ শহরে নামব,' বলল রানা।
'সিংহ শহর?'
'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'সিঙ্গাপুরা। সিঙ্গা মানে লায়ন অর্থাৎ সিংহ, পুরা মানে সিটি অর্থাৎ শহর। কোথাকার কোন এক প্রিন্স তুমাসেকে নেমে একটা জানোয়ার দেখে ভুল করে ভেবেছিল ওটা বুঝি সিংহ, ব্যস, অমনি সে নাম দিয়ে দিল সিংহ শহর। পুরার আকার বাদ গেছে, বাকি সব ঠিকই আছে। সিঙ্গাপুর।'
'পাণ্ডিত্য আছে তোমার!' ব্যঙ্গ করল রূপা।
'লে বাবা' বিকৃত করল রানা কণ্ঠস্বর। 'কাশলেও যদি প্রশংসা করো তাহলে তো দেখছি মুখে তালা মেরে রাখতে হবে।'
এয়ারপোর্টে প্লেন নামতে চারদিকে মিলিটারি গিজগিজ করতে দেখে গম্ভীর হয়ে উঠল রানা।
রূপা হাসতে হাসতে কন্ট্রোল প্যানেলের একটা কমপার্টমেন্ট থেকে নতুন একটা পাসপোর্ট বের করল।
'তোমার জন্যে এনেছি। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট। কাস্টমসে আটকাবে না, যদি তোমাকে তৌফিক আজিজ বলে চিনতে না পারে।'
নামল ওরা। ফিল্ড মাস্টার এবং চীফ অপারেশন্যাল এঞ্জিনিয়ারের সাথে দু'মিনিট কথা বলল রূপা। কাস্টমস অফিসার রানার হাত থেকে পাসপোর্টটা নেবার সময় খোলাখুলি নির্লজ্জতা প্রকাশ করল রূপার দিকে খাইখাই দৃষ্টি রেখে। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সিভিল ড্রেস পরা এক ভদ্রলোক। গলা বাড়িয়ে পাসপোর্টটা দেখলেন তিনি। গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়ল সশব্দে। 'স্বাগতম, স্বাগতম!'
তিন মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিল ওরা।
হ্যাভলক রোডের অ্যাপোলো রেস্তোরাঁয় থামল ট্যাক্সি। রিসেপশনে গিয়ে ডবল-রুম ভাড়া করল রানা ষাটটি সিঙ্গাপুরী ডলার দিয়ে। এলিভেটরে চড়ে ছয় তলায় উঠল। রুমে ঢুকে বিদায় করে দিল পোর্টারকে।
'গলা ভেজাতে যাচ্ছি নিচের বারে,' রানা বলল। 'মেয়েলি কাজগুলো সেরে নেমে এসো তুমিও।'
'এভাবে অর্ডার করবে না,' সাবধান করে দিল রূপা। 'স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকছি না আমরা এখানে।'
ওয়ারড্রোবে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রেখে বারে নেমে এল রূপা পনেরো মিনিট পর। ওয়েটারকে ডেকে রূপার জন্যে ড্রাই মার্টিনি এবং নিজের জন্যে আরও একটা বিয়ার দিতে বলল রানা।
রূপা বলল, 'ভ্যান ডক পৌঁছুলে তোমার কাজ কি হবে?'
'খোঁজ নেব ম্যারিনোয় নিকোলাস আছে কিনা।'
'যদি থাকে? ধরো, আছে।'
'চেষ্টা করব নামিয়ে আনতে।'
'কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়?'
শ্রাগ করল রানা। সিগারেট ধরাল, 'বিকল্প নির্দেশও দেয়া হয়েছে আমাকে, তুমি জানো।'

রূপা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'খান সাহেবের ব্যাপারে কি করতে চাও তুমি?'

'এখনও ভেবে ঠিক করতে পারিনি। যা ভাল বুঝব করব।' রানা প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'রয়্যাল সিঙ্গাপুর ইয়ট ক্লাবের মেম্বার সম্ভবত ডক। এখানে সে প্রায়ই আসে। যে-ধরনের শৌখিন মানুষ, মেম্বার না হওয়াটাই আশ্চর্য। মেম্বার হলে ম্যারিনোকে ওখানেই ভিড়াবে সে।'

'কোথায় সেটা?'

'এখান থেকে আধ মাইলটাক।'

রূপা বলল, 'সেক্ষেত্রে চলো এখুনি একবার দেখে আসি জায়গাটা।'

বারের বিল মিটিয়ে দিয়ে রোদে বেরিয়ে এল ওরা।

ইয়ট বেসিনের উপর কত রকম বিচিত্র টাইপের বোট ভাসছে ছোট বড়, যন্ত্র-চালিত, পালতোলা। দেখতে দেখতে এক সময় ঘাড় ফেরাল রানা।

'পাকা চত্বর দেখতে পাচ্ছ?' বলল ও। 'কোল্ড ড্রিঙ্ক সাপ্লাই দিচ্ছে যেখান থেকে। ওখানে বসে সুন্দর দেখা যাবে গোটা বেসিনটা।'

'একটা টেলিফোন করা দরকার। ওই চত্বরে বসে একটু অপেক্ষা করো। আমি আসছি এখুনি।' রানাকে রেখে কেটে পড়ল রূপা।

বোটগুলো দেখতে দেখতে চিন্তায় ডুবে গেল রানা। ম্যারিনো কোথায় ভিড়বে অনুমান করার চেষ্টা করল ও। সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইয়টে চড়া সম্ভব হবে কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন। রাত নামা পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করে···

রূপা ফিরে এসে বসল মুখোমুখি বেতের চেয়ারে, 'আগামীকাল সকাল এগারোটায় ম্যারিনোকে আশা করছে হারবার মাস্টার। রেডিও মেসেজ শীট দেখে বলল আমাকে।'

'গুড,' রানা বলল। 'বাকি সময়টা কি করব আমরা?'

'সাঁতার কাটবে?'

'খুব মুডে আছ, দেখছি? মনে হচ্ছে ছুটি উপভোগ করতে এসেছ সিঙ্গাপুরে।'

'জীবনটাই ছুটি, যদি তৈরি করে নিতে জানো,' দার্শনিক হয়ে উঠল রূপা রানাকে অবাক করে দিয়ে।

সুতরাং মার্কেটিং করতে রওনা হলো ওরা। টাওয়েল এবং একজোড়া জার্মান-মেড ডিউটি-ফ্রী বিনকিউলার কেনা হলো। রূপার জন্যে কেনা হলো সুইমিং কস্টিউম।

সৈকত থেকে দূরে একটা দ্বীপ দেখা যায়। রানা বলল, 'ওটা ইন্দোনেশিয়ার একটা দ্বীপ।'

মুখ ভেঙচে 'সবজান্তা' বলেই সাঁতরে দূরে সরে যেতে লাগল রূপা।

পিছন ফিরে না তাকিয়েও রূপা ধরে নিল রানা ওকে ধাওয়া করে আসছে ধরার জন্যে।

খানিকপর তাকাতে নিরাশ হলো ও। না তো! আসছে না রানা কিন্তু···দেখাও যাচ্ছে না ওকে কোথাও।

পেটে সুড়সুড়ি লাগল রূপার। পরমুহূর্তে পানির নিচে থেকে অক্টোপাশের মত

জড়িয়ে ধরল ওকে রানা।

ইয়ট বেসিনে জলকেশী। সন্ধ্যা উতরে যেতে অ্যাপোলো হোটেলে রক-অ্যাণ্ড-রোল। গভীর রাত পর্যন্ত কিং অ্যাণ্ড কুইন নাইট ক্লাবের স্বপ্নিল পরিবেশে শ্যাম্পেন। তারপর হোটেল কামরায় ফিরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একে অপরের চোখের দিকে চাওয়া। চোখের ভাষা বুঝে নিয়ে ধাপের পর ধাপ ডিঙিয়ে অন্তরঙ্গতা। চমৎকার কাটল ক'টা দিন। এবং রাত।

ব্যালকনিতে পাশাপাশি ওরা। দূরে দেখা যাচ্ছে ইয়ট বেসিন। দু'জনের চোখেই সানগ্লাস, চেয়ে আছে বেসিনের দিকে। কখনও রানার হাতে বিনকিউলার, কখনও রূপার হাতে। ওরা তৈরি হয়ে আছে দেখবার জন্যে, কিন্তু ম্যারিনোর দেখা দেবার মর্জি হয়নি এখনও।

কথা নেই দু'জনের কারও মুখে। বলবার আছেই বা কি! ম্যারিনোর উপস্থিতি ছাড়া প্ল্যান পরিকল্পনা করা বৃথা।

রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে গা। লোনা সামুদ্রিক বাতাসে শীত শীত লাগছে। খারাপ লাগছে না রোদের নরম প্রলেপ। সময় বয়ে যাচ্ছে ফুরফুরে বাতাসের মত। বিনকিউলার চোখে তুলে দেখছে রূপা। নর্থ মোল আর ডিটাচড মোল-এর মাঝখান দিয়ে একটা বোট আসছে হারবারের দিকে।

'আমার মনে হয় ওটাই ম্যারিনো।'

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল রানা, দু'বার খুক খুক করে কাশতে হলো ওকে। রূপার হাত থেকে বিনকিউলার নিয়ে চোখে তুলল ও।

খুঁটিয়ে মিনিটখানেক দেখল রানা। বলল, 'সম্ভবত। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঠিক ঠিক জানা যাবে।'

ইয়টটা কাছে সরে আসছে ক্রমশ। লেজের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোককে দেখতে পাচ্ছে এখন রানা। বৃষস্কন্ধ। ইঞ্চিখানেক কম ছয় ফিট নিশ্চয়ই, পুরো ছয় ফিট না হলেও।

'ঠিক বলেছ,' বলল ও। 'ম্যারিনো এবং ভ্যান ডক।' ইয়টের গায়ের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দেখল রানা বিনকিউলার ঘুরিয়ে। নিকোলাস বা খানের কোন ছায়া নেই। নিকোলাসকে দেখতে না পাবারই কথা, ডক তাকে মূল্যবান সম্পদের মত হেফাজতে রেখেছে। কিন্তু খান? সে কোথায়?'

তীর থেকে বেশ অনেকটা দূরে নোঙর ফেলল ম্যারিনো। সাদায় কালোয় প্রাণচঞ্চল অভিজাত রাজহাঁস যেন একটা, পানিতে ভাসছে আপন মহিমায়।

সাতজন ক্রু ছাড়াও ডজন দু'আড়াই গেস্ট আছে ম্যারিনোয়, অনুমান করল রানা। কিন্তু ডেকে যাদেরকে দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে কাউকে গেস্ট মনে হলো না ওর। ফোরডেকের হোয়েস্টিং মেশিনের সামনে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে, একজন লক্ষ রাখছে নোঙরের শিকলের দিকে। দু'জন বোট নামাচ্ছে পানিতে।

'তীরে ক'জন আসে লক্ষ রেখো। হিসেবটা পরে কাজে লাগতে পারে।'

হোয়েস্টিং মেশিন ছেড়ে দু'জন অ্যামিডশিপে চলে এল। ফোল্ডিং সিঁড়িটা নামিয়ে দিল নিচের দিকে। দু'জনের একজন নেমে গেল তরতর করে নিচে, বোটের

দায়িত্ব নিল সে।

ভ্যান ডককে দেখা যাচ্ছে না এখন। খানিকপর ডেকে আবার তাকে দেখা গেল, সাথে পিকক্যাপ মাথায় স্যুট পরা এক লোক, জোকারের হুবহু প্রতিবিম্ব। চিনতে অসুবিধে হলো না রানার খান আবদুর রউফ খানকে। তরতর করে নেমে যাচ্ছে ওরা বোটে।

এঞ্জিন স্টার্ট নিল। চওড়া জায়গা নিয়ে অর্ধবৃত্ত রচনা করল বোট, তারপর সরল রেখার মত ছুটে চলল পানির উপর দিয়ে। ইয়ট বেসিনের দিকে আসছে।

তীরে নেমে ক্লাবে ঢুকল ভ্যান ডক খানকে সাথে নিয়ে। বোট ফিরে যাচ্ছে ম্যারিনোর দিকে।

রূপা হাত রাখল রানার কাঁধের উপর, 'দেখো!' অপর হাত তুলে দিক নির্দেশ করল ও।

সেদিকে তাকাতে রানা দেখল বড় একটা ওয়ার্ক-বোট মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সোজা ম্যারিনোর দিকে।

'হুঁ।'

'ওটা একটা ফুয়েলার,' বলল রূপা। 'ম্যারিনোয় ফুয়েল আর ওয়াটার সাপ্লাই দিতে যাচ্ছে। কাজ সেরে তড়িঘড়ি কেটে পড়তে চায় ইয়ান।'

'কপাল মন্দ,' বলল রানা। 'ভেবেছিলাম রাত পর্যন্ত থাকবে। দিনের বেলা ওতে চড়া সম্ভব নয়।'

'নিকোলাস কোথায়?'

'তাকে দেখতে পাবার কথা নয়,' রানা বলল। 'ভ্যান ডকের তাড়াহুড়োর মধ্যেই ইয়টে নিকোলাসের অস্তিত্ব প্রমাণ হচ্ছে। কতক্ষণ লাগবে ফুয়েল নিতে কে জানে।'

'ঘণ্টাখানেক তো বটেই।'

'যথেষ্ট সময়। চলো, একটা বোট ভাড়া করতে হবে।'

হোটেল রিসেপশনের একজন কেরানীর মাধ্যমে এক সিঙ্গাপুরী লঙশোরম্যানের কাছ থেকে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ রেটে বোট ভাড়া নিয়ে হারবারে ভাসল ওরা।

ম্যারিনো এবং ফুয়েলার এখন দম্পতির মত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যিখানে হোসপাইপ। রিফুয়েলিং তদারক করছে একজন ইউরোপীয়ান, সম্ভবত এঞ্জিনিয়ার সে। ডেক দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে গেল দীর্ঘকায় আরেক লোক, এও ইউরোপীয়ান।

'ক্যাপ্টেন?' রূপা প্রশ্ন করল।

কাছাকাছি পৌঁছে থ্রটল ডাউন করল রানা এঞ্জিনের। স্টারবোর্ডের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজের মত দূর দিয়ে ছুটছে বোট।

'ভ্যান ডক কমিউনিজমের শত্রু,' বলল রানা। 'নিকোলাসকে সে মুক্ত করেছে। প্রশ্ন হলো, ক্যাপিট্যালিস্ট না কমিউনিস্ট, কার কাছে বিক্রি করবে সে নিকোলাসকে? নাকি, নিকোলাসকে নিঙড়ে ইনফরমেশনগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করবে সে? ভ্যান ডক যদি ভাবে নিকোলাস মানুষ হিসেবে একটা পণ্য, আবার নিকোলাসের কাছে যে ইনফরমেশন আছে সেটা আর একটা পণ্য, ভুল করবে কি সে?'

'না'।'

'তার মানে, দুটো ব্যবসা করতে পারে ভ্যান ডক,' বলল রানা। 'আমার বিশ্বাস, ব্যবসা যে দুটো রয়েছে এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তার আছে। এবং কোন ব্যবসাই হাতছাড়া করার লোক সে নয়।'

'অর্থাৎ?'

'নিকোলাসের মরণদশা। কোথাও কূল পাবে না ও।' ম্যারিনোর স্টার্নের দিকে যাচ্ছে বোট। ইয়টের সর্বশেষ গেস্টরুমের পোর্টগুলোয় এই দিনে দুপুরে পর্দা ঝুলছে দেখে চোখ আটকে গেল সেদিকে রানার। রুমের দরজাও বন্ধ।

'নিকোলাস কোথায় আছে অনুমান করতে পারছি।'

থ্রটল উন্মুক্ত করে তীরে ফিরে আসার সময় রানা দেখল ম্যারিনো থেকে আবার তীরের দিকে ছুটছে সেই বোটটা।

পিছিয়ে রইল ওরা। তীরে ভিড়ল ম্যারিনোর বোট। মালিককে বোট ফেরত দিয়ে সাগরের দিকে তাকাতে রানা দেখল ভ্যান ডক আর খানকে। দু'জনকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে বোট ম্যারিনোয়।

এক ঘণ্টা পর ম্যারিনোকে মুভ করতে দেখে রানা ঘুসি মারল বাঁ হাতের তালুতে।

'যাচ্ছে কোথায় শুনি?'

'যাচ্ছে না, পালাচ্ছে। মাসুদ রানার ভয়ে!'

ব্যঙ্গ করল রূপা। আবার বলল, 'এখান থেকে যাবে সম্ভবত ম্যানিলায়। ওখানে শেষবার ফুয়েল নেবে। তারপর...'

'পৌঁছে যাবে হেডকোয়ার্টারে,' রানা বলল। 'প্র্যাকটিক্যালি আওতার বাইরে। যা করার এর মধ্যেই করতে হবে। আগে জানতে হবে, ম্যানিলায় যাচ্ছে কিনা।'

রূপা বলল, 'ইয়টটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে ডুবে যায়, তবেই আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট সাকসেসফুল হবার সম্ভাবনা। তাছাড়া সাফল্যের আর কোন উপায় দেখছি না।'

খবর নিতে গিয়ে নিশ্চিতভাবে জানা গেল, ম্যারিনোকে ফুয়েল নেবার জন্যে ম্যানিলায় নোঙর করতে হবে।

'আরও চার পাঁচ দিন ছুটি,' বলল রূপা। 'ম্যানিলায় কি ঘটতে পারে?'

'জানি না,' চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'এখনও আমি জানি না তিনটে বিষফোঁড়া অপারেশন করব কিভাবে।'

চার

তিন দিনের সময় হাতে নিয়ে ম্যানিলায় পৌঁছুল ওরা। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থাকায় ঝামেলা হলো না সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল বা ম্যানিলা এয়ারপোর্টে।

অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কৃত্রিম হলেও ম্যানিলা অত্যন্ত ব্যস্ত বন্দর। প্রথম দিনটা হারবারের দিকে ঘেঁষলই না রানা। প্রায় সারাদিন একা একা ওল্ড টাউন চষে বেড়াল। হোটেলে যখন ফিরল, কাঁধে দুটো চামড়ার ব্যাগ।

হ্যারল্ড রবিনসের সদ্য লোনলি লেডি পড়ছিল রূপা। মুখ তুলে দেখল, ওয়ারড্রোবের ভিতর চামড়ার ব্যাগ দুটো ভরছে রানা।

'ও কি?'

নির্বিকার দেখাল রানাকে। বলল, 'কিছু না।'

চেয়ে রইল রূপা। ওয়ারড্রোবের কবাট বন্ধ করে সোফায় এসে বসল রানা হেলান দিয়ে, সিগারেট ধরাল। দু'পা তেপয়ে তুলে লম্বা করে বিছিয়ে দিয়ে পাশে তাকাল, 'লোনলি লেডীর সাথে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পাচ্ছ কিছু?'

রূপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সশব্দে।

প্রশংসা করল রানা, 'চমৎকার হয়েছে উত্তরটা!'

কিন্তু হাসল না রূপা।

'স্কুবা ইকুইপমেন্ট ভাড়া করে রেখে এসেছি,' বলল রানা। 'কাল সকাল থেকে আমরা পানির নিচেই আস্তানা গাড়ব।'

আক্ষরিক অর্থে প্রায় তাই-ই দাঁড়াল ব্যাপারটা। পরের ক'টা দিন দিনের বেলাটা পানিতেই কাটল ওদের। আর সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সময় কাটল নাইট ক্লাবে।

সেদিন সকালে ভ্যান ডকের পৌঁছুবার কথা। ব্রেকফাস্ট শেষ করার পর রূপা বলল, 'কিভাবে কি করবে?'

'লিমপেট মাইন দরকার,' বলল রানা। 'যোগাড় করা সম্ভব?'

'ম্যানিলায়? না।'

'বিকল্প কিছু দরকার সেক্ষেত্রে, কি হতে পারে সেটা?'

'রশি।' চামড়ার ব্যাগ দুটোয় কি আছে লুকিয়ে দেখে নিয়েছে রূপা

'ঠিক। কিন্তু ওই জিনিসটার ভদ্র একটা নাম আছে। নাইলন কর্ড।'

'কত ফিট আছে ব্যাগে?'

'দুটো ব্যাগে দুশো ফিট।'

'কি করবে ওগুলো তা কিন্তু বলোনি এখনও।'

'বলব,' কথা দিল রানা। 'তার আগে এসো, পরিস্থিতিটা ভাল মত বুঝে নেয়া যাক।'

'হারবার মাস্টারকে জিজ্ঞেস করতে হবে ম্যারিনো ঠিক কখন ভিড়বে।'

'হ্যাঁ। সিঙ্গাপুরের ঘটনাটা রিপিট হোক এখানেও তা আমি চাই না,' বলল রানা। 'এখান থেকে ম্যারিনো যদি মুভ করে, পরবর্তী সময় নিকোলাসকে দেখা যাবে হংকং বা ম্যাকাওয়ে। এবং হংকং ও ম্যাকাও হলো যথাক্রমে ভ্যান ডকের ডান ও বাঁ হাতের তালু। তার মুঠোর মধ্যে আটকা পড়তে চাই না আমরা, তাই না?'

'চাই,' রূপা বলল, 'না।' প্রশ্ন করল ও, 'ম্যারিনো যদি দিনের বেলাই আসে এবং দিন থাকতে থাকতেই ফুয়েল নিয়ে আবার মুভ করে, করবার কি থাকতে

পারে আমাদের?'

'গ্র্যাণ্ড হারবারের মধ্যিখান, সময়টা কটকটে দুপুর, ম্যারিনোয় অনুপ্রবেশ করে নিকোলাসকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'বিকল্পটা কি?' নিজেই প্রশ্নটার উত্তর দিল ও। 'নিকোলাসকে রাতেও ধরে রাখতে হবে বন্দরে।'

'কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব?'

'নাইলন্ কর্ড দিয়ে তা সম্ভব,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'তার আগে সঠিক খবর চাই, ভ্যান ডক আসছে কখন।'

হোটেল ছেড়ে রাস্তায় নেমে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল ওরা। পোর্ট-বিল্ডিঙের ভিতর আধঘণ্টা কাটিয়ে আবার নামল রাস্তায়, সাথে দুঃসংবাদ: ম্যারিনো ভিড়বে দুপুর দুটোয়। আরও দুঃসংবাদ, ভ্যান ডক ইতিমধ্যেই ফুয়েলিংশিপ বুক করেছে রেডিও মারফত। ম্যারিনো ভেড়ার সাথে সাথে ফুয়েলার এগিয়ে যাবে ফুয়েল সাপ্লাই দেবার জন্যে।

বোঝা গেল, একটি মিনিটও অপব্যয় করতে চাইছে না 14-K.

হোটেলে ফিরে এল ওরা। রূপা বলল, 'এবার বলো প্ল্যানটা কি?'

গল্প শোনাবার ভঙ্গিতে শুরু করল রানা।

'আমি ইন্দোনেশিয়ায় অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছিলাম একবার,' সিগারেট ধরিয়ে শুরু করল রানা। 'আমার জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তগুলোর একটি হলো, ওই অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যভাগে আমি একটা ছোট লঞ্চ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, আমাকে ধাওয়া করছে দ্রুতগতিসম্পন্ন একটা পেট্রল বোট, যার উপর শোভা পাচ্ছিল একটা ২০ মিলিমিটার কামান। কাছে পিঠে ম্যাংগ্রোভে ঢাকা কর্দমাক্ত জল দেখে শেলটারের জন্যে তার ভিতর ঢুকে পড়ি আমি—ভয়ঙ্কর একটা ভুল ছিল সেটা। সী-উয়িড ছিল অসম্ভব, প্রপেলার শ্যাফটের চারদিকে জড়িয়ে যায় সেগুলো, আটকা পড়ে যায় লঞ্চ।'

'তারপর কি ঘটল?'

'সেটা এখনকার আলোচ্য বিষয় নয়,' বলল রানা। 'সেই লঞ্চটির চেয়ে ম্যারিনো যেমন আকারে বড়, তেমনি সী-উয়িডের চেয়ে কয়েক শ'গুণ শক্ত এবং মজবুত হলো নাইলন কর্ড। বুঝলে রূপা, স্কুবা ডাইভের অভিজ্ঞতা এবং অতীত স্মৃতির সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্তটি নিয়েছি আমি। ম্যারিনো নোঙর করা মাত্র আমরা পানির নিচে দিয়ে ওর কাছে চলে যাব। দুটো প্রপেলার শ্যাফটকেই কর্ড দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে আসব। ফলাফল কি হবে জানি না। ম্যারিনো অচল হতেও পারে, নাও পারে। তবে বাজি ধরতে রাজি হলে আমি বলব, ম্যারিনো আটকা পড়বে। এ ব্যবস্থার অনুকূল দিক হচ্ছে, প্রচুর সময় নষ্ট করে ওরা তেলমাখানো পুরানো কর্ড আবিষ্কার করলেও এটা যে একটা ষড়যন্ত্রের অংশ তা অনুমান করতে পারবে না। যে কোন বন্দরে জাহাজ ভিড়লে এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে। নাইলন কর্ড প্রায়ই পড়ে যায়, ফেলেও দেয়া হয় বাতিল হলে।'

'মন্দ নয়,' স্বীকার করল রূপা। 'প্রপেলার কর্ড-মুক্ত করতে কতক্ষণ লাগবে ওদের?'

'এঞ্জিন চালু করলে কর্ড এঁটে বসবে, জড়িয়ে যাবে আরও পোক্তভাবে,' বলল রানা। 'আশা করছি, সারারাত লাগবে।'

হোটেলের সুইমিংপুলে স্কুবা গিয়্যার পরীক্ষা করে দেখা হলো কার্যকারিতা, পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে। অক্সিজেন বটল দুটো সম্পূর্ণ ভরা কিনা তা আগেই দেখে নিয়েছে রানা।

হোটেল থেকে বেলা সাড়ে বারোটায় বন্দরে পৌঁছুল দু'জন। পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। এখন প্রতীক্ষার পালা।

গরম বাতাস দিচ্ছে সারাক্ষণ, সেই সাথে উত্তেজনাকর অপেক্ষা—আলাপ বা রসিকতার মনোভাব দেখা গেল না কারও মধ্যে। সময় যত ঘনিয়ে আসছে বদলে যাচ্ছে চেহারা, কমে আসছে নড়াচড়া, অস্পষ্ট হয়ে আসছে শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। সেই থেকে বাড়ছে পালসের স্পন্দন। ওদের চোখে বদলে যাচ্ছে বন্দরের চেহারা।

ম্যারিনোর দেখা নেই। রিস্টওয়াচের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না রানা। শেষবার দেখেছে আড়াইটা বাজে। তারপর কত মিনিট পেরিয়ে গেছে, অনুমান করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো ও।

রূপার হাতটা ঘামে ভেজা, অনুভব করল রানা। রূপা ওর ঘড়ি পরা হাতটা তুলে নিয়ে সময় দেখল।

'পৌনে তিনটে।'

উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে রানাকে। ম্যানিলাকে পাশ কাটিয়ে ম্যারিনো সোজা হংকং-এর দিকে এগোচ্ছে কিনা ভাবছে সে। তা যদি হয়…ভাবতে পারল না ও আর কিছু।

সোয়া তিনটের সময় ঈদের চাঁদের মত দেখা গেল ম্যারিনোকে। সাবলীল হংসবলাকার মত পানি কেটে এগিয়ে আসছে। নোঙর করল তীর থেকে যথেষ্ট দূরে। আবার নামানো হলো একটা বোট। কিন্তু এবার শুধু ক্যাপ্টেন একা এল তীরে। ডেকের কোথাও দেখাই গেল না ভ্যান ডককে।

সিগারেট ফেলে দিল রানা। 'দিস ইজ ইট!' স্কুবা গিয়্যারের স্ট্র্যাপ আঁট করতে করতে বলল রানা। 'অতদূর পর্যন্ত সাঁতরাতে পারবে তো?'

আঁজলা ভরে পানি তুলে মাস্কে ছিটাতে ছিটাতে রূপা বলল, 'অনায়াসে।'

'আমার কাছ-ছাড়া হয়ো না,' বলল রানা। 'সোজা ম্যারিনোর দিকে যাচ্ছি না আমরা। স্টার্নের দিক থেকে বিশ-পঁচিশ গজ দূর দিয়ে ছাড়িয়ে যাব ইয়টকে, তারপর ফিরে আসব ওদিক থেকে। ফুয়েলারটা ওখানে থাকতে পারে, মনে রেখো। অনেক নিচু দিয়ে যেতে হবে।'

উরুর সাথে নাইলন কর্ড জড়িয়ে নিয়ে পানিতে নামল রানা।

সোজা পঁচিশ ফিটের মত গভীরে নেমে গেল ওরা। তারপর সামনে এগোল। নিজের স্পীড সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা আছে রানার, তাই সেকেণ্ড এবং মিনিট গুনতে শুরু করল ও।

এগারো মিনিট ত্রিশ সেকেণ্ডের মাথায় থামল ও। ওর হিসেব অনুযায়ী, ম্যারিনো এখন বিশ থেকে ত্রিশ গজ বাঁ দিকে।

রূপার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। রূপা পাশে চলে আসতে মন্থর গতিতে এগোল দু'জন আবার

খানিকদূর গিয়ে ফের থামল। ঘুরল। এগিয়ে আসছে একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ। পানিতে তোলপাড় উঠল খানিকপর। প্রকাণ্ড একটা ছায়া সরে গেল ওদের উপর দিয়ে। কোন জাহাজ যাচ্ছে।

জাহাজটার প্রপেলার বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ করে। তারপর পানিতে নানারকম অস্পষ্ট শব্দ হতে লাগল। বুঝতে পারল রানা, ফুয়েলার ম্যারিনোর পাশে এসে দাঁড়াল, ফুয়েল সাপ্লাইয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।

পানির উপর বুদবুদ দেখে সন্দেহ করতে পারে ম্যারিনো বা ফুয়েলারের লোকেরা। ঘুর পথ ধরল রানা। ফুয়েলারের সামনে দিয়ে এগোল ও, তারপর আবার দিক পরিবর্তন করল। দুটো জাহাজের লোকজনই এই মুহূর্তে ফুয়েল আর পানি ভরার কাজে পিছন দিকে ব্যস্ত।

আবছা হয়ে রয়েছে সামনেটা ফুয়েলারের ছায়া পড়ায়। সন্তর্পণে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে ওরা। ম্যারিনোর গা ছুঁয়ে স্টার্নের দিকে চলে এল রানা। পিছনে রূপা। বাঁ হাত দিয়ে স্পর্শ করল ও প্রপেলারের একটা ব্লেড। ভয় ভয় বোধটা কাজ করছে ওর মনে সর্বক্ষণ। এই মুহূর্তে কেউ যদি ভুলক্রমে বোতাম টিপে এঞ্জিন চালু করে দেয়, বনবন করে ঘুরতে শুরু করবে ব্লেড তিনটে, কয়েক হাজার মাংসের কণা হয়ে যাবে শরীরটা পাঁচ সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে।

রূপা স্ট্র্যাপ খুলে রানার উরু থেকে মুক্ত করল নাইলন কর্ডের একটা বোঝা। অপরটা রইল রানার আরেক উরুতে। রূপার কাছ থেকে নিয়ে অতি সাবধানে রানা খুলতে শুরু করল গুটানো কর্ড।

ডায়ামিটারে প্রপেলারটা চার ফিট। শ্যাফটটা প্রপেলারের সামনে। সেটাকে সাপোর্ট দিচ্ছে পাখির ডানার মত দেখতে একটা ইস্পাতের মোটা পাত। পাতটা বেরিয়ে এসেছে স্টার্ন গ্ল্যাণ্ডের গা থেকে। গা এবং পাতের মাঝখানে কর্ডের প্রান্ত ঢুকিয়ে দিয়ে শ্যাফটটাকে জড়াল রানা, তারপর একটা প্রকাণ্ড ফাঁস তৈরি করে পরাল প্রপেলার, পাত এবং শ্যাফটের তিন গলায়। জোরে টান দিতে এঁটে বসল কর্ড সর্বত্র।

শুরু হিসেবে নিখুঁতই হলো কাজটা।

পানিতে কর্ড নাড়াচাড়া করা ঝামেলার ব্যাপার। সাপের মত এঁকেবেঁকে ভাসছে কখনও, কখনও পা জড়িয়ে ধরার হুমকি দিচ্ছে, কখনও সরে যাচ্ছে হাতের আওতার বাইরে। নিজেদের সাথে প্যাঁচ কষার চেষ্টাটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। অবশ্য সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে রূপা সর্বক্ষণ। ঘুড়ির সুতোর মত প্যাঁচ লাগছেই প্রতিমুহূর্তে, ছাড়াতে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে ওকে।

কাজটা শেষ হতে খুব বেশি সময় লাগল না। দুটো প্রপেলারকে শ্যাফটের সাথে এমন জটিল করে বাঁধল ওরা যে ওদেরকে খুলতে বললেও খালি হাতে তা আর সম্ভব নয়।

যেখান থেকে পানিতে নেমেছিল তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে ভেসে উঠল

ওরা। মাঝারি আকারের একটা লঞ্চ ক'হাত দূরে, রেলিঙে ভর দিয়ে একজন লোক সিগারেট টানছে। ওদেরকে দেখে ভুরু কুঁচকাল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না।

নিজেদের নির্দিষ্ট নির্জন জায়গায় ফিরে এল ওরা। স্কুবা মুক্ত হয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রূপা। সিগারেট ধরাল রানা ম্যারিনোর দিকে চোখ রেখে। ফুয়েলার সরে যাচ্ছে পাশ থেকে। বোটটা তীর বেগে ছুটে যাচ্ছে ইয়টের দিকে।

খানিকপর ইয়টের গায়ে বোট ভিড়ল। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ক্যাপ্টেন। ক্রুরা ইতিমধ্যে ডেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তোলা হচ্ছে বোটটা।

ভাঁজ করে তুলে ফেলা হলো সিঁড়িটাও। নোঙর তোলার জন্যে হোয়েস্টিং মেশিনের কাছে তৈরি হয়ে আছে একজন ক্রু।

'কি দেখছ?' উঠে বসতে বসতে বলল রূপা। ম্যারিনোর দিকে তাকাল ও রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে। 'আরে! এত তাড়াতাড়ি ভাগতে চাইছে ইয়ান?'

কথা বলার মত সহিষ্ণুতাও নেই নিজের মধ্যে, অনুভব করল রানা।

নোঙর তোলা হয়ে গেছে। রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছে ও।

নড়ে উঠল ম্যারিনো। ঘুরতে শুরু করেছে। নড়বে—এ আশা করেনি রানা। বুকের ভিতর ধাক্কা অনুভব করল ও, গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে আশাটা। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন ভাবল, সাতশো হর্স পাওয়ারের দুটো এঞ্জিনের কাছে নাইলনের কয়েকটা প্যাঁচ—কিইবা আশা করা যায়। রূপা যেন ককিয়ে উঠল। 'কাজ করছে না কর্ড!'

ঘুরে গেছে ম্যারিনো। মুক্ত সাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। খালি হয়ে গেল রানার বুকটা। চোখের সামনে দেখতে দেখতে ছোট হয়ে যাবে ম্যারিনো, বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যাবে গভীর সমুদ্রে। সী-উইড সংক্রান্ত লেকচারের কথা মনে হতেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কান দুটো।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানা বলল, 'গেল!'

সম্মোহিতের মত ম্যারিনোর দিকে চেয়ে আছে রূপা। 'দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠল। 'ভাল করে তাকাও!'

তাকাতেই রানার চোখের সামনে ঘটে গেল অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা। চরকির মত ঘুরে গেল ম্যারিনো এক পাক, সোজা এগিয়ে আসছে আবার তীরের দিকে মুখ করে। ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে স্পীড। ইঞ্জিন দুটোর রিভার্স অ্যাকশনের ফলে ইয়টের স্টার্ন সাইডের পানিতে মহা-আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। খানিকপরেই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এল। নিস্তেজ, আহত হাঁসের মত এগিয়ে আসছে ম্যারিনো, একটা ইটালীয়ান যাত্রীবাহী জাহাজের নির্ধারিত গতিপথের উপর দিয়ে সোজাসুজি।

বন্দর ত্যাগ করছে জাহাজটা। গম্ভীর বু-ও-ওম, বু-ও-ওম আওয়াজ তুলে পথ থেকে সরে যাবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল সে ম্যারিনোর উদ্দেশ্যে। অসহায় ম্যারিনোর মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

জাহাজটা শেষ মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করায় সংঘর্ষ ঘটতে ঘটতেও ঘটল না। ডেকে বহু লোকের ভিড় জমে গেল দেখতে দেখতে। অনেকেই ম্যারিনোর উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে প্রতিবাদ বা গালাগালি করছে।

জাহাজের ঢেউয়ে দুলছে ম্যারিনো। ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে একটা ছোট টাগ বন্দরের শেড থেকে। টেনে নিয়ে এল সে ইয়টটাকে আগের জায়গায়। ওখানেই আবার নোঙর ফেলল ম্যারিনো।

রানা বলল, 'মুহূর্তের জন্যে আমি ভেবেছিলাম···যাক, রাতে থাকছে ভ্যান ডক ম্যানিলায়।'

'কর্ডমুক্ত করে সন্ধ্যার আগেই যদি রওনা হয় আবার?'

হাসতে হাসতে রানা বলল, 'সেক্ষেত্রে তোমার বিভারটাই শেষ ভরসা। ওটা নিয়ে পালিয়ে যাব লোকচক্ষুর অন্তরালে।'

স্টার্নে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে দেখছে ক্যাপ্টেন।

'গোলমালটা যে প্রপেলারে, বুঝতে পেরেছে,' বলল রূপা। 'ডাইভার নামিয়ে কর্ড পরিষ্কার করতে খুব বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'ইঞ্জিন কর্ডগুলোকে এঁটে দিয়েছে,' বলল রানা। 'খুলতে বা কাটতে প্রচুর সময় লাগবে।'

'লাগল,' বলল রূপা। 'তারপর?'

'রাত নামুক,' রানা বলল। 'আমি উঠব ম্যারিনোয়।'

পাঁচ

চাঁদ না থাকলেও আকাশে মেঘ নেই বলে নিকষ কালো নয় রাতটা। বহুদূরে মানোয়েল দ্বীপটা যেন ঝুলছে। ওদের বাঁ দিকে ম্যানিলা পিঠ উঁচু করে রয়েছে, আলোকমালায় সজ্জিত। রাইডিং লাইট ছাড়া ম্যারিনোর কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন নেই। রাত দুটো বেজে ত্রিশ মিনিট, ব্যাপারটাকে তাই স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করল রানা। ইয়টের সকলের ঘুমানোর কথা এখন।

ফাইবার গ্লাসের তৈরি ডিঙি নৌকোটাকে বাথটাব বলে মনে হয়। রূপার বৈঠা চালাবার ভঙ্গি দেখে খুশি হলো রানা। ম্যারিনোর কাছাকাছি এসে বৈঠা তুলে নিল রূপা। ধীর গতিতে এগোচ্ছে নৌকো।

ডাইভার যে দড়ির মইটা ব্যবহার করেছিল সেটা ঝুলন্ত অবস্থায় পাবে বলে আশা না করলেও খুঁজে দেখল সেটা রানা। হুক লাগানো দড়ি অবশ্য নিয়ে এসেছে ও। রূপার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে দূরত্বটা একবার দেখে নিল মাথা উঁচু করে। পানি থেকে স্টার্ন রেলিং নয় ফিটের মত উপরে।

ইয়টের গায়ে ঢেউয়ের ছোট ছোট ধাক্কা, অনবরত পানির ছল-ছল-ছলাৎ। আর কোথাও কোন শব্দ নেই। রাবার মোড়া ভারি হুকটা ছুঁড়ে দিল রানা লক্ষ্যস্থির করে। ডেকের উপর গিয়ে পড়ল সেটা। অস্পষ্ট শব্দ হলো—ঠক্। দড়ির প্রান্ত ধরে গজ দেড়েক টানল রানা। আসছে না আর। আটকেছে হুক রেলিঙে।

ঝুঁকে পড়ে চাপা কণ্ঠে বলল সে, 'যাচ্ছি। নিকোলাসকে নিয়ে ফিরতে পারব কিনা জানি না। কখন কোন্ দিন থেকে ফিরব তারও ঠিক নেই। যদি ফিরে না

আসি যা ভাল মনে করো করবে।'

রানার মুখটা ঠাণ্ডা দুটো হাত দিয়ে ধরল রূপা। পর মুহূর্তে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আমি তোমার আশপাশেই থাকব।'

দড়ি বেয়ে ওঠার সময় নিচের দিকে একবারও তাকাল না রানা। কোমরে গোঁজা পিস্তলটার সাথে ইয়টের গায়ের চাপ লাগছে, ব্যথা পেয়ে মুখ বাঁকা করতে করতে উঠে গেল দ্রুত। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সামনেটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল ও। কেউ নেই উন্মুক্ত ডেকে। নিচের দিকে তাকাল রানা ঘাড় ফিরিয়ে। ডিঙিটা সরে গেছে ইয়টের কাছ থেকে। কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে।

গার্ড যদি থেকেও থাকে আড়ালে, নিঃশব্দে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হয় হুইল হাউস নয়তো ডাইনিং সেলুনের কোথাও আছে। উপর থেকে চারদিকে নজর রাখায় সুবিধে অনেক।

অন্ধকারে কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ম্যারিনোর সিস্টার শিপের ডিজাইন-প্ল্যান স্মৃতিতে গেঁথে নিয়েছে রানা। রেলিং টপকে পা বাড়াবার আগে পেন্সিল টর্চ অন করেই অফ করল একবার। মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেল অল্পের জন্যে ও। সামনেই পড়ে রয়েছে ডাইভার গিয়ার, পা বাড়ালেই আছাড় খেয়ে পড়ত ডেকের উপর।

সামনে একটু বাঁ দিকে লাউঞ্জে ঢোকার দরজা থাকার কথা। লাউঞ্জে সিঁড়ি আছে কেবিন ডেকে নেমে যাবার জন্যে।

লাউঞ্জে ঢুকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল ও নিঃশব্দে। মানুষের গন্ধ বা শব্দ কিছুই নেই। স্টারবোর্ডের দিকে গ্লাস-প্যানেল দরজা দেখা যাচ্ছে একটা। কাঁচ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে ক্ষীণ আলোর আভা। কাঁচটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। লম্বা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে। শেষ প্রান্তের কাছে নড়ে উঠল কি যেন। ডাইনিং সেলুন থেকে সিঁড়ি বেয়ে প্যাসেজে নামল একজন লোক। সিঁড়ির মাথায় বালব আছে, তার আলোয় লোকটার ছায়া দেখতে পেয়েছিল রানা। বানার দিকে পিছন ফিরে হাঁটছে এখন। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কিচেনের দিকে।

কান পেতে শোনা গেল অস্পষ্ট কাপ-পিরিচের শব্দ। নাইট গার্ড লোকটা কিচেনে চা বা কফি খেতে গেছে ঘুম তাড়াবার জন্যে।

সিঁড়ি বেয়ে কেবিন থেকে নেমে এল ও। পাশাপাশি অনেকগুলো ডাবল কেবিন। এগুলো সবই গেস্টদের জন্যে। ভ্যান ডকের কেবিন এঞ্জিনরুমের অপরদিকে। তাকে নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা বোধ করল না রানা। প্রত্যেকটা কেবিনের সামনে একবার করে দাঁড়াল ও।

যা আশা করেছিল, সবগুলো কেবিনের দরজা বন্ধ। কী-হোলে চোখ রেখে কিছুই দেখতে পেল না ও। ভিতরে অন্ধকার। সর্বশেষ কেবিনটার চেহারা অন্যান্যগুলোর মত হলেও এটার পোর্টগুলো খোলা, পর্দা ঝুলছে। অন্য সব কেবিনের পোর্ট বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

দরকার হলে সবগুলো তালা খুলে দেখতে হবে, স্থির করল রানা, কিন্তু প্রথমে সর্বশেষ কেবিনের ভিতরই ঢুকতে হবে ওকে।

সাথে করে নিয়ে আসা চাবিগুলোর একটি ক্লিক করে শব্দ তুলল তালার ভিতর। কবাট উন্মুক্ত করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল রানা একপাশে। চিৎকার নয়, চাপা ফোঁস ফোঁস শব্দ ঢুকল কানে।

কেবিনে ঢুকল রানা। কবাট বন্ধ করে তালা লাগাল দরজায়। পেন্সিল টর্চ জ্বালতেই দেখল মুখ বিকৃত করে মেয়েমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নিকোলাস।

কোমর থেকে পিস্তলটা হাতে নিল রানা। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বিছানার কাছে। নিকোলাসের মুখের উপর আলো ফেলতেই কান্না থামল তার। এখন হয়তো অন্য কোন স্বপ্ন দেখছে সে। একটা আঙুল তার কানের ঠিক নিচে রেখে চাপ দিল সে ধীরে ধীরে। নিঃশব্দে কারও ঘুম ভাঙাতে হলে এর চেয়ে ভাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর হতে পারে না।

প্রায় সাথে সাথে চোখ মেলল নিকোলাস। বন্ধ করল তখুনি। ধাঁধিয়ে গেছে চোখ। পেন্সিল টর্চের আলো সরিয়ে হাতের পিস্তলটার ওপর ফেলল রানা। 'শব্দ কোরো না, নিকোলাস। আমি তোমার ভাল চাই। কথা না শুনলে গুলি করে ঝামেলা চুকিয়ে দেব।

বিছানার উপর কেঁপে উঠল নিকোলাস। ঢোক গেলার শব্দ হলো বিদঘুটে ধরনের। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর কথা ফুটল ফিসফিস করে বলল, 'কে···কে তুমি?'

'তৌফিক,' বলল রানা। 'তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

সাথে সাথে কিছু বলার মত পেল না নিকোলাস। হজম করতে পারছে না সে পরিস্থিতিটা।

'আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো?'

'না।'

'পাগল হয়েছ?' নিকোলাস দ্রুত কাটিয়ে উঠছে বিস্ময়ের ধাক্কা। 'ঢুকলে কিভাবে তুমি এখানে?'

'এখানে মানে? এখানে কোথায়?' রানা হাসল। 'তুমি জানো, কোথায় আছ এখন তুমি?'

'কেন, ইয়টে আছি।' আড়চোখে এদিক ওদিক তাকাল নিকোলাস। চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারল রানা, কিছু খুঁজছে—গ্লাস, অ্যাশট্রে কিছু একটা পেতে চায় ও।

'পিস্তলটা দেখতে পাচ্ছ তো?' রানা বলল। 'দেখেও না দেখার ভান করলে আমার কিছু বলবার নেই। শোনো নিকোলাস; তোমাকে আমি ফলো করে এতদূর পর্যন্ত এসেছি।'

'তুমি··· কে তুমি?'

'তোমার মতই একজন প্রফেশনাল,' বলল রানা। 'কাউন্টার এসপিওনাজে আছি।'

শিউরে উঠল নিকোলাস। 'মার্ডারার!' শব্দ করে শ্বাস নিতে শুরু করল, যেন

বাতাস কম পাচ্ছে হঠাৎ করে। রানার হাতের পিস্তলটার দিকে হাত তুলল। থরথর করে কাঁপছে তর্জনীটা। 'ওটার শব্দেই ধরা পড়ে যাবে তুমি। সাইলেন্সার নেই দেখতে পাচ্ছি আমি। গুলি করো, মারো আমাকে, তোমারও মৃত্যু ঘটবে সেই সাথে।'

'ব্রেন খাটাও, বৃদ্ধ!' বলল রানা। 'ঢুকেই তোমাকে গলা টিপে মারতে পারতাম না? মারিনি কেন? চিন্তা করো।'

বোকার মত চেয়ে রইল নিকোলাস।

'আমাকে নিয়ে···কেন, কোথায় নিয়ে যেতে চাও?'

'তার আগে জেনে রাখো, হয় তোমাকে নিয়ে যাব, নয়তো, যেতে রাজি না হলে, মেরে রেখে যাব। খালি হাতে ফিরে যেতে আসিনি আমি, নিকোলাস,' বলল রানা।

'এত বড় ঝুঁকি নিয়েছ—কেন?' নিকোলাস স্বাভাবিক হতে চাইছে, চিন্তা করে বুঝতে চাইছে ব্যাপারটা। 'তুমি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর লোক?'

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে রানা বলল। 'আমার ধারণা, আমার কাছ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করার পর আবার তোমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল, ইয়টে তোমার জ্ঞান ফিরেছে তারপর, তাই না? বলো তো, নিকোলাস, কোথায় আছ এখন তুমি?'

চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল নিকোলাস। বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না চেহারায়। 'টেমপারেচারে পরিবর্তন ঘটেনি, এটুকু অন্তত অনুভব করতে পারি। তার মানে, খুব বেশি পুবে বা দক্ষিণ-পুবে নিয়ে আসা হয়নি আমাকে।'

'ইডিয়েট!' গাল দিল রানা। 'এয়ারকণ্ডিশন প্ল্যান্ট আছে ইয়টে। টেমপারেচার বদলালেও টের পাবার কথা নয় তোমার। নিকোলাস, চাইনীজ ফুড পছন্দ করো?'

'মানে? এ কি রকম প্রশ্ন?'

'খেতে দেয়নি এরা তোমাকে?'

'হ্যাঁ··· কেন? মাঝেমধ্যেই তো খাচ্ছি···'

'ম্যারিনোয়···' থামল রানা, 'তার আগে জেনে রাখো এই ইয়টের নাম ম্যারিনো। ম্যারিনোর এঞ্জিনিয়র আর ক্যাপ্টেন ছাড়া অন্য সব ক্রু হচ্ছে চাইনীজ। খোদ ইয়টের মালিকও তাই। ইয়ান ভ্যান ডক কি বলেছে? বলেনি হংকঙে নিয়ে যাচ্ছে সে তোমাকে?'

'কি বললে? ইয়ান ভ্যান ডক? সে আবার কে?'

হেসে ফেলল রানা। 'নিকোলাস, বারোটা বেজেছে তোমার, মুশকিল হলো, সবাই তা জানে, তুমি ছাড়া। ভ্যান ডক! ভ্যান ডক হচ্ছে হংকং সম্রাট—এই ইয়টের মালিক। হংকং-এ তার আস্তানা। তোমাকে সে উদ্ধার করেছে মূল্যবান পণ্য মনে করে, ব্যবসা করার জন্যে।'

মঙ্গলগ্রহ থেকে ফিরে গল্প শোনাচ্ছে যেন রানা, অবাক বিস্ময়ে, চোখেমুখে অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে তাই গিলছে নিকোলাস।

'তোমার কি ধারণা? রাশিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে এরা তোমাকে?'

সাথে সাথে সাবধান হয়ে গেল নিকোলাস। প্রতিবাদ করল দ্রুত। 'আমি রাশিয়ার লোক কে বলল?'

'রাশিয়া হোক বা আমেরিকা, ভারত হোক বা ইসরাইল, কোনও না কোনও একটা দেশের লোক তো তুমি?' বলল রানা। 'যেতে হলে সেই দেশেই তো যেতে চাও? নিশ্চয়ই হংকঙে যেতে চাও না। নাকি চাও?'

'হংকং? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? কে বলল তোমাকে আমি হংকং-এ যাচ্ছি?'

'কেউ বলেনি,' বলল রানা। 'বাস্তব সত্য বলছে। জানো তুমি, এই সপ্তাহেই হংকং-এ নোঙর করবে ম্যারিনো, তোমার সমুদ্রযাত্রা এবং জীবনযাত্রারও সমাপ্তি হবে সেই সাথে।'

চেয়ে রইল নিকোলাস। 'প্রলাপ বকছ তুমি। খান আবদুর রউফ খান আমাকে হংকং-এ নিয়ে যাচ্ছেন—অসম্ভব! তিনি...'

'তিনি—কি?' প্রশ্ন করল রানা।

'আমাকে কথা দিয়েছেন আমার দেশে পৌঁছে দেবেন। তাঁর কথার নড়চড় হতে পারে না।'

'ভ্যান ডকের পেয়ারার লোক খান,' রানা বলল। 'ডকের কথায় সে ওঠে বসে। ডক যা চায়, খানও তাই চাইতে বাধ্য। ডক চায় তোমাকে হংকং-এ নিয়ে যেতে। তাই তুমি হংকং-এ যাচ্ছ।'

'না,' বলল নিকোলাস। 'আমি হংকং-এ যাচ্ছি না।'

রানা হাসল। 'ডেকে বেরুতে দেয় না কেন তোমাকে? পোর্টে পর্দা ঝোলে কেন? বন্দরে নামতে দেয় না কেন?'

'খান বলেছে, পুলিস আমাকে খুঁজছে, তাই ডেকে না বেরুনোই ভাল।'

'হাস্যকর নয় যুক্তিটা? গভীর সমুদ্রে পুলিস তোমাকে হারিকেন নিয়ে খুঁজছে নাকি? ক্যালকাটায় তুমি...'

'ক্যালকাটা?'

'জ্বী,' বলল রানা। 'ক্যালকাটা। ওখানেই এক সাথে বন্দী ছিলাম আমরা।'

'কৃষ্ণ তো ভারতীয়।' চিন্তিত দেখাল এতক্ষণে নিকোলাসকে। 'সেই আমাকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে আসে ইয়টে। এখানে সে গার্ড দেয় আমাকে।' কপালে রেখা পড়ল তার। 'ইয়ট ভিড়েছে এখন কোথায়?'

'ম্যানিলায়। মার্কাসামাকেড হারবারে।'

ত্রিশ সেকেণ্ড চিন্তা করার সময় দিল ওকে রানা।

'দুটো পথ বেছে নিতে পারো তুমি,' জানিয়ে দিল ও। 'হয় আমার সাথে যেতে হবে, তা না হলে এই কেবিনেই আমার হাতে শাহাদাত বরণ করতে হবে তোমাকে।'

এক মিনিট পর নিকোলাস বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু ডেকে বেরিয়ে যদি জায়গাটা চিনতে না পারি, চেঁচিয়ে সবাইকে জড়ো করব তা বলে রাখছি। গুলি তুমি হয়তো করবে, কিন্তু অন্ধকারে হয়তো লাগবে না আমার গায়ে। এটা মনে

রেখো।'

'কদিন আগে এসেছিলে ম্যানিলায়?'

'বছর চার-পাঁচ হবে।'

'শুনেছি তোমার স্মরণশক্তি ভাল,' মৃদু হাসল রানা। 'ওটার ওপরই নির্ভর করছে তোমার জীবন-মৃত্যু।'

চাদর সরিয়ে উঠে বসতে যাবে, হাত দুটো পাথর হয়ে গেল নিকোলাসের। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে রানার দিকে।

নিকোলাসের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে কান পেতে আছে রানা শব্দটা আর একবার শুনতে পাবার জন্যে। শব্দ একটা হয়েছে, সন্দেহ নেই।

আবার হলো। সেই একই শব্দ। কিন্তু এবারও ঠিক চেনা গেল না শব্দটা কিসের।

গলা পর্যন্ত চাদর টেনে ফিসফিস করে নিকোলাস বলল। 'কৃষ্ণ আসছে। রোজই একবার আসে এই সময়।'

নিকোলাসের চোখের আধ হাতের মধ্যে পিস্তলটা নামাল রানা। 'এটার কথা মনে রেখো।' দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে টয়লেটের দরজা খুলে ফেলল ও। চৌকাঠ পেরোবার সময় কেবিনের তালা ক্লিক করে ওঠার শব্দ ঢুকল কানে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ধরা পড়ে গেছে ও। দরজা বন্ধ করার পর রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল তিন সেকেণ্ড। দড়াম করে খুলে গেল কেবিনের কবাট।

পেন্সিল টর্চ অন করেই চরকির মত ঘুরে চারপাশটা দেখে নিল একবার রানা, নিভিয়ে দিল টর্চ। দ্বিতীয় কোন দরজা নেই। টয়লেট, ওয়াশ-বেসিন, মেডিসিন কেবিনেট এবং শাওয়ার আছে। সেমি ট্র্যান্সপারেন্ট প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে শাওয়ারটা ঘেরা।

খুট করে শব্দ হতেই আলো জ্বলে উঠল পাশের ঘরে।

হুমকির মত শোনাচ্ছে লোকটার কণ্ঠস্বর। 'কার সাথে কথা বলছিলে? মিছে কথা বোলো না—পরিষ্কার শুনেছি আমি।'

নিকোলাস চুপ। তার কণ্ঠস্বর কানে আসছে না রানার। হাতের তালু ঘেমে গেছে ওর। নিকোলাস কি মনস্থির করার চেষ্টা করছে?

'ঘুমের মধ্যে কথা বলছিলাম বোধহয়,' মৃদু কণ্ঠে বলল নিকোলাস। 'মাথা ধরেছে। খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম তুমি আসার আগে। কৃষ্ণ, ইয়টটা মুভ করছে না কেন বলতে পারো?'

'মাথা ধরেছে তো কলিংবেল বাজাওনি কেন? নিজেও তো ট্যাবলেট নিয়ে খেতে পারতে একটা।' কৃষ্ণ লোকটার চেহারা যাই হোক, গলার স্বরটা বিদঘুটে ধরনের, যেন হার্ডবোর্ডের কর্কশ গায়ের উপর পেরেক ঘষছে কেউ।

'প্রপেলারে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে,' আবার বলল সে, 'এসব ব্যাপারে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ট্যাবলেট দেব?'

'এটা কোন্ বন্দর, কৃষ্ণ?' জানতে চাইছে নিকোলাস।

'এসব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবে না, একবার না বলেছি? টপ সিক্রেট

ইনফরমেশন তোমাকে আমি দিতে পারি না।'

'কবে নাগাদ পৌঁছুব দেশে তা বলতে পারো?

'আগামী দু'একদিনের মধ্যেই,' কৃষ্ণ বলল। 'এসব কথা তুমি মি. খানকে জিজ্ঞেস করতে পারো না? অ্যাসপিরিন এনে দিই?'

আবার চুপ করে আছে নিকোলাস। শার্টের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছল রানা। ঘাড়ের উপর খাড়া হয়ে উঠছে চুল।

'না, ব্যস্ত হবার কিছু নেই,' বলল নিকোলাস।

নিকোলাসের কথা কানে এলেও রানা তার হাত দুটো দেখতে পাচ্ছে না। মুখে যাই বলুক, হাতের ইশারায় সে কৃষ্ণকে জানিয়ে দিচ্ছে না তো টয়লেটে অবাঞ্ছিত আগন্তুক আছে?

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই মানে?' কৃষ্ণ বলল। 'তোমাকে আমরা বহাল তবিয়তে হস্তান্তর করব। চুক্তির সেটাই মৌলিক শর্ত। দাঁড়াও আসছি।'

পর্দা সরিয়ে শাওয়ারের দিকে চলে এল রানা। পর্দাটার দু'দিকের প্রান্ত ধরে দোলা থামাল। পরমুহূর্তে ভিতরে ঢুকল কৃষ্ণ।

সামনের দিকে পিস্তল ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। টয়লেটের সুইচবোর্ডটা কোথায় জানে না ও। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো কৃষ্ণ অস্বাভাবিক দেরি করছে আলো জ্বালতে।

খুট করে শব্দের সাথে জ্বলে উঠল বালবটা। প্লাস্টিক পর্দার ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছে রানা। মেডিসিন কেবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে একটা পিচবোর্ডের বাক্স হাতড়াচ্ছে সে। একটু বেঁটে, কালো, কিন্তু প্রশস্ত কাঠামো শরীরের। ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। কুস্তি-টুস্তি ভাল লড়তে পারে, অন্তত পারা উচিত এ লোকের।

বাক্সটা কেবিনেটে রেখে দিয়ে ট্যাপ ছেড়ে গ্লাসে পানি ভরল কৃষ্ণ। আলো অফ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল টয়লেট থেকে।

'এই নাও, খেয়ে ফেলো এখুনি,' বলল কৃষ্ণ। 'আলো নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, শুয়ে পড়ো এবার।'

'পড়ব। ঘুম না এলে করবটা কি বলো?'

'ঠিক আছে। দরকার হলে ডেকো,' সরে যাচ্ছে কণ্ঠস্বর কেবিনের দরজার দিকে। নিভে গেল বাতি। তিন সেকেণ্ড পর বন্ধ হলো দরজা।

মিনিট খানেক সময় নিল রানা। তারপর ধীরে ধীরে টয়লেটের দরজা খুলে ঢুকল কেবিনে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানার উপর বসে টয়লেটের দিকে চেয়ে আছে নিকোলাস, ঘামছে এখনও। কোলের উপর একটা খোলা বই।

'কৃষ্ণ তোমাকে দেখেনি...?'

নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে থামিয়ে দিল তাকে রানা। পিস্তলটা কেবিনের দরজার দিকে তাক করে নিঃশব্দ পায়ে এগোল ও। সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা কান ঠেকাল কবাটের গায়ে। তিন মিনিট দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে।

কোন শব্দ না পেয়ে ফিরে এল রানা। 'কৃষ্ণ থাকে কোথায় জানো তুমি?'

মাথা নেড়ে জানাল নিকোলাস, জানে না সে। 'দেখতে পায়নি কেন তোমাকে?'

'ঝর্ণার নিচে স্নান করছিলাম,' বলল রানা। 'তোমার কাপড় চোপড় কোথায়? পরো তাড়াতাড়ি।'

উচ্চবাচ্য না করে বিছানা থেকে নামল নিকোলাস। ভারি কোন জিনিস অস্ত্র হিসেবে পকেটে লুকিয়ে রাখে কিনা দেখার জন্যে চোখ ফেরাল না রানা মুহূর্তের জন্যেও।

'এবার বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ো। গলা পর্যন্ত ঢেকে দাও চাদর দিয়ে।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল নিকোলাস, থামিয়ে দিল রানা।

'কৃষ্ণকে আধঘণ্টা সময় দিতে চাই ঘুমোবার জন্যে। যা বলছি, করো।'

নির্দেশ মত শুয়ে পড়ল নিকোলাস। আবার টয়লেটে গিয়ে ঢুকল রানা। দরজাটা আধখোলা অবস্থায় রইল। কৃষ্ণ যদি হঠাৎ ফিরে আসে, সবই স্বাভাবিক দেখতে পাবে।

আধঘণ্টা পর কেবিনে ঢুকে ইশারায় বিছানা ছাড়তে বলল রানা নিকোলাসকে।

রানার মুখোমুখি দাঁড়াল নিকোলাস। 'ডেকে বেরিয়ে যদি এই বন্দরকে ম্যানিলা বলে চিনতে না পারি...'

'চুপ!' চাপা কণ্ঠে ধমক মেরে থামিয়ে দিল তাকে রানা।

নিকোলাসকে সামনে রেখে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলল ও। অন্ধকার প্যাসেজে ঠেলে বের করল নিকোলাসকে। শিরদাঁড়ায় পিস্তলের চাপ খেতে খেতে বাঁ দিকে পা বাড়াল সে। সিঁড়ির কাছে এসে থামল একবার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে যাচ্ছিল রানার দিকে, বাঁ হাতের তর্জনী বাঁকা করে টোকা মারল রানা তার মাথার পিছনে।

মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল নিকোলাস।

নিচের লাউঞ্জ থেকে ডেকে পা দিয়ে পেন্সিল টর্চ জ্বালল রানা, নিকোলাস যাতে দেখতে পায় ডেকের কোথায় কি আছে। স্টার্নরেলিংটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে। সেদিকে এগিয়ে যাবার জন্যে পিছন থেকে রিভলভার দিয়ে খোঁচা মারল রানা পরপর দু'বার, কিন্তু নিকোলাস নড়ল না। আলোকমালায় সজ্জিত বন্দরের দিকে চোখ তার। অবাক বিস্ময়ে অস্ফুটে বলল। 'ওহ্, গড! দিস ইজ ম্যানিলা!'

'চুপ!' নিকোলাসের পাশে চলে এল রানা। তার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রেলিঙের দিকে।

রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে হুকসহ দড়িটা খুঁজতে গিয়ে নিজের উপর বিরক্ত বোধ করল রানা। ঠিক কোথায় উঠেছিল, ভুলে গেছে নাকি?

পাওয়া যাচ্ছে না। রেলিঙের মাথায় হাত বুলিয়ে এদিক থেকে ওদিক সরে যাচ্ছে ও—নেই।

'খুঁজে লাভ নেই!'

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হলো রানার মধ্যে। 'লাফ দাও!' নিকোলাসের বাহু ধরে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে রেলিঙের মাথায় একটা পা তুলে দিল রানা। পিছন থেকে শক্ত দুটো বাহু খামচে ধরল ওর মাথার চুল। ডেকের উপর দিয়ে জুতো পরা কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ দ্রুত সরে এল কাছে। হাল ছেড়ে দিয়ে রেলিঙের মাথা থেকে পা নামিয়ে ঘাড় ফেরাতেই অত্যুজ্জ্বল টর্চের আলো পড়ল মুখে।

দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে পাতা খোলা রাখল রানা। চারদিকে লোকজন, ঘিরে ফেলেছে ওদেরকে। ধস্তাধস্তির শব্দ হচ্ছে ডান পাশে।

নিকোলাসকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানার কাছ থেকে দু'জন লোক।

ক্যাপ্টেনকে দেখে চিনতে পারল রানা। সেই নেতৃত্ব দিচ্ছে এই অভিযানে। একজন লোক ছুটে চলে গেল সার্চ লাইট অপারেট করার জন্যে।

ম্যারিনোর চারদিকে আলো ফেলে দেখা হচ্ছে।

পিস্তলটা হাতছাড়া হয়ে গেছে আগেই। ক্যাপ্টেনের হাতে শোভা পাচ্ছে সেটা। ডেকের আলো জ্বালা হয়েছে এর মধ্যে। মাথা নিচু করে পিস্তলটা দেখতে দেখতে রানার সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। 'কে তুমি?'

দু'কোমরে হাত রাখল রানা।

'জেনে কি হবে?'

নিকোলাসের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। ডেক চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে। পিছন থেকে তার দু'কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে একজন চীনা। ক্যাপ্টেন পদশব্দ শুনে তাকাল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল কৃষ্ণকে।

'কেমন গার্ড তুমি?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

নিকোলাসের দিকে হাবাগোবার মত চেয়ে আছে কৃষ্ণ। 'এখানে কিভাবে এল? খানিক আগেও তো ওর সাথে কথা বলে এসেছি! দরজা খুলল কিভাবে?'

'এদিকে তাকাও,' বলল ক্যাপ্টেন। তারপর মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল রানার দিকে। 'চেনো ওকে? ওই নিকোলাসকে বের করে এনেছে।'

'ভগবান!' চিৎকার করে উঠল কৃষ্ণ। 'এ লোক তো তৌফিক আজিজ!' সম্মোহিতের মত এগিয়ে আসছে সে। 'কিন্তু মা কালীর দিব্যি, কেবিনের ভিতর ছিল না ও! বাথরুমেও ঢুকেছিলাম...'

'কোথায় ছিলে তুমি?' রানার দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন।

'বাতাসের সাথে মিশে।'

এগিয়ে আসার ভঙ্গি দেখে কিছুই টের পায়নি রানা, ওর কথা শেষ হতেই ডাকাতের মত হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিল কৃষ্ণ।

ঘুসিটা মৃত্যু ডেকে আনলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। রানা সরে যাবারও সময় পেল না। কিন্তু বাঁচিয়ে দিল ওকে ক্যাপ্টেন। ঝুঁকে পড়ে কাঁধ আর দু'হাত দিয়ে কৃষ্ণকে বাধা দিল, জড়িয়ে ধরল কোমর।

'কৃষ্ণ!' ক্যাপ্টেনের কঠিন কণ্ঠস্বরে কাজ হলো। মোচড় খাচ্ছিল দেহটা, স্থির হলো। ক্যাপ্টেন ছেড়ে দিতে সিধে হয়ে দাঁড়াল কৃষ্ণ, পিছিয়ে গেল দু'পা। কিন্তু

রক্ত চক্ষু নড়ল না রানার দিক থেকে।

'তুমি তাহলে তৌফিক আজিজ?' ক্যাপ্টেনকে সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। 'গুড। বস্ তোমাকে পেয়ে খুশি হবেন, আমি শিওর।'

মৃদু, নীরস একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'তৌফিক আজিজ নয় ও।'

ঝট করে মুখ তুলল রানা। স্লীপিং গাউনে মানায়নি খান আবদুর রউফ খানকে, উজ্জ্বল রঙের ছিট কাপড়ের গাউনটা যেন সং সাজবার জন্যে গায়ে জড়িয়েছে সে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে অভিজাত, গর্বিত মহীরুহের মত ইয়ান ভ্যান ডক। কথাটা বলেছে সে-ই।

'ও হচ্ছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা।' ভ্যান ডকের কণ্ঠস্বর মার্জিত পরিশীলিত। 'হ্যালো, মি. রানা! বিলিভ ইট অর নট, মাত্র এক ঘন্টা আগে ওয়্যারলেস মেসেজ পেয়েছি আমি তোমার সম্পর্কে। তুমি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট। ভয়ঙ্কর লোক তুমি। তোমার পরিচয় পাবার পরই আমি বুঝতে পারি, আসবে তুমি ইয়টে। অপেক্ষা করছিলাম আমি তোমার জন্যে।'

ছয়

'ফিং চু রেলিঙে আটকানো রশিসহ একটা হুক পেয়ে খবর দেয় আমাকে। আমি সবাইকে নিয়ে ওঁৎ পাতার ব্যবস্থা করি,' ভ্যান ডকের প্রশ্নের উত্তরে বলল ক্যাপ্টেন, কৃষ্ণকে দেখাল আঙুল উঁচিয়ে। 'ওই গর্দভটা দায়ী।'

ভ্যান ডক কৃষ্ণের দিকে তাকালই না। 'ওকে এখান থেকে চেলে যেতে বলো। পরে কথা বলব ওর সাথে।'

পদশব্দ শুনে রানা বুঝল, কৃষ্ণ চলে যাচ্ছে।

'মি. রানা, নিকোলাসকে কিভাবে নিয়ে যেতে চাই ছিলে?' ভ্যান ডক জানতে চাইল। 'বোটটা কোথায়?'

'সাঁতরে এসেছি আমি। সাঁতরেই ফিরতাম,' বলল রানা।

'পঙ্গু নিকোলাসকে নিয়ে? বিশ্বাস করি না।' খানের কানে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কিছু বলল ভ্যান ডক। এগিয়ে গেল খান নিকোলাসের দিকে।

'নিকোলাস! তুমি এমন নেমকহারাম তা আমি ভাবতেও পারিনি!' খানের কণ্ঠস্বর চড়া। 'পাগল হলেও তো মানুষ এমন ভুল করে না! কে তোমার শত্রু কে মিত্র তাও তুমি জানো না নাকি? কার সাথে পালাতে চেষ্টা করছিলে জানো?'

কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিল না নিকোলাস। খানের দিকে তাকাল না একবারও। ভ্যান ডকের চোখে চোখ রেখে বলল। 'আপনি এই ইয়টের মালিক, মি. ডক? কি সম্পর্ক আপনার সাথে মি. খানের? আমাকে সাহায্য করার পিছনে আপনার স্বার্থ কি?'

'চমৎকার প্রশ্ন,' বলল রানা। 'ডক, উত্তর দাও।'

মৃদু হাসিটা এতটুকু ম্লান হলো না। 'স্বার্থ? টাকা রোজগার ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ নেই আমার, মি. নিকোলাস। আপনাকে আমি সাহায্য করছি বিরাট অঙ্কের টাকা পাবার আশায়।'

'কার কাছ থেকে টাকা পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন আপনি?'

'অফার অনেকগুলোই আছে। কিন্তু এখনও গ্রহণ করিনি একটাও,' বলল ডক। 'ভাল দাম না পেলে আপনাকে আমি বিক্রি করব না।'

উঠে দাঁড়াতে গেল নিকোলাস, পিছন থেকে তার কাঁধ চেপে ধরে জোর করে বসিয়ে দিল চীনাটা।

'মি. খান! এসব কি শুনছি আমি? আপনি আমাকে ধোঁকা দিয়ে...'

খান হাসল। 'আরে বোকা, তোমাকে জেল থেকে বের করা কি আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল? বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করো ব্যাপারটা। মি. ইয়ান ভ্যান ডক আমাকে সাহায্য করেছেন তোমাকে জেল থেকে বের করার ব্যাপারে। সাহায্যের বদলে কিছু টাকা তাকে দেয়া উচিত। বলো, উচিত কিনা?'

নিকোলাস চেয়ে আছে। উত্তর দিল না সে।

'টাকা পেলেই সে তোমাকে তুলে দেবে তোমার দেশের প্রতিনিধির হাতে। আমরা সবাই জানি, তোমার দেশ তোমাকে ফেরত পাবার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা দিতে কার্পণ্য করবে না।'

গভীর ঘুম থেকে এইমাত্র যেন জাগল নিকোলাস। 'এসব কি বলছেন? আগে কেন বলেননি আমাকে?'

'দরকার ছিল কি?' খান হাসছে। 'তোমাকে আমরা শান্তিতে রাখতে চেয়েছিলাম। সে যাক, শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার দেশেই ফিরে যাচ্ছ, এতে কোন ভুল বা সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু অন্য কোন পার্টি যদি বেশি টাকা অফার করে, কি করবে তোমরা?' প্রশ্ন করল রানা।

'তুই শালা চুপ থাক!' একজন বাঙালী বেঈমান তার শত্রুর সাথে কি রকম আচরণ করে তার নমুনা দেখাল খান। 'জুতিয়ে তোর...'

নিজেকে দমন করতে দশ সেকেণ্ড সময় নিল রানা, তারপর বলল, 'ডক, পা-চাটা কুকুরটাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছ, মাথাটা তোমার ওই গুঁড়ো করবে তা জেনে রাখো।'

'মি. নিকোলাস, আমি চাই, আপনি স্বইচ্ছায় আমাদের সাথে থাকবেন,' ভ্যান ডক বলল। 'আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাকে আপনার দেশে ফেরত পাঠাতে। কিন্তু, একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। আপনাকে কেনার পার্টি একটা নয়, এ আপনার উপলব্ধি করা উচিত। আমি ব্যবসায়ী মানুষ, যার কাছ থেকে বেশি টাকা পাব তার কাছেই বিক্রি করব আপনাকে।' রানার দিকে তাকিয়ে হাসল ভ্যান ডক। 'মি. রানা, তার মানে এই নয় যে বাংলাদেশ টাকা দিলে আমি নিকোলাসকে আপনাদের হাতে তুলে দেব। নিকোলাসকে আমি মুক্ত করেছি এ খবর বাংলাদেশকে সহজবোধ্য কারণেই আমি জানাতে চাই না। খুব শীঘ্রিই

বাংলাদেশে আমি পুঁজি খাটাতে যাচ্ছি। দুটো বড় বড় শিল্প-প্রকল্পের অনুমোদন পেয়েছি আমি। বছরে ষাট কোটি টাকা লাভ হবে ওখান থেকে আমার। বাংলাদেশ যদি জানতে পারে নিকোলাসের ব্যাপারটা, ষাট কোটি টাকার বাৎসরিক আয় থেকে বঞ্চিত হব আমি। তা আমি চাই না। আমার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারছেন?'

রানা বলল, 'পরিষ্কার। আমাকে ফেরত যেতে দিতে চাও না তুমি।'

'শুধু তাই নয়,' হাসিটা বড় হলো ভ্যান ডকের। 'লাশটাও গুম করে ফেলব আমরা। এবং সেটা এখুনি। কাজ ফেলে রাখার পক্ষপাতী আমি নই।' ভোজবাজির মত একটা পিস্তল দেখা দিল ভ্যান ডকের হাতে। লক্ষ্য স্থির হয়ে আছে রানার কপালের ঠিক মাঝ বরাবর।

অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসল রানা। 'তুমি সবসময় এইরকম বিপরীত কথা বলো নাকি? মুখে এক, মনে আরেক?'

'মানে?' বিস্ময় ফুটল ভ্যান ডকের চোখে। 'কি বলতে চাইছ?'

'ইয়টে চড়ার আগে ফোনে কার কার সাথে কথা বলেছি, জানতে চাও না তুমি? ইয়টে যাচ্ছি এ খবর কাউকে কি না দিয়েই চলে এসেছি ভেবেছ? না, তা তুমি ভাবতে পারো না।'

'হয়তো তাই, খবর দিয়ে আসতেও পারো, আবার নাও পারো,' ভ্যান ডক চিন্তা করছে। 'এখুনি বলতে ঠিক অ্যাট দিস মোমেন্ট বোঝাইনি আমি। তোমার পেট থেকে সব কথা আদায় করতে হবে, তা ঠিক। সে দায়িত্ব মি. খানের। দেশীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব ওর পক্ষে, কি বলেন?'

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল খান। 'আমার হাতে ছেড়ে দিন। পাহারায় দু'জন থাকবে, আমি ব্লেড দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে ওর গায়ে মরিচ-গুঁড়ো ছড়াব—বাপ্ বাপ্ করে উগলে দেবে সব।'

'বীর হনুমান!' বলল রানা, 'বন্দী একজন লোককে টরচার করার জন্যে দু'জন লোক লাগবে পাহারার জন্যে—হাসি পাচ্ছে।'

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ভ্যান ডক। 'সার্চের রেজাল্ট কি?'

লাউঞ্জ থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে ক্যাপ্টেন বলল, 'দেখছি আমি।'

রানার দিকে ফিরল ভ্যান ডক। 'একা এসেছেন?'

'সঙ্গী পাবে কোথায় আবার?' মন্তব্য করল খান।

'আমার এবং বেলায়েত হোসেনের পরিচয় এত তাড়াতাড়ি জানলে কিভাবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা ভ্যান ডককে।

'যে-নেই তার সম্পর্কে প্রশ্ন করে কি লাভ?'

'নেই?' চমকে উঠল রানা।

'সে খবরও রাখো না?' বলল ভ্যান ডক। 'পটল তুলেছে সে কাল দুপুরে।'

ফিরে এল ক্যাপ্টেন। 'কোন বোট পাওয়া যায়নি।'

'মি নিকোলাসকে ওর কেবিনে নিয়ে যাও, ফিং চু,' বলল ভ্যান ডক। 'বিছানার সাথে বেঁধে রাখবে ওকে। দরজার বাইরে সর্বক্ষণ পাহারায় থাকো

একজন। আর মি. রানাকে নিয়ে যাও ফোরপিকে। ওখানে ওয়াটার টাইট দরজাওয়ালা স্টীলের বাল্কহেড আছে একটা। ওরই ভেতর জমবে নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য—কি বলেন, মিস্টার মাসুদ রানা?'

রানাকে মাঝখানে নিয়ে দু'জন চীনা রওনা হলো। নিকোলাসের পাশ দিয়ে যাবার সময় রানা দেখল, ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। এই কান্নাটারই অংশ বিশেষ অগ্রিম বেরিয়ে আসছিল তখন স্বপ্নের মাধ্যমে, ভাবল ও।

কিন্তু কৌতুকবোধ করার মানসিকতা নেই ওর। সাইড ডেক দিয়ে এগোচ্ছে ও। ডান পাশের লোকটার হাতে ওর পিস্তলটা রয়েছে। ফোরপিকের স্টীল বাল্কহেডের ছবিটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। দমে যাচ্ছে বুক। প্ল্যান দেখে স্মৃতিতে গাঁথবার সময় ভেবেছিল একবার, ওখানে যদি কাউকে আটকে রাখা হয়, দমবন্ধ হয়ে মারা যেতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে না। মাত্র চার ফিট উঁচু জায়গাটা। নিজের কথাই অজ্ঞাতসারে ভেবেছিল দেখা যাচ্ছে!

মধ্যডেকে বেরিয়ে এল তিনজন। শেষ চেষ্টার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেল রানা। দেখতে হবে...দুপ্—ভোঁতা শব্দ হলো একটা। ডান পাশের চীনা দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সঙ্গী এবং রানা একযোগে ঘাড় ফেরাল।

চীনার কপালে ফুটোটা দেখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল রানার চোখে। আবার সেই একই শব্দ। ডক হাউসের মাথার উপর আলোর ঝলক দেখল রানা।

'লাফ দাও,' চিৎকার করল রূপা।

অবাক হওয়ারও সময় নেই—রেলিঙের দিকে ছুটল রানা। লাফ দিল। রেলিং টপকে অদৃশ্য হয়ে গেল ও অন্ধকারে।

পানিতে পড়ে বেশ কয়েক হাত গভীরে নেমে গেল রানা। রূপা প্রায় ওর সাথেই পড়েছে। বুদ্ধি আদান-প্রদান করার কোন অবকাশ নেই বুঝতে পেরে দ্রুত সাঁতার কেটে সরে যেতে শুরু করল ও ইয়টের কাছ থেকে।

লাফ দেয়ার সময় দম নিয়েছিল সে ঠিকই, কিন্তু পানির দূরত্ব আন্দাজ করতে না পারায় অন্ধকারে আচমকা পানিতে পড়ে বেশিরভাগ বাতাস বেরিয়ে গেছে নাক-মুখ দিয়ে। বিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই টের পেল পানির ওপরে ভেসে না উঠে উপায় নেই কোন। ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইছে বুক।

হুস করে ভেসে উঠল মাথাটা। বিশ পঁচিশ গজ দূরে সরে এসেছে দেখে খুশি হয়ে উঠল রানা নিজের ওপর। হাঁপাতে হাঁপাতে চারদিকে তাকাল ও।

ম্যারিনোর ডেকে কুরুক্ষেত্র বাধার প্রস্তুতি চলছে।

রূপাকে পাঁচ হাত দূরে ভেসে উঠতে দেখল রানা।

'দেখা হবে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলাম,' বলল রানা। 'ডান দিক ধরে এগোও তুমি। আমি ঘুর পথে যাচ্ছি। দু'জনকে আলাদা থাকতে হবে। পানির ওপর মাথা তুলো না প্রয়োজন না হলে...।'

একই সাথে ডুব দিল আবার দু'জন। দেড় মিনিট পর বোট স্টার্ট নেবার শব্দ পেল রানা। ভ্যান ডক শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায়।

এগিয়ে আসছে বোটের শব্দ। আলোকিত হয়ে উঠল মাথার উপর পানির স্তর।

ইয়ট থেকে সার্চলাইট ফেলে খোঁজা হচ্ছে ওদেরকে।

মাথার উপর দিয়ে ছুটে গেল বোটটা। অন্ধকার হয়ে গেল সেই সাথে পানির উপরটা। দ্বিতীয়বার মাথা তুলতে রানা দেখল বোটটা ফিরে আসছে ডান দিক থেকে আবার।

ডুব দিল। কাছাকাছি এল না বোট। শব্দ শুনে অনুমান করল ও, বাঁক নিয়ে আবার ডানদিকে ফিরে যাচ্ছে সেটা। দুশ্চিন্তা বাড়ল রূপার জন্যে। ওকে কি দেখতে পেয়ে ফিরে গেল বোট?

আরও বার তিনেক মাথা তুলল রানা। বোটটাকে আর একবারও দেখতে পেল না। অনেকগুলো জাহাজের আড়াল মাঝখানে। সদ্য আগত একটা স্টীমারের শব্দে আর সব শব্দ চাপা পড়ে গেছে. বোটটা এখন কোনদিকে কি করছে বোঝার উপায় নেই।

পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। তারপর দেখতে পেল রানা রূপাকে। এমনই হাঁপিয়ে গেছে যে উঠে আসার শক্তি নেই। রানাকে আবার পানিতে নেমে টেনে তুলে আনতে হলো ওকে।

মিনিট পাঁচেক পর কথা বলল রূপা। 'বোটটা দু'বার আমার মাথার ওপর দিয়ে...।'

'আমাদের নৌকোটা কোথায়?'

'আল্লা মালুম!' দুই হাতের তালু চিৎ করল রূপা। 'ছেড়ে দিতেই ঢেউ-এ ঢেউ-এ কোনদিকে যে গেল...'

'সাইলেন্সার নিয়ে এসেছিলে কি মনে করে?'

রূপা হাসল। 'ভেবেছিলাম তুমি জানো। ভেবেছিলাম, ইয়টে চড়ার আগে আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবে তুমি।'

'কেন...ওহ্, বুঝেছি!' বলল রানা. 'কিন্তু নিকোলাসকে পেয়েই খুন করতে হবে তা আমি ভাবিনি। কি জানো, আশা ছাড়তে পারি না আমি সহজে। ওকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

'কিন্তু দুটো কাজের কোনটাই করতে পারোনি তুমি,' বলল রূপা। 'নিকোলাসকে ফিরিয়েও আনতে পারোনি, খুন করে রেখেও আসতে পারোনি।'

'ঘুমন্ত একজন মানুষকে খুন করা সহজ নয়, রূপা,' রানা বলল। 'তাছাড়া, বললাম তো, আমি তা চাইওনি।'

'এখন কি করতে চাও?'

'হোটেলে ফিরব,' রানা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'ওঠো।'

'তারপর?'

'দেখা যাবে কি করা যায়,' বলল রানা। 'হোটেল ছাড়তে হবে আমাদের। যত শীঘ্রি সম্ভব।'

ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। সকাল হয়ে গেল ফিরতে। সাতসকালে রাস্তায় শিশু-কিশোরদের একাধিক রঙচঙে মিছিল দেখে দাঁড়াল ওরা।

'এত মিছিল কিসের? কোনও উৎসব?'

রূপা বলল, 'হ্যাঁ। সারা ফিলিপাইন আজ উন্মাদ হয়ে উঠবে আনন্দে। কি যেন একটা ফেস্টা আজ। সারারাত ধরে পোড়ানো হবে আতসবাজি।'

মাথার ভিতর একটা আইডিয়ার আলতো ছোঁয়া অনুভব করল রানা।

'কত টাকা আছে তোমার কাছে, রূপা?'

'কত আর, তিন হাজার ডলারের মত,' বলল রূপা। 'কেন? টাকার দরকার হলে সংগ্রহ করা যাবে আরও।'

'কিভাবে?' আগ্রহ প্রকাশ পেল রানার প্রশ্নে।

'ব্রেসলেট দুটো বিক্রি করে দিয়ে। হীরের আংটিটাও ভাল দামে বিক্রি হবে।'

'সেই সাথে ঘড়ি দুটোও না হয় গেল!'

'কিন্তু এত টাকার কি দরকার?'

'দরকার হবে, মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'কি কাজে দরকার হবে তা এখনও জানি না।'

রিসেপশন থেকে ঘরের চাবি সংগ্রহ করে লিফটে চড়ল ওরা। তালা খুলে ভিতরে ঢুকে দুটো গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে একটা গ্লাস তুলে দিল রানা রূপার হাতে। 'ম্যানিলার সব হোটেলে কুকুর পাঠাবে ভ্যান ডক। প্রয়োজনীয় যা কিছু আছে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে রাস্তায় নামছি আমরা।'

'রাস্তায়? সেখান থেকে?'

'জানি না।' রূপার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। 'টাকা, পাসপোর্ট আর এয়ারক্রাফট সংক্রান্ত কাগজগুলো নিতে ভুলো না।'

রূপাকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে দু'ঢোক ব্র্যাণ্ডি গিলে ম্যারিনোর সিস্টার শিপের প্ল্যান নিয়ে বসল সে আবার।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় রূপা এসে দাঁড়াল পাশে। কাঁধে ঝুলছে বড় বড় দুটো ব্যাগ। 'রেডি!'

প্ল্যানটা ভাঁজ করে ট্রাউজারের পকেটে রাখল রানা। দরজার দিকে পা বাড়াল। এমনি সময়ে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনেই।

'ও কি!' ফসকে বেরিয়ে গেল শব্দটা রূপার মুখ থেকে।

কে হতে পারে?

দু'জনই ভাবছে। চেয়ে রয়েছে একে অপরের চোখের দিকে।

আবার, তারপর আবার বেজে উঠল ফোন।

শ্রাগ করল রানা। এগিয়ে গিয়ে তুলল রিসিভার। 'হ্যালো!'

'রানা?'

ধাক্কাটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে জবাব দেবার কথা মনেই হলো না রানার।

'রানা?' আবার সেই জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর। হঠাৎ ওর ঘুম ভাঙল যেন। দ্বিতীয়বার সাড়া না দিলে কানেকশন কেটে দেবেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, প্রচলিত নিয়মের কথা মনে পড়ে যেতেই কথা বলল ও।

'ইয়েস, স্যার।' কেমন যেন অপরিচিত শোনাল নিজের কানেই নিজের

গলাটা!

'একটা প্যাকেট পাবে বেলা বারোটায়। ঝিভারের ককপিটে···সীটের নিচে। কালেক্ট করো ওটা। গুড লাক টু ইউ।' বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

সেনগ্নায় পৌঁছে বাস থেকে নামল ওরা।

'যাচ্ছি কোথায়? কেনই বা?' চতুর্থবার জানতে চাইল রূপা।

সেনগ্না ডকইয়ার্ড ক্রিক এবং ফ্রেঞ্চ ক্রিকের মাঝখানে একটা পেনিনসুলা। গ্র্যাণ্ড হারবারের সাথে যোগাযোগ থাকলেও দূরত্বটা অনেকখানি।

'বলছি,' একটা রেস্তোরায় ঢুকে কেবিনে বসল ওরা, ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে পর্দা টেনে দিয়ে রানা বলল, 'সবই বলব। তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমাকে ম্যারিনোর কেউ দেখেছে?'

'একজন অবশ্যই দেখেছে—মানে, দেখেছিল।'

'বুঝলাম, মারা গেছে সে। আর কেউ?'

'না।'

'ডক জানে ইয়ট থেকে আমাকে কেউ উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে, যদিও কে তা সে জানে না,' মাথার পিছনটা চুলকাল রানা। 'অবশ্য জেনে নিতে কোনই অসুবিধে হবে না তার। জানবে একটা মেয়ে ছিল হোটেলে আমার সাথে। আমাকে সে এবং তার শিকারী কুকুরগুলো চেনে। কিন্তু কোন্ মেয়েটো আমার সাথে কাজ করছে জানে না ওরা কেউই। কাজেই ভয়ের খুব একটা কিছু নেই। মার্কেটিং করতে তোমাকেই যেতে হচ্ছে।'

'কি কিনতে চাও?'

'সেনগ্নায় এসেছি এই জন্যে যে এখানকার ন্যাভাল ডকইয়ার্ড খালি পড়ে আছে গত দুই বছর ধরে,' যেন নিজের মনে কথা বলছে এমনি ভঙ্গিতে বলল রানা। 'পরিত্যক্ত বোটশেড নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এদিকে। পরিত্যক্ত হলেও, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ বোটশেডগুলোর দেখাশোনা করে। তার কাছ থেকে বারো ঘণ্টার জন্যে ভাড়া চাই আমি একটা বোটশেড। কিন্তু সে-কথা তাকে বলা যাবে না। বলবে সাতদিনের জন্যে ভাড়া চাই—আমি একজন বোট ডিজাইনার, এবং কাজ করছি নতুন ধরনের হাইড্রোকেল নিয়ে, আমি চাই না আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা এ সম্পর্কে কিছু জানুক, তাই বোটশেডটাকে হতে হবে নির্জন এবং খবরটা রাখতে হবে চেপে।'

'তারপর?'

'বোটশেডের ব্যবস্থা হলে তুমি যাবে একটা বোট কিনতে। বিশ ফিটের মত লম্বা, বড়সড় ইঞ্জিন থাকবে তাতে।'

'আউটবোর্ড, না ইনবোর্ড?'

'দুটোই চলবে,' বলল রানা। 'আউটবোর্ডের দাম কম হবে। কিন্তু যেটাই নাও, মজবুত এবং দ্রুত হতে হবে।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল রানা। 'লোহালক্কড়ের আড়ত ওটা, আর যা কিছু দরকার, ওখান থেকেই কিনে নেব আমি। ওয়েল্ডিং আউটফিটও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে কাছেপিঠে

কোথাও।'

'তারপর?'

'তুমি যদি বেলা বারোটার আগে কাজগুলো সেরে ফিরে আসতে পারো, খুবই ভাল হয়। এরপর যেতে হবে তোমার এয়ারপোর্টে।'

মেজর জেনারেলের টেলিফোন কল সম্পর্কে দীর্ঘ পনেরো মিনিট বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আলোচনা করেছে ওরা। কিভাবে তিনি জানলেন ওরা কোথায় আছে, কখন জানলেন, এয়ারপোর্টের প্রোটেক্টেড হ্যাঙ্গারে রাখা আছে বিভার, সে প্লেনে তাঁর নিযুক্ত লোক ঢুকবে কিভাবে, কি আছে প্যাকেটে—কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর পায়নি ওরা, পাবার আশাও আপাতত ত্যাগ করেছে।

'তোমার কি মনে হয়? কি আছে প্যাকেটে?'

'ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে বুড়ো ঢাকা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মুভমেন্ট। তা যদি সত্যি হয়, প্যাকেটে একটা জিনিসই পাঠাতে পারেন তিনি।'

'কি সেটা?'

'যা আমার এই মুহূর্তে দরকার, একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু পাবার উপায় জানা নেই।'

'আহ্! বলোই না ছাই কি সেটা?'

'লিমপেট মাইন। কয়েকটা।' দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রানা। 'সে যাক। প্যাকেট নিয়ে আসার পর তোমার কাজ হলো একটা ট্রাক ভাড়া করা।'

'ট্রাক দিয়ে কি হবে?'

'ট্রাক ভর্তি আতসবাজি দরকার আমার। পটকা নয়, সত্যিকার কাজ করে যেগুলো, শক্তিশালী এবং দামী। বোট যেন ভরে, প্রচুর। পারবে?'

'তা পারব,' বলল রূপা রানার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে। 'কিন্তু এসব কিসের জন্যে—কেন?'

ট্রাউজারের পকেট থেকে ইয়টের প্ল্যানটা বের করে ভাঁজ খুলল রানা, বিছিয়ে দিল টেবিলে। 'ম্যারিনোকে দেখেছি আমি। এই প্ল্যানের সাথে হুবহু মিল আছে তার। সুতরাং, এটার ওপর ভরসা করতে পারি আমি।' প্ল্যানে আঙুল রাখল রানা। '৩৫০ হর্স-পাওয়ারের দুটো রোলস রয়েস ডিজেল এঞ্জিন প্রচুর পরিমাণে ফুয়েল খায়। এঞ্জিন রুমের নিচে, তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্যে ফ্রেশ ওয়াটার এবং ফুয়েল আছে এক হাজার দুশো গ্যালন।'

রানার আঙুল নড়ছে প্ল্যানের উপর। 'এঞ্জিন রুমের সামনে ডকের কেবিন, এবং আরও সামনের দিকে ক্রুদের কোয়ার্টার। ওটার নিচে, বিশ ফিট চওড়া একটা ডাবলবটম আছে, আর তাতেই আছে মেইন ফুয়েল সাপ্লাই—পাঁচ হাজার তিনশো পঞ্চাশ গ্যালন ফুয়েল। আমরা জানি, ট্যাঙ্কগুলো এখন ভর্তি।'

রূপার দিকে চোখ তুলে নিচু গলায় বলল রানা। 'মেইন ফুয়েল ট্যাঙ্কটাকে ফুটো করতে চাই আমি। ওয়াটার লাইনের কমপক্ষে তিন ফিট নিচে ফুটোটা করতে হবে। সম্ভব হলে আরও বেশি নিচে। ম্যারিনোর প্লেটিং মাইল্ড স্টীলের

তৈরি, এক ইঞ্চির ষোলো ভাগের একভাগ মোটা—ফুটো করতে হলে প্রচণ্ড এক রামধাক্কা দিতে হবে। যে বোটটা তুমি কিনে আনবে তাতে আমি একটা 'র‍্যাম' ফিট করে নেব। একসময় র‍্যামিং ছিল নির্ভরযোগ্য ন্যাভাল ট্যাকটিক্স, সব যুদ্ধ-জাহাজেরই র‍্যাম থাকত। আমারটা অবশ্য আলাদা ধরনের হবে। আর বোটে থাকবে আতসবাজি। ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো হলে তেল বেরিয়ে আসবে। তুমি জানো, পানিতে তেল ভাসে। ভাসমান তেলে, আতসবাজির একটা কণা যদি পড়ে—অঙ্ক মিলে যাবে আমাদের।'

'ধোঁয়া গিলিয়ে মারতে চাও ইয়ান ভ্যানকে?'

কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা রূপার দিকে। 'দূর বোকা!' বলল ও, 'কাউকে খুন করার ইচ্ছে নেই আমাদের। যা ঘটবে সেটা নেহাতই অ্যাকসিডেন্ট।'

সাত

বোটশেড ভাড়া করতেই আড়াই ঘণ্টা লেগে গেল। জায়গাটা দেখে পছন্দ হলো রানার, নির্জন এবং পাহাড়ের একধারে, বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোন উপায়ই নেই যে ওখানে একটা বোটশেড আছে।

লোহা-লক্কড়ের বাজার থেকে আর সব প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে লাগল পুরো এক ঘণ্টা। সবশেষে ও কিনল একটা ওয়েল্ডিং আউটফিট, অক্সিজেন ভর্তি একজোড়া বোতল, গগলস্ এবং দেড় ইঞ্চি ডায়ামিটারের আট ফিট লম্বা একটা স্টীলের ভারি বার।

জিনিসপত্র শেডে রেখে নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরে গেল রানা।

বোট নিয়ে এসেছে রূপা। পরীক্ষা করে খুশি হলো রানা। 'চমৎকার সবই মনের মত পাচ্ছি। খুব ক্লান্ত নাকি? ঘুম পাচ্ছে?'

'না,' রূপা বলল। 'প্যাকেটটা খুলে দেখবার জন্যে মরে যাচ্ছি আমি।'

'যাও তবে,' বলল রানা। 'পৌঁছুতে ঠিক বারোটাই বাজবে তোমার।'

বোট নিয়ে শেডে ফিরে এল ওরা। রানা কাজে হাত লাগাল তখুনি। রূপা 'আসছি' বলে অদৃশ্য হয়ে গেল মিনিট পনেরোর জন্যে। ফিরে এল ফ্লাস্ক ভর্তি চা, স্যাণ্ডউইচ, দু'প্যাকেট সিগারেট, ম্যাচ এবং এক বোতল হুইস্কি নিয়ে।

'যাচ্ছি তাহলে।'

'শোনো,' মুখ না তুলেই বলল রানা। 'ফেরার পথে একবার দেখে এসো ম্যারিনোকে।'

'যদি দেখি নোঙর তুলে...'

'তাহলে আর ফিরে আসবার দরকার নেই তোমার,' বলল রানা। 'আমিও চলে যাব যেদিকে দু'চোখ যায়।'

'একা ম্যানেজ করতে পারবে তো?'

'যাও। পারব।
চলে গেল রূপা।
বোটটা ইটালির তৈরি। দুটো 'কিকহেফার মার্কারি' আউটবোর্ড মোটর, হাণ্ড্রেড হর্স পাওয়ারের। স্টিয়ারিং কেব্‌ল্‌ খুলে নামাল সে ইঞ্জিন দুটোকে। উপুড় করল বোট। হুইস্কি আর স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে সমস্যাটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করল আরও খানিক।
খাওয়া শেষ করে আবার হাত লাগাল কাজে। গ্লাস ফাইবারের গা, জায়গা বেছে নিয়ে ড্রিল মেশিন দিয়ে ঠিক দেড় ইঞ্চি ডায়ামিটারের একটা ছিদ্র করল রানা। স্টীলের আটফিট লম্বা রডটা বোটের গায়ে শুধু ফিট করলেই চলবে না, বোট যখন ছুটবে, রডের ছুঁচাল শেষ প্রান্তটা ওয়াটার লাইনের তিন ফিট নিচে যেন থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। হিসেব এদিক ওদিক হলে চলবে না, বোটের গায়ের সাথে রডটা এমনভাবে ফিট করতে হবে, ইয়টের ডবল বটমের স্টীলের সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগার ফলে ফিটিংটা যেন ভেঙে না পড়ে।
আসল ভয় বোটের ফাইবার গ্লাসের বডিকে নিয়ে। বডিটা যদি টুকরো হয়ে বা ফেটে যায়, এত সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে এক সেকেণ্ডে। যত্নের সাথে ওয়েল্ডিং করল সে রডের শেষ মাথাটা বোটের গায়ে বসানো একটা লোহার পাতের সঙ্গে।
দু'ঘন্টা একনাগাড়ে খাটাখাটনি করে শেষ করল ও কাজটা। খুঁত খুঁতে মন নিয়ে নেড়েচেড়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সবটা কয়েকবার দেখে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো, কাজটায় কোন খুঁত নেই।
রূপা ট্রাক নিয়ে ফিরে এল বেলা তিনটের সময়।
'যাবার সময় দেখলাম ম্যারিনোর ডেকে একটা প্রপেলার তোলা হচ্ছে।'
'তাই নাকি?' হাসল রানা। 'গুড। রাত নামার আগে রওনা হতে পারবে না ওরা সেক্ষেত্রে। ট্রাক ড্রাইভারকে বিদায় করে দিয়েছ?'
'মাল নামিয়ে দিয়েই চলে গেছে। কি...প্যাকেটটার কথা জিজ্ঞেস করছ না যে?'
'আমি জানি কি আছে ওতে।'
'কি আছে?'
'আগেই বলেছি তোমাকে।'
রূপা রানার একটা হাত ধরে ফেলল। 'তোমার প্রতি আমার অগাধ...'
'ভালবাসা!'
'না!' রূপা বলল, 'ভালবাসা নয়, শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা জন্মে যাচ্ছে...'
'ওটার দরকার নেই আমার। ওসব জমা রাখো বুড়োর জন্যে।'
'প্যাকেটটা খোলবার লোভ সামলাতে পারিনি আমি,' রূপা বলল।
'ক'টা আছে লিমপেট মাইন?'
'চারটে।'
রূপার হাত থেকে এয়ার ব্যাগটা নিয়ে রানা বলল। 'সত্যিই কি...
'মানে? তুমি নিজেই তো বললে!'

'বলেছিলাম অনুমান করে। সত্যিই যে প্যাকেটে ওই জিনিস থাকবে তা জানতাম নাকি?'

'কিন্তু আছে!' রূপা বলল, 'তোমার এত পরিশ্রম সব বৃথা গেল।'

'মোটেই না,' বলল রানা। 'মাইন দিনের বেলা ফিট করা সম্ভব নয়।'

চুপ করে রইল রূপা।

'আর রাত নামলে ডক ভাগার চেষ্টা করবে। সময় কোথায় পানির নিচে গিয়ে মাইন ফিট করার?'

'কাজে লাগবে না তাহলে?'

রানা বলল, 'তা জোর দিয়ে বলা যায় না। লাগতেও পারে। পাঠিয়েছে যখন, থাকুক সাথে। সময় ও সুযোগ পেলে ওগুলোই ব্যবহার করব।'

'আর যদি সময় না পাও?'

'তাহলে আমার এই রাম-ধাক্কাই একমাত্র ভরসা। ফুটো করে দেব ফুয়েল ট্যাঙ্ক।'

'ঝুঁকিটা ভেবে দেখেছ?'

রানা বলল, 'ঝুঁকি তো নিতেই হবে।'

'তাই বলে প্রাণের ঝুঁকি?'

'উপায় কি?' রানা হাসল। 'প্রাণের ঝুঁকি নিতে চাই-পারি, তাই তো চাকরিটা আছে। কাপুরুষ মাসুদ রানাকে কে রাখবে চাকরিতে?'

রূপা বলল, 'বিকল্প উপায় নেই বলছ?'

'এটাই তো বিকল্প উপায়,' হাসল রানা। 'লিমপেট মাইন হলো আসল উপায়। ওটা ব্যর্থ হলে বিকল্পটা কাজে লাগাব।' রিস্টওয়াচ দেখল। 'পাঁচটা বাজে। আতসবাজির খেলা শুরু হচ্ছে কখন?'

'সূর্য ডোবার ঠিক একঘণ্টা পর।'

'আতসবাজিতে যখন চারদিকের আকাশ ছেয়ে যাবে, ঠিক সেই সময় আমি ম্যারিনোর কাছে যাব। তুমি অপেক্ষা করবে আমার জন্যে আগের সেই জায়গায়।'

'না,' রূপা বলল, 'আমিও যাব।'

রানা বলল, 'তর্ক করো না, রূপা। কাজটা আমাকে একা করতে হবে।'

'কিন্তু ফুটো করার কথা তুমি ভাবছ কেন?' রূপা বলল, 'স্কুবা ইকুইপমেন্টের সাহায্যে পানির নিচে দিয়ে গিয়ে মাইনগুলো ফিট করা সম্ভব।'

'সে চেষ্টাই তো করব। কিন্তু তা যদি ব্যর্থ হয়, যদি না পারি বোমা ফিট করতে, এই বোটের সাহায্যে যেতে হবে আবার আমাকে ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো করার জন্যে। ওই কাজটা আমি একা করব।'

রূপা বলল, 'বেশ। তখন আমি নেমে যাব বোট থেকে পানিতে, সাঁতরে ফিরে আসব তীরে। এরপরেও নিশ্চয়ই আপত্তি নেই?'

হেসে ফেলল রানা। 'না। নামতে বলার সাথে সাথে যদি না নামো?'

'ফেলে দিয়ো ধাক্কা দিয়ে।'

রানা বলল। 'তারচেয়ে, একটা বোট ভাড়া নিয়ে তুমি ম্যানোয়েল দ্বীপের

সাগরমুখী দিকে চলে যাও। আমি থাকব ওখানে। আতসবাজি আকাশে দেখামাত্র আমি রওনা হব, তুমি দূর থেকে ফলো করবে আমাকে। মাইন নিয়ে আমি নেমে যাবার আগে তুমি আর্টিনাকে কেন্দ্র করে চক্কর দেবে একবার। ডক এবং খান ইয়টে আছে কিনা রিপোর্ট করবে ফিরে এসে। ওরা না থাকলে...'

'বুঝতে পারছি,' বলল রূপা, 'ঠিক আছে। তাই যাই। পিস্তলটা হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

'ওর দরকার নেই এখন আর।'

রূপাকে বিদায় করে দিয়ে ট্রাক থেকে নামিয়ে দেয়া আতসবাজির প্যাকেটগুলো নিয়ে এল রানা বোটে। প্রতিটা প্যাকেটের মুখ খুলে সাজিয়ে রাখল বোটের সামনের দিকটায়। তারপর ঠেলে নামাল ওটা পানিতে।

এখন শুধু অপেক্ষা।

পনেরো মিনিটে এগারোবার রিস্টওয়াচ দেখল রানা। সময় হয়েছে অনুমান করে স্কুবা গিয়্যার চড়াল গায়ে। শক্ত করে বাঁধল কোমরে বেল্ট। ঘাড়ের পিছনে ঝুলিয়ে রাখল মাস্কটা। তারপর স্টার্ট দিল এঞ্জিনে।

স্লো স্পীডে বোটটাকে স্বাভাবিক বলে মনে হলো।

জল পুলিসের চোখে পড়লে আইন ভঙ্গের অপরাধে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে দেরি করিয়ে দেবে ভেবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুইচ অন করে আলো জ্বালল রানা। ফ্রেঞ্চ ক্রিকের উপর দিয়ে গ্র্যাণ্ড হারবারে ঢুকল ও।

উজ্জ্বল আলোর ফেস্টুনে সাজানো ম্যানিলাকে রহস্যময় লাগছে। গভীর সাগরে বেরিয়ে গেল রানা বোট নিয়ে। বন্দরের মুখের দিকে ফিরে আসার সময় সামনে কোন জাহাজ নেই দেখে ফুল স্পীডে দিলে কি হয় জানার জন্যে থ্রটল ওপেন করল ও।

ইঞ্জিনের শব্দ বদলে গেল সাথে সাথে, গভীর, গম্ভীর হয়ে উঠল একটানা আওয়াজটা। টু হাণ্ড্রেড হর্স পাওয়ার ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে বোটটাকে। তুলনামূলকভাবে হিসেব করে আগেই জেনেছে রানা, সাতশো হর্স পাওয়ারের জায়গায় দুশো হর্স পাওয়ারের অধিকারী হলেও ম্যারিনোর তুলনায় অনেক কম ওজন বলে বোটের স্পীড কয়েকগুণ বেশি হওয়ার কথা ইয়টের চেয়ে।

স্পীডের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলেও স্টিয়ারিঙের অবস্থা দেখে প্রমাদ গুনল রানা। হুইলটাকে দু'হাত দিয়ে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। যার ফলে বোটকে সোজা রাখতে পারছে না ও কোনমতে। বাধ্য হলো স্পীড কমাতে।

ইউ টার্ন নিয়ে বন্দরের মুখের কাছে ফিরে এল রানা। থ্রটল ডাউন করার সাথে সাথে যেন দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়বার উপক্রম করল বোট। হতাশা অনুভব করল ও। স্পীড কমালে বোট সিধে থাকে, কিন্তু কম স্পীডে ওর উদ্দেশ্য পূরণ হবার নয়। আর স্পীড বাড়ালে কোর্স ঠিক রাখা অসম্ভব, এমনই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয় হুইল। বেশিক্ষণ ফুল স্পীড দিয়ে রাখলে হুইলটা ভেঙে যাবে বলে ভয় হলো ওর।

ম্যারিনোর ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো করার পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিল ও। বিকল্প উপায় রইল না হাতে। ম্যারিনোকে উড়িয়ে দিতে হলে ঢাকা থেকে বুড়োর পাঠানো মাইনগুলোকে ব্যবহার করাই একমাত্র উপায় এখন।

থ্রটল খুলে দিয়ে উন্মুক্ত সাগরে চলে এল রানা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রবেশ করল মার্কাসামাক্রেড হারবারে। গন্তব্যস্থান ম্যানোয়েল আইল্যাণ্ড। ম্যানিলা এখন ওর বাঁ দিকে।

দূর থেকে দু'বার গ্যাস লাইটার জ্বলে উঠতে দেখে রূপার উপস্থিতি টের পেল রানা। বোট ঘুরিয়ে সেদিকে এগোল ও।

রূপা এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বসে আছে হুইল ধরে।

'ভাড়া করিনি,' রূপা বলল। 'ভাসছিল, চুরি করে নিয়ে চলে এসেছি। হিসেব করে খরচ করছি টাকা।'

অন্ধকারে শব্দ করে হাসল রানা।

'তোমার বোটের কি অবস্থা? চলছে ঠিকমত? রড ফিট করার পর কোন গোলমাল...'

'ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো করার পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছি,' বলল রানা। 'সম্ভব নয় এই বোট নিয়ে। কতক্ষণ সময় আছে আর আতসবাজি ছাড়ার?'

'আর পনেরো মিনিট।'

'উঠে এসো আমার বোটে,' বলল রানা।

এয়ারব্যাগ এবং স্কুবা গিয়্যার নিয়ে উঠে দাঁড়াল রূপা। 'এটার কি হবে?' বোটটার কথা জানতে চাইল ও।

'ভাসতে দাও স্বাধীন ভাবে।'

রূপা চলে এল রানার বোটে। স্কুবা গিয়্যার চড়াল গায়ে দ্রুত। 'স্টার্ট দাও এঞ্জিনে।'

দূর থেকে দেখা গেল ম্যারিনোকে। বিনকিউলার চোখে লাগাতে ডেকে দেখা গেল ডককে। তার পাশে খান। আতসবাজি দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। ক্যাপ্টেনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

দুশো গজ দূর দিয়ে ম্যারিনোকে পাশ কাটাল ওদের বোট। ইয়টের বিপরীত দিকে পৌঁছে বাঁক নিয়ে আবার ফিরে আসতে শুরু করল ওরা ইয়টের দিকে।

ম্যানোয়েল দ্বীপের দীর্ঘ ব্রিজের উপর দিয়ে মিছিল যাচ্ছে। ব্রিজটা ভেঙে না পড়লে হয়! হাজার হাজার লোক গিজ গিজ করছে, রেলিঙের এপারেও লোক জায়গা করে নিয়েছে দাঁড়াবার।

নিচে অন্ধকার। ম্যারিনোর কাছ থেকে দু'আড়াইশো গজ দূরে থামাল রানা বোট।

হুইলের দায়িত্ব রূপাকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল রানা। স্ট্র্যাপের সাথে বেঁধে নিল মাইনের প্যাকেটটা। মাস্কটা পরীক্ষা করল শেষবার।

'দেরি হলে বা অন্য কোন রকম অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলে সোজা পুলিসের কাছে যাবে তুমি। আমি ব্যর্থ হলে কেউ যেন আমার পরও ডককে পালিয়ে যেতে বাধা

দেবার চেষ্টা করে।'

'সাবধান, রানা! ফিসফিস করে বলল রূপা 'এখনও ভেবে দেখো, আমাকে নেবে কিনা সাথে।'

'না,' বলল রানা। 'অপেক্ষা করো এখানেই।'

ঝুপ করে পানিতে নেমে তলিয়ে গেল রানা। রূপা অনুভব করল, কি যেন হারিয়ে ফেলল ও, খালি হয়ে গেল বুকটা।

পঁচিশ ফিট নিচে নেমে গেল রানা। চমৎকার কাজ করছে মাস্ক। অক্সিজেনের সরবরাহ স্বাভাবিক। উরুর সাথে বাঁধা প্যাকেটটা হাত দিয়ে দেখে নিল একবার। ঠিকই আছে সব।

সেকেণ্ড এবং মিনিট গুনতে শুরু করল ও।

দু'হাতে হুইল ধরে সেকেণ্ড এবং মিনিট গুনতে শুরু করেছে রূপাও। রানা কখন ম্যারিনোর কাছে পৌঁছুবে অনুমান করে নিশ্চিত হতে চায় ও। পানির নিচে রানার স্পীড সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে ও এর আগে।

ছয় মিনিট গুনল রূপা। রানা পৌঁছে গেছে বা গজ বিশেক দূরে আছে বড়জোর আর ম্যারিনোর কাছ থেকে, হিসেব করে সিদ্ধান্তে পৌঁছুল রূপা। চারটে মাইন ফিট করতে সময় লাগবে বড়জোর দশ থেকে বারো মিনিট···।

কেউ নেই কোথাও, অকস্মাৎ নিজের অজ্ঞাতেই চিৎকার করে উঠল রূপা। 'না!'

হোয়েস্টিং মেশিন চালু হয়ে গেছে ইয়টের। নোঙর তুলে ফেলা হচ্ছে। ডেকের উপর ক্রুদের ব্যস্ত আনাগোনা। ম্যারিনো রওনা হতে যাচ্ছে এখুনি!

থরথর করে কেঁপে উঠল রূপা। রানা এখন ম্যারিনোর গায়ে মাইন ফিট করছে। জানে না ও আধ মিনিটের মধ্যে স্টার্ট নেবে ম্যারিনোর এঞ্জিন।

উন্মাদিনীর মত উঠে দাঁড়াল রূপা বোটের উপর। দুলে উঠল বোট। ভারসাম্য রাখতে না পেরে বসে পড়ল হাঁটুতে ভর দিয়ে। পাটাতনের উপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে হুইল চেপে ধরে মাথা তুলল ও। তাকাল ম্যারিনোর দিকে।

তোলা হয়ে গেছে নোঙর। ডেক খালি হয়ে গেছে। সিগন্যাল দিচ্ছে ম্যারিনো, তার বেরিয়ে যাবার পথ খালি করে দিতে বলছে অন্যান্য জাহাজকে। ভোঁ···ওঁ করে ডাক ছাড়ল টানা লম্বা।

পথ নিষ্কণ্টক, অনায়াসে রওনা হতে পারে ম্যারিনো।

লাফ দিয়ে পানিতে পড়ার ইচ্ছাটাকে দমন করল রূপা। লাভ নেই কোন। আড়াইশো গজ দূরত্ব অতিক্রম করতে অন্তত ছয় মিনিট লাগবে ওর। কিন্তু আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে স্টার্ট নেবে ম্যারিনোর এঞ্জিন। এবং স্টার্ট নেয়ার সাথে সাথে কয়েকশো টুকরো মাংসে পরিণত হবে মাসুদ রানা।

ঠোঁট কামড়ে ধরে, হাত মুঠো করে মাথা নাড়ছে রূপা, মনে মনে চিৎকার করছে—না! না! না! না!

স্টার্ট নিয়েছে ম্যারিনো, বোঝা গেল তাকে নড়তে দেখে। বন্দরের দিকে পিছন ফিরছে সে।

স্থির হয়ে চেয়ে রইল রূপা। কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখের মণি দুটো।

শেষ! শেষ হয়ে গেল সব!

ঠিক তখুনি চারপাশে ফট-ফট-ফট-ফট-ফট কান ফাটানো আওয়াজ উঠল। মুহূর্তে লাল, নীল, হলুদ আর বেগুনি রঙের আলোয় ভরে গেল আকাশ। শুরু হয়েছে আতসবাজি পোড়ানো। আনন্দে মেতে উঠেছে ম্যানিলা শহর।

উন্মুক্ত সাগরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে ম্যারিনো। সাবলীল গতিতে সগর্বে এগিয়ে যাচ্ছে সে। ক্রমশ বাড়ছে স্পীড। দূরে সরে যাচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে। সব শেষ। ডুকরে কেঁদে উঠল রূপা। মাথা নুয়ে পড়েছে হাঁটুর ওপর। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে ওর পিঠ। এমনি সময়ে দুলে উঠল বোট। চমকে মুখ তুলল রূপা। রানাকে দেখে চিনতে পারল না ও প্রথমে। পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা! আমি···আমি ভেবেছিলাম···'

বোটে উঠতে চেষ্টা করছে রানা, ওর একটা হাত ধরে সাহায্য করল রূপা। 'মাইন···?'

রানা উঠে পড়ল। রূপা দেখল যেমন ছিল ঠিক তেমনি উরুতে স্ট্র্যাপের সাথে বাঁধা রয়েছে মাইনের প্যাকেটটা।

মাস্ক খুলে রানা বসল। 'আর একটু হলেই গেছিলাম। মাইন ফিট করবার সময় দিল না।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে ম্যারিনোর দিকে। দ্রুত সরে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রের দিকে। বলল, 'শেষ চেষ্টা, রূপা! নেমে যাও।'

'শেষ চেষ্টা মানে?' রূপা ধরে ফেলল রানার একটা হাত। 'মরতে চাও নাকি?' ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না?'

'পাচ্ছি।'

'তবে? পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। নোঙর করা অবস্থায় থাকলে কথা ছিল, এখন আর কোন উপায় নেই।'

'নেই?' রানা হঠাৎ দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রূপাকে, তুলে নিল বুকের কাছে। 'গতরাতের সেই জায়গায় আমার জন্যে অপেক্ষা করো—যাও!' বলেই পানিতে ছুঁড়ে দিল ও রূপাকে।

চিৎকার করে উঠল রূপা।

কোন কথায় কান দিল না রানা, স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল বোট। পিছন ফিরে তাকাল না একবারও।

রূপা সাঁতার কেটে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বোট গতি লাভ করায় থামল সে। 'রানা, যেয়ো না—রানা, যেয়ো না।' বলে চিৎকার করল আরও কয়েকবার। তারপর সাঁতার কেটে তীরের দিকে ফিরে যেতে শুরু করল।

আট

ড্রাম পার্টি ড্রাম আর বাজনা বাজাচ্ছে ব্রিজের উপর। আনন্দ উত্তেজনায় দর্শকরা ফেটে পড়ছে। সিংহ আর বাঘের মুখোশ পরা কিশোর-কিশোরী, ঢোলা রংচঙে পোশাক পরা যুবক-যুবতী, উল্লাসে ফেটে পড়ছে সবাই।

সাঁ-সাঁ করে উঠে যাচ্ছে রকেটগুলো আকাশে, পট-পট ফট-ফট শব্দে ফাটছে সেগুলো, অত্যুজ্জ্বল রঙিন আলোর মালা জ্বলে উঠছে কালো আকাশের গায়ে। ভাসছে মালাগুলো বাতাসে।

দূরে, আরও দূরে সরে গেছে ম্যারিনো। গভীর, উন্মুক্ত সাগরে সে এখন, কোর্স ফিক্স করল এইমাত্র।

পরবর্তী বন্দর হংকং। ভ্যান ডকের রাজধানী। নিরাপদ দুর্গ।

ম্যারিনোকে অনুসরণ করল না রানা। পেনিনসুলার ভিতর দিয়ে রোজাকান দ্বীপের পাশ ঘেঁষে আকাশে আতসবাজি ছাড়তে ছাড়তে টিক হারবারে ঢুকল ও। শর্টকাট পথে বেরিয়ে এল উন্মুক্ত সাগরে।

এদিকের আকাশ মুক্ত হলেও আতসবাজির রঙিন আলো পড়ছে পানিতে। দূরে দেখা যাচ্ছে ম্যারিনোকে। পূর্ণবেগে ছুটে আসছে বোটের দিকে।

পেনিনসুলার ভেতর দিয়ে ম্যারিনোর সামনে চলে এসেছে রানা বোট নিয়ে।

স্পীড কমিয়ে মাস্ক, অক্সিজেন বটল এবং আতসবাজির খোলা বাক্সগুলো শেষবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল রানা। কয়েকটা আতসবাজি পাশাপাশি সাজিয়ে প্রত্যেকটায় আগুন ধরিয়ে দিল।

হুইলের তীব্র ঝাঁকুনির ফলে দু'হাতের তালুতে ফোস্কা পড়ে গেছে ওর।

মুখোমুখি এগিয়ে আসছে ওরা পরস্পরের দিকে। দুশো গজ থাকতে দিক পরিবর্তন করে পথ ছেড়ে দিল রানা।

কেউ নেই ম্যারিনোর ডেকে। বন্দর ছেড়ে নিরাপদে বেরোতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে ভ্যান ডক। মাঝখানে প্রচুর দূরত্ব রেখে পাশ দিয়ে বিপরীত দিকে যাবার সময় ফুয়েল ট্যাঙ্কটার অবস্থান অনুমান করে একটা কল্পিত ক্রস চিহ্ন আঁকল রানা ম্যারিনোর গায়ে। ক্রস চিহ্নটার তিন ফিট নিচে আঘাত হানতে হবে ওকে। কেন্দ্রবিন্দুর দু'পাশে আড়াই ফিট আড়াই ফিট করে মোট পাঁচ ফিট টার্গেট এরিয়া। ডবল বটম ফুয়েল ট্যাঙ্কের প্রস্থের দিকটা পাঁচ ফুটই।

মনের গভীরে শতকরা একশো ভাগই আশঙ্কা অনুভব করছে রানা, টার্গেট মিস করবে ও। কিন্তু বার বার উচ্চারণ করছে সে—পারতেই হবে, পারতেই হবে। যা ও করতে যাচ্ছে পাগলের কাণ্ড ছাড়া আর কিছু বলা যায় না তাকে। থ্রটল ওপেন করলে যে বোট একবার ডানদিকে মুখ ফেরায়, তারপর পরবর্তী মুহূর্তে প্রায় অ্যাবাউট টার্ন হয়ে বিপরীত দিকে ছুটতে চায় সেই বোট নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানো যায়, এবং ফলাফল সুইসাইড; এ বোট অন্য আর কোন কাজে লাগবার নয়।

কিন্তু তবু রানা যুক্তি তর্ক খাড়া করে নিজেকে প্ররোচিত করছে। ডক ওকে বারবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে, কিন্তু এবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে নিশ্চই। এবার ফাঁকিতে পড়বে না সে। একমাত্র আত্মবিশ্বাসের জোরই ওর সবচেয়ে বড় অস্ত্র এখন। সেই অস্ত্র দিয়েই ম্যারিনোর সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে ও, যেমন করে পারে।

টার্ন নিয়ে থ্রটল ওপেন করল রানা। অবস্থা সেই আগের মতই, প্রচণ্ড শক্তিতে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে স্টীয়ারিং হুইল দু'হাতের শক্ত বাঁধন। স্টীয়ারিং রডটা এখনও ভাঙছে না দেখে আশ্চর্য বোধ করছে সে।

ম্যারিনোর পাশে চলে এসেছে বোট। মধ্যবর্তী ফাঁক একশো সোয়াশো গজ। থ্রটল বন্ধ করল রানা।

কম্পন কমল হুইলের। বোটের স্পীড শতকার নব্বইভাগ কমে গেল এক মুহূর্তে।

এগিয়ে যাচ্ছে ম্যারিনো। দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে রানার বোট।

হুইল ধরে চুপচাপ বসে রইল রানা। ম্যারিনোকে দেখছে ও। সামনে বা পিছনে আর কোন জাহাজ নেই। ম্যারিনোর গায়ে কল্পিত ক্রস চিহ্নটা আর একবার আঁকল ও।

ম্যারিনো এখন ওর বাঁ দিকে, দুশো গজ সামনে। আকাশের দিকে তাকাল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে। ম্যানিলাকে বহু দূরের ছোট্ট আলোক মালার মত দেখাচ্ছে। তার আকাশে বিন্দু বিন্দু রঙিন আগুনের ফুলকি। ওগুলো আতসবাজি, চিনতে পারল রানা।

নড়েচড়ে বসল রানা। হাতের তালু ঘষে নিল বুকের সাথে। গোটা বিশ আতসবাজি ছাড়ল আবার আকাশে। নোনা পানি লেগে হাতটা জ্বালা করছে ভীষণ। ভোঁতা শব্দ তুলে এঞ্জিন কচ্ছপ গতিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বোটটাকে।

থ্রটল ওপেন করে হুইল চেপে ধরল রানা। প্রাণ ফিরে পেয়ে যেন প্রকাণ্ড এক লাফ দিল বাঘ। পঁচিশ গজ অতিক্রম করল কয়েক লাফে, তারপর গ্রীবা উঁচু করে ছুটতে শুরু করল।

হুইলটাকে মুঠোতে ধরে রাখে সাধ্য কার! হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে রানা। বুকের সাথে চেপে ধরেছে হুইলটাকে।

তির্যক ভঙ্গিতে নিক্ষিপ্ত তীরের মত এগিয়ে যাচ্ছে বোটটা ইয়টের দিকে।

ক্রস চিহ্নটা জ্বলজ্বল করছে রানার চোখের সামনে। নেই—কিন্তু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা সেটাকে। টকটকে লাল ছোট্ট একটা ক্রস।

দূরত্ব কমছে ক্রমশ।

কিন্তু বোটের নাক ঘুরছে এদিক ওদিক। সোজা এগিয়ে যাচ্ছে কখনও ম্যারিনোর লেজের দিকে, তারপরই ম্যারিনোর মুখের দিকে ঘুরে যাচ্ছে নাকটা।

বোটের স্পীড ম্যারিনোর চেয়ে অনেক বেশি। বোট এদিক ওদিক করলেও, রানার চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও সরছে না ক্রসের উপর থেকে

আর মাত্র পঞ্চাশ গজ। হুইলে পেট ঠেকিয়ে শরীরের ভার চাপিয়ে দিল রানা। দুই হাঁটু ভাঁজ করে বসেছে ও। দু' উরুর মাঝখানে হুইলটা বন্দী।

আয়ত্তে এসে গেল বোট। সোজা ছুটছে ম্যারিনোর দিকে।

কিন্তু স্থায়ী হলো না সরল গতিটা। পিছলে ডান উরুটা সরে যেতেই আবার যাকে তাই। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই। ঢিল ছুঁড়ে দিয়েছে রানা, কোথায় গিয়ে পড়বে তা এখন আর ওর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

একরোখা গণ্ডারের মত ম্যারিনোর দিকে ছুটছে বোট।

ক্রস চিহ্নটা রানার চোখের সামনে জ্বলে উঠছে, নিভে যাচ্ছে, আবার জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছে।

শরীর দিয়ে হুইলটাকে চেপে ধরে রেখেছে রানা। প্রতি সেকেণ্ডে আরও বড় হয়ে উঠছে ম্যারিনো। আকাশচুম্বী প্রাচীরের মত মনে হচ্ছে ইয়টটাকে। হঠাৎ আর কিছু দেখতে পেল না ও, সামনে শুধু মসৃণ পালিশ করা ইস্পাতের দেয়াল। দ্রুত বেগে ছুটে আসছে দেয়ালটা ওর দিকে।

পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, ম্যারিনোর মোটা ইস্পাতের গায়ে ধাক্কা খেতে যাচ্ছে বোট, ক্রস চিহ্নের কাছ থেকে কম করেও ছয় হাত দূরে।

নানা ভাঁজে গুটানো শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড ধাক্কায় স্টীয়ারিঙ হুইল টপকে কন্ট্রোল প্যানেলের উপর দিয়ে পিছলে ম্যারিনোর গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেল সে।

ঢুকে গেছে রড ফুয়েল ট্যাঙ্কে। ম্যারিনোর গায়ের সাথে সেঁটে গেছে বোটের নাকটা। ইয়টের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে নেমে এসেছে রানা বোটের নাকের উপর।

হামাগুড়ি দিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের উপর দিয়ে হুইলের কাছে চলে এল রানা। থ্রটল কমিয়ে ব্যাক গিয়ার দিল সে।

ডেক থেকে কে যেন চিৎকার করে কাকে কি বলল। উপর দিকে মুখ তুলে তাকাতেই শুকিয়ে গেল রানার বুক। আপার ডেকে দাঁড়িয়ে রেলিঙের উপর পেট রেখে ঝুঁকে পড়েছে একজন চীনা। বোট এবং রানাকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মত আতঙ্কে হাউমাউ করে উঠল লোকটা। অদৃশ্য হয়ে গেল তারপর।

ম্যারিনোর গা থেকে রডটা বের করে নিয়েই গিয়ার নিউট্র্যাল করল রানা। হুইল ঘুরিয়ে সমান্তরাল করে ফেলল বোটটাকে ইয়টের পাশে। ইয়টের গা ঘেঁষে চলছে বোট সমান গতিতে।

উপর থেকে চড়া গলার কথাবার্তা কানে এল রানার। ভ্যান ডকের হুঙ্কার শুনতে পেল পরিষ্কার। দেখতে পাচ্ছে না ওরা বোট বা রানাকে ইয়টের ফোলা পেটের জন্যে। টের পেল রানা, গতি কমে আসছে ইয়টের, থেমে দাঁড়াচ্ছে।

রিভার্স গিয়ার দিয়ে থ্রটল ওপেন করল রানা সামান্য। শক্তভাবে চেপে ধরল হুইলটা। ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসছে বোট।

ইয়টের রেলিং টপকে দেহটা কাত করে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখছে একজন লোক। তার নাক, চোখ, আর কপাল দেখতে পাচ্ছে রানা। চিৎকার করে কিছু বলছে সে ডেকের লোকদের।

ম্যারিনোর পিছন দিকে চলে এসেছে বোট। মুখ তুলতেই রানা দেখল পাশ

থেকে পিছনের অংশে চলে এসেছে সবাই। ইয়ান ভ্যান, খান এবং কয়েকজন চীনাকে দেখা যাচ্ছে। পিস্তলের নলগুলো আক্রমণ শুরু করল পরমুহূর্তে।

বাঁ হাত দিয়ে লাইটার বের করে টিপ দিল রানা ফুলকি দেখা গেল, কিন্তু আগুন জ্বলল না।

বোটের চারদিকে পানিতে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে।

আবার স্পার্ক হলো, কিন্তু সলতেতে আগুন ধরল না

মুখ তুলে তাকাতে যাবে রানা, একঝাঁক বুলেট ছুটে এসে আঘাত করল উইণ্ডস্ক্রীনে, চুরমার করে দিল কাঁচ। ডকের চোখের দিকে চেয়ে রইল রানা তিন সেকেণ্ড। পিস্তল তুলে লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে কি মনে করে চেয়ে আছে ওর দিকে।

দশবার এগারোবার···বারোবারের বার জ্বলল লাইটার। বাক্স থেকে আতসবাজি বের করে আগুন ধরাল রানা।

হুস করে আকাশে উঠে গেল আতসবাজিটা।

বোট এখন ত্রিশ গজের মত পিছিয়ে এসেছে ইয়ট থেকে। এখন আর রিভার্সে নয় গিয়ার। থ্রটলও বন্ধ। পুরোপুরি থেমে দাঁড়াতে পারেনি এখনও ইয়ট। দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

নীল আলোয় আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আতসবাজি ফট করে একটা শব্দ করে ফেটে গেছে, ভাসিয়ে দিয়েছে আকাশের গায়ে নীল অত্যুজ্জ্বল আলোর মালা

বিরতি নেই রানার। একের পর এক আতসবাজি ছাড়ছে ও। লাল নীল হলুদ বেগুনী আলোর মেলায় টেকনিকালার রূপ ধারণ করল গভীর সমুদ্রের উপর আকাশ।

একসাথে দুটো আতসবাজি ব্যাঙের মত পানির উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল ম্যারিনোর দিকে। একটা তিন লাফে গজ পনেরো গিয়েই নিস্তেজ হয়ে গেল, ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে ভিজে যেতে নিভে গেল সমস্ত তেজ। দ্বিতীয়টা চল্লিশ গজ অতিক্রম করলেও ম্যারিনোকে ডান পাশে রেখে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

দ্রুত হাতে আরও কয়েকটা আতসবাজিতে আগুন ধরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল রানা। আগুনের একটা ফুলকি শুধু পড়ুক ম্যারিনোর পাশে, ফুটো ট্যাঙ্ক থেকে গল গল করে বেরিয়ে আসা তেলের উপর—এইটুকুই চাইছে রানা।

হঠাৎ আবার বাড়তে শুরু করল ইয়টের গতি। রানা বুঝল টের পেয়ে গেছে ওরা, বুঝে গেছে বাজি পোড়ানোর আসল উদ্দেশ্য, জেনে গেছে হড় হড় করে তেল বেরোচ্ছে ম্যারিনোর ফুয়েল ট্যাঙ্ক থেকে। এখন কাছে পিঠে সামান্য একটা আগুনের ফুলকি পড়লে কি ঘটবে বুঝতে পেরে চেষ্টা করছে ইয়ট নিয়ে আওতার বাইরে সরে যেতে।

স্পীড বাড়াল রানাও। পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে বলে কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল গুলিবর্ষণ, হঠাৎ কড় কড় কড় শব্দে চমকে উঠল সে। অটোমেটিক রাইফেল চালাতে শুরু করেছে একজন। প্রায় সাথে সাথেই গর্জে উঠল আরও চার পাঁচটা।

প্রমাদ গুনল রানা। এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই ওর।

কয়েকটা বাক্সের বাজি-পটকা ডেকের ওপর উপুড় করে ঢালল রানা। সমস্ত

আতসবাজিতে একসাথে আগুন ধরিয়ে দেবে সে। দেড় হাত লম্বা একটা সলতের সাথে জোড়া দিল কয়েকটা আতসবাজির ছোট সলতে।

লাইটার জ্বালতেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করল রানা কাঁধে। ছিটকে পড়ে গেল লাইটারটা হাত থেকে। ডাইভ দিয়ে পাটাতনের উপর পড়ল ও। নিভে গেছে লাইটার। থাবা মেরে ধরল সেটা। দ্রুত বসল হাঁটু মুড়ে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে চোখমুখ। দাঁতে দাঁত চেপে মুখ তুলে তাকাল ইয়টের দিকে। দূরত্বটা মেপে নিল তীক্ষ্ণ চোখে। হুইল ঘুরিয়ে বোটের নাক স্থির করল সোজা ইয়ট বরাবর। তারপর থ্রটল ওপেন করে দিল পুরোটা। এবং সাথে সাথেই আগুন ধরিয়ে দিল লম্বা সলতের এক মাথায়।

ইয়ট ছুটছে পূর্ণ বেগে। বোটও ধাওয়া করছে তাকে তিনগুণ গতিতে। বিশ গজের মত দূরত্ব থাকতেই লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল রানা।

পানির নিচে ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে সরে আসতে আসতে অনুভব করল রানা বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে। টাইমিংটা ভুল হয়নি তো? সলতে নিভে যাবে না তো মাঝপথে? ইয়টের গায়ে লাগবে তো ধাক্কা?

অকস্মাৎ লাল হয়ে উঠল মাথার ওপরের পানি। এদিক ওদিক তাকিয়ে রানা দেখল উপরে নিচে এবং দু'পাশের পানিতে লাল রঙ মিশিয়ে দিয়েছে যেন কেউ। আরও কয়েক গজ পিছিয়ে এসে ভেসে উঠল সে পানির ওপর। দাউ দাউ জ্বলছে বোটটা। ম্যারিনোর গায়ে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে সে, ইয়টটাকে যেন ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে-ই।

উদ্বাহু নৃত্য শুরু হয়ে গেছে ইয়টের উপর।

ডুব দিতে যাবে রানা, বুম করে বিকট শব্দ হলো একটা। চোখের পলকে অত্যুজ্জ্বল সাদা আলোর পাহাড় তৈরি হয়ে গেল চোখের সামনে। সেই সাদা পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে ম্যারিনোসহ সামনের সমুদ্র।

আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ডুব দিল রানা। পিছিয়ে যেতে শুরু করল ও আগুনের কাছ থেকে।

খানিকপর আবার যখন মাথা তুলল ইয়টটাকে দেখতে পেল রানা। দাউ দাউ জ্বলছে ম্যারিনো। শিখার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সাদা হাঁসের মত ইয়টটার কালোয় রূপান্তরিত গা। এখনও ছুটছে ওটা। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে নরক-অগ্নিকুণ্ড।

সাঁতরাচ্ছে রানা। লালচে আভায় ঝিকঝিক করছে ওর দাঁতগুলো।

হাসছে সে।

হঠাৎ খেয়াল হলো এক হাতে সাঁতার কাটছে সে। বাঁ হাতটা কাজ করছে না। ব্যাপার কি ঠিক বুঝতে পারল না রানা, অসাড় হয়ে গেছে হাতটা কাঁধের কাছ থেকে। ব্যথা টের পাচ্ছে না এতটুকু, হাতটা যেন নেই।

একপাশে হেলে পড়েছে ম্যারিনো। রানা বুঝল, ডুবে যাচ্ছে ইয়ট। দশ মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে ওটা চিরতরে। সেই সাথে অদৃশ্য হয়ে যাবে নিকোলাস, খান, ইয়ান ভ্যান ডক—হংকং সম্রাট।

আর ও নিজে? পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, আধ ঘণ্টার মধ্যে হারিয়ে যাবে সে নিজেও। দশ মাইল দূরে তীর। একটা হাত অকেজো হয়ে গেছে গুলি খেয়ে। নিশ্চয়ই রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে। রক্তের গন্ধ ঠিকই পৌঁছে যাবে হাঙরের নাকে।

তবু, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। ধীর গতিতে এগোতে শুরু করল সে তীরের দিকে।

'রানা···রানা, তুমি আহত হয়েছ?'

চমকে ঘাড় ফেরাল রানা। হাঙ্গরের আগেই পৌঁছে গেছে রূপা। চুরি করে এনেছে আরেকটা স্পীড বোট।

'একহাতে সাঁতার কাটছ কেন? রানা, গুলি খেয়েছ···কোথায়?'

বোটে উঠে শুয়ে পড়ল রানা। 'বাম কাঁধে। মনে হচ্ছে সিরিয়াস কিছু না।'

তীরের দিকে বোট ছুটিয়ে দিল রূপা তীর বেগে। ফড়ফড় করে শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিল ক্ষতস্থান। ঢেউয়ের মাথায় দোদুল্যমান অগ্নিকুণ্ডের দিকে চেয়ে রয়েছে দু'জন সম্মোহিত দৃষ্টিতে। আরও হেলে পড়েছে ম্যারিনো।

হঠাৎ দপ্‌ করে নিভে গেল আগুন।

চোখ সরিয়ে নিয়ে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রূপা।

* * * *